সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

ছিয়াশীতম বর্ষ ॥ প্রথম-সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৬তম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

৮৭-তম বর্ষ

সভাপতি ঃ ডঃ সুকুমার সেন

সহ সভাপতি

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
ডাঃ বিমলেন্দুনারায়ণ রায়
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা
ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য
শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক ঃ শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী, ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত

কোষাধ্যক্ষ

ডঃ কানাইচন্দ্র পাল

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীদেবকুমার বসু

পুঁথিশালাধ্যক্ষ

ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ ডঃ সরোজমোহন মিত্র

সদস্যবৃন্দ

শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
শ্রীপুলকেশ দে সরকার
শ্রীকুমারেশ ঘোষ
শ্রীদুলালপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
শ্রীশংকরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত
শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ
শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীহারাধন দত্ত
শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ
ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী
শ্রীউষা সেন
ডঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীধীরাজ বসু
শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী

শাখা-পরিষৎ প্রতিনিধি

নৈহাটি শাখা—শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন
বর্ধমান শাখা—শ্রীসদানন্দ দাস
মেদিনীপুর শাখা—ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী
কৃষ্ণনগর শাখা—শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়

ন্যাসরক্ষক সমিতি

ডঃ সুকুমার সেন
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
শ্রীঅশোককুমার সরকার
ডাঃ বিমলেন্দুনারায়ণ রায়
ডঃ কানাইচন্দ্র পাল (কোষাধ্যক্ষ পদাধিকার বলে)

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রানীতির কয়েকটি সমস্যা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

১. তুচ্ছ বস্তুতে মুদ্রানির্মাণ

প্রাচীন জগতের অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও মুদ্রানির্মাণে সাধারণতঃ স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন যুগের ভারতে বিদেশীয় রাজগণ কখনও কখনও তাঁহাদের মুদ্রায় নিকেল অথবা নিকেলমিশ্রিত তাম্র এবং বিল্লন-সংজ্ঞক তাম্র, টিন প্রভৃতির খাদমিশ্রিত রৌপ্য ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের কোন কোন তাম্রমুদ্রাকে কেহ কেহ পিত্তলনির্মিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার দক্ষিণ ভারতের শাতবাহনবংশীয় রাজগণের মুদ্রায় সীসা এবং পোটিন-সংজ্ঞক খাদমিশ্রিত তাম্র ব্যবহৃত হইত। এই জাতীয় শাতবাহন মুদ্রার নাম ও মূল্য জানা যায় না। কিন্তু এই বংশের রাজ্ঞী নাগনিকার নানাঘাট লেখে কার্ষাপণের উল্লেখ আছে। সেযুগের কার্ষাপণ রৌপ্য ও তাম্রে নির্মিত হইত। এই জাতীয় প্রাচীন চিহ্নাঙ্কিত (punch-marked) রৌপ্য মুদ্রা যে শাতবাহন রাজ্যে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে।

Philostratus-কৃত Tyana-র Apollonius এর জীবনী ২১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহাতে দুইরকমের পিত্তল (orichalcum এবং bronze) দ্বারা নির্মিত একপ্রকার ভারতীয় মুদ্রার উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার তালিকাতেও পণ্ডিতগণ কখনও কখনও পিত্তল মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহা হউক, প্রাচীন ভারতবর্ষে নিম্নমূল্যের ধাতু ব্যতীত আরও নানাপ্রকার তুচ্ছ বস্তু দ্বারা মুদ্রা নির্মিত হইত বলিয়া জানা যায়। পালি 'পাতিমোক্‌খ' গ্রন্থে 'জাতরূপ-রজত' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। 'জাতরূপ' অর্থ স্বর্ণ এবং 'রজত' অর্থ রৌপ্য; কিন্তু বিনয়পিটকের 'সুত্তবিভঙ্গ' অংশে 'রজতে'র অর্থ করা হইয়াছে বাজারে প্রচলিত কার্ষাপণ, লোহমাষক, দারুমাষক এবং জতুমাষক সংজ্ঞক মুদ্রা। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বুদ্ধঘোষ তাঁহার 'কংখাবিতরণী' সংজ্ঞক 'পাতিমোক্‌খ'-টীকায় বলিয়াছেন যে, 'রজত' বলিতে কার্ষাপণ এবং লোহ, কাষ্ঠ ও লাক্ষাদ্বারা নির্মিত মাষক মুদ্রা বুঝিতে হইবে। আবার বিনয়পিটকের 'সমন্ত-পাসাদিকা' টীকায় বুদ্ধঘোষ 'কার্ষাপণে'র অর্থ করিয়াছেন স্বর্ণনির্মিত, রৌপ্যনির্মিত এবং প্রাকৃত (অর্থাৎ সাধারণ বা তাম্রনির্মিত) কার্ষাপণ মুদ্রা। তিনি অন্যান্য মুদ্রানামগুলির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, (১) লোহ-মাষক অর্থাৎ তাম্র, লোহ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত মাষক, (২) দারুমাষক অর্থাৎ শক্ত কাঠ, বাঁশের টুকরা এবং তালপত্র খণ্ডের উপর মূর্তি খুদিয়া নির্মিত মাষক, এবং (৩) জতুমাষক অর্থৎ খানিকটা লাক্ষা বা কোনরূপ জমাট আঠার উপর মূর্তি খুদিয়া নির্মিত মাষক।

কাঠ, বাঁশ, তালপত্র, লাক্ষা এবং আঠাদ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা কোন রাজ সরকার কর্তৃক প্রচারিত হইত বলিয়া মনে করা যায় না। আমরা পরে দেখিব যে, দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন রোমান মুদ্রার পাশাপাশি তাহাদের অনেক মৃত্তিকা-নির্মিত নকল পাওয়া গিয়াছে।

২. নকল মুদ্রা

ইতিহাসের সকল যুগেই ভারতের বাজারে অনুকৃত বা নকল মুদ্রার প্রচলন ছিল। এ সম্পর্কে প্রথমেই আমাদের কুষাণ রাজগণের মুদ্রার অনুকরণে নির্মিত তাম্র মুদ্রার কথা মনে পড়ে। এই জাতীয় অনেকগুলি মুদ্রা বহুদিন পূর্বে পুরীর নিকটে আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহাকে 'পুরী কুষাণ মুদ্রা' বলা হইত। পরে দেখা গিয়াছে যে, এই নকল কুষাণমুদ্রা উড়িষ্যার অন্যান্য অঞ্চলে এবং বাংলা ও বিহারেও বহুল সংখ্যায় পাওয়া যায় ; এমনকি উত্তর প্রদেশেও এ জাতীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কুষাণ-রাজধানী পেশোয়ার হইতে বহুদূরে পূর্বভারতের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলে কুষাণ তাম্র মুদ্রা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল ; তাই কুষাণ প্রাধান্যের অবসানে যখন বাজারে খাঁটি কুষাণ মুদ্রার অভাব দেখা দেয়, সেই সময় অর্থাৎ গুপ্ত যুগে স্থানীয় স্বর্ণকার বা পোদ্দারেরা ঐ ধরনের নকল মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া বাজারের চাহিদা মিটাইয়াছিল। অবশ্য সেকালে এক রাষ্ট্রের মুদ্রার পক্ষে সে রাষ্ট্রের বাহিরে অন্যত্র বাজারে চলিতে বাধা ছিল না। তবু পূর্বভারতে কুষাণ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকের Periplus Maris Erythrae গ্রন্থে গঙ্গা নদীর মোহানার নিকটবর্তী দেশে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে। এই মুদ্রা অবশ্যই কুষাণদের স্বর্ণমুদ্রা। কারণ কুষাণ আমলের পূর্বে ভারতে প্রকৃত স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। সেকালে কদাচিৎ যাহা ব্যবহৃত হইত, তাহা চাকতি মাত্র : বিদেশীয়েরা উহাকে মুদ্রা বলিতে চাহিত না।

বাজারে নকল মুদ্রার প্রচলন যে প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রানীতির একটি বৈশিষ্ট্য, সম্প্রতি তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নখননের ফলে আন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্গত মেডক জেলার সাঙ্গারেড্ডি তালুকস্থিত কোণ্ডপুর গ্রামে কতকগুলি মুদ্রা তৈরি করিবার ছাঁচ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যায় যে, যদিও স্থানটি শাতবাহন বংশের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং সেখানে শাতবাহন রাজগণের মুদ্রা নির্মিত হইত, তবু সেখানকার মুদ্রাব্যবসায়ীরা পার্শ্ববর্তী শকরাজ্যের রাজগণের মুদ্রাও সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত করিত। ইহার অর্থ এই যে, সেকালে কোন ভারতীয় রাষ্ট্রে অন্য রাষ্ট্রের মুদ্রার প্রচলনে এবং উহার নকলের নির্মাণ ও ব্যবহারে কোন বাধা ছিল না।

এই প্রসঙ্গে পূর্বভারতে প্রাপ্ত আর এক শ্রেণীর নকল স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ করিতে হইবে। ইহা গুপ্তবংশের স্বর্ণমুদ্রার অনুকরণে গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের পরবর্তী যুগে অর্থৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্য হইতে দুই-এক শত বৎসরের মধ্যে রাত, খড়্গ ও দেববংশীয় রাজগণের আমলে প্রচারিত হইয়াছিল। বাংলাদেশের যশোর, ফরিদপুর, বগুড়া, ঢাকা ও কুমিল্লা জেলায় এবং ত্রিপুরা ও আসামে ঐ ধরণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন মুদ্রায় দুই-একজন রাজার নামও পড়া গিয়াছে। কিন্তু মুদ্রাগুলির চেহারা দেখিয়া পণ্ডিতগণ এগুলিকে মুদ্রা-ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রচারিত জাল মুদ্রা মনে করেন।

এই আলোচনায় প্রাচীন ভারতের বাজারে প্রচলিত বিদেশীয় মুদ্রারও উল্লেখ প্রয়োজন।

এ সম্পর্কে প্রথমেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত শত শত রোমান মুদ্রার কথা মনে পড়ে। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রনির্মিত রোমান মুদ্রা ভারতের দক্ষিণাঞ্চলেই বেশী পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণের বাজারে এই বিদেশীয় মুদ্রার বহুল প্রচার ছিল। বাণিজ্যব্যপদেশে উত্তরভারতে আগত রোমান মুদ্রার মধ্যে স্বর্ণমুদ্রাগুলি কুষাণরাজগণের মুদ্রা নির্মাণে এবং রৌপ্যমুদ্রাসমূহ পশ্চিমভারতীয় শকরাজগণের মুদ্রা নির্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। দক্ষিণভারতে রোমান মুদ্রার অনুকরণে মৃত্তিকা দ্বারাও নকল মুদ্রা নির্মিত হইত। এই ধরনের মাটির মুদ্রায় কখনও কখনও ঝুলাইবার জন্য উপরের দিকে দুইটি ছিদ্র দেখা যায়। এগুলি দরিদ্র শ্রেণীর স্ত্রীলোকের কণ্ঠহার নির্মাণে ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। ইহার দুই-একটিতে সোনা দিয়া গিল্টী করার চিহ্ন আছে। সেগুলি সম্ভবতঃ মধ্যবিত্ত মহিলাদের জন্য নির্মিত হারে ব্যবহার করা হইয়াছিল। কিন্তু মৃত্তিকানির্মিত নকল রোমান মুদ্রার যেগুলিতে কোন ছিদ্র দেখা যায় না, সেগুলি ক্ষুদ্রমূল্যের মুদ্রা হিসাবে বাজারে চলিত বলিয়া মনে করা যায়। কারণ আমরা দেখিয়াছি, পালি সাহিত্যে লাক্ষা, আঠা প্রভৃতি দ্বারা মুদ্রা নির্মাণের উল্লেখ আছে।

ভারতে প্রাপ্ত রোমান মুদ্রার প্রসঙ্গে আর দুটি কথা বলা উচিত। প্রথমতঃ, দক্ষিণ-ভারতীয় ইক্ষ্বাকু রাজগণের তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর লেখে দিনারিমাষক নামক মুদ্রার উল্লেখ আছে। এই মুদ্রা নামের প্রথমাংশ রোমান Denarius ব্যতীত আর কিছু নহে। দ্বিতীয়তঃ, কুষাণ এবং গুপ্তরাজগণ রোমান স্বর্ণমুদ্রার ওজনে অর্থাৎ ১২৪ গ্রেনের যে স্বর্ণমুদ্রা প্রচার করেন, ঐ রোমান নাম হইতে তাহার নাম হয় দীনার। সংস্কৃত সাহিত্যে ও লেখমালায় দীনার নামক স্বর্ণমুদ্রার অনেক উল্লেখ আছে।

৩. ঢব্বু বা ঢাবুয়া

দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় বলিয়াছেন যে, বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত বাংলাদেশের বাজারে ঢাবুয়া নামক অমুদ্রিত তাম্রখণ্ড মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। এ সম্পর্কে অনন্তসদাশিব আলতেকর মহাশয় বলেন যে, বাংলার ন্যায় মহারাষ্ট্র, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের বাজারেও ঢব্বু নামক একতোলা ওজনের ঐ প্রকার তাম্র খণ্ডের প্রচলন ছিল। উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর বিভাগে ইহার বহুল প্রচলনের জন্য ইহাকে গোরখপুরী পয়সা বলা হইত। দাতে ও কার্বেকৃত মরাঠী শব্দকোষ অনুসারে ইহার মূল্য ছিল দুই পয়সা বা আধ আনা। ইহাকে মরাঠীতে ঢবু, ঢব্বু ও ঢব্বুক, তেলুগুতে ঢব্বু, তামিলে ইডম্পু এবং ইংরাজীতে Dub বলা হইত।

আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত শঙ্কর ভট্টের 'ধর্মদ্বৈতনির্ণয়' বা 'দ্বৈতনির্ণয়' গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, ৮ ঢব্বুক বা ১৬ পণে এক কার্ষাপণ বা কাহণ হয়; যদিও কোথাও বা ১০ ঢব্বুকে এক কার্ষাপণ হইয়া থাকে। অবশ্য ঢব্বুকের ওজন ছিল একতোলা তাম্র এবং তার মূল্য দেখা যায় দুই বা সওয়া দুই পণ কড়ি অর্থাৎ ১৬০ কিংবা ১৮০ কড়ি। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের রাণা রাজসিংহের সময়ে রচিত 'রাজপ্রশস্তি কাব্যে' ঢব্বুকের উল্লেখ আছে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যোধপুর ও সিরোহী রাজ্যে প্রচলিত দুইতোলা ওজনের তাম্রমুদ্রাকে ঢব্বু বলা হইত। যাহা হউক, ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগেও যে ধাতুবিশেষের চাকতি মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ আছে।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর সূচনায় Philostratus-এর গ্রন্থে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় প্রচলিত যে পিতলনির্মিত মুদ্রার উল্লেখ আছে, সে বিষয়ে বলা হইয়াছে যে, উহা খাঁটি ভারতীয় মুদ্রা, রোমান ও মিডিয়া দেশীয় মুদ্রার ন্যায় ছাপ মারা নহে। এই বর্ণনা হইতে মনে হয়, উহা পিতলের ঢাবুয়া মাত্র।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কেরল দেশের ত্রিচুর নগরের ২২ মাইল পূর্বোত্তরে অবস্থিত এয়াল গ্রামে কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। এগুলি আনুমানিক ১০০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্তিকাতে প্রোথিত করা হইয়াছিল। এখানে নিম্নলিখিত মুদ্রাগুলি পাওয়া গিয়াছে।—(১) রোমান সম্রাট্ Trajan, Nero, Claudius, Tiberius প্রভৃতির ১২টি স্বর্ণমুদ্রা ; (২) Augustus ও প্রজাতন্ত্রী রোমের প্রায় ৫০টি রৌপ্যমুদ্রা, (৩) ১২টি রৌপ্য কার্ষাপণ, এবং (৪) কতকগুলি অমুদ্রিত রৌপ্যখণ্ড অর্থাৎ রূপার ঢাবুয়া।

ভারতের বাজারে প্রাচীনকাল, মধ্যযুগ এবং আধুনিক আমলে মুদ্রারূপে রৌপ্য, পিত্তল ও তাম্রখণ্ড ব্যবহারের সম্পর্কে যে প্রমাণ উপরে আলোচিত হইল, উহা প্রাচীন ভারতের মুদ্রানীতিবিষয়ক একটি গুরুতর সমস্যার উপর আলোকপাত করে। সমস্যাটি এই যে, ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে নিস্ক, শতমান, সুবর্ণকার্ষাপণ, পাদ প্রভৃতি স্বর্ণনির্মিত মুদ্রানামের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু ভারতে এ পর্যন্ত যে সহস্র সহস্র প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কুষাণ যুগের পূর্ববর্তী স্বর্ণমুদ্রা নাই। তা ছাড়া, নিস্ক ও শতমানের ওজন ছিল ৩২০ রতি। কোন জনপ্রিয় মুদ্রার (বিশেষ করিয়া স্বর্ণমুদ্রার) এত বেশী ওজন হইতে পারে না। আবার 'কর্ষ'' শব্দের অর্থ ৮০ রতির ওজন এবং 'কার্ষাপণ' নামটি ঐ শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং মূলতঃ রৌপ্য কার্ষাপণের ওজন ৮০ রতি ছিল। এ সম্পর্কে অন্যবিধ প্রমাণেরও অভাব নাই। যাহা হউক, কুষাণ আমলে সঙ্কলিত 'মনুস্মৃতি' এবং তৎপরবর্তী নানা গ্রন্থে রৌপ্য কার্ষাপণের ওজন পাই ৩২ রতি। আবিষ্কৃত সহস্র সহস্র রৌপ্যমুদ্রার মধ্যে ৮০ রতি ওজনের কোন মুদ্রা নাই। ইহা হইতে মনে হয়, নিস্ক বা শতমান ৩২০ রতি এবং পাদ বা সুবর্ণ কার্ষাপণ ৮০ রতি ওজনের সোনার ঢাবুয়া। এইরূপ প্রাচীনতম রৌপ্য কার্ষাপণ ৮০ রতি ওজনের রূপার ঢাবুয়া ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

৪. রৌপ্য পরিমাণ

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, খানিকটা রৌপ্যই মুদ্রার ন্যায় ব্যবহৃত হইত। জোণরাজের 'দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিণী'তে দেখিতে পাই, সুলতানী আমলে যে সকল কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ইসলামধর্ম অবলম্বনে অস্বীকার করিতেন, তাঁহাদিগকে ২ পল বা ৮ তোলা রূপা জিজিয়া কর দিতে হইত। সুলতান জৈনুল আবিদীন এই করভার কমাইয়া একমাষা রৌপ্য নির্ধারিত করিয়াছিলেন।

দশমশতাব্দীতে উড়িষ্যার গঞ্জাম অঞ্চলে নরেন্দ্রধবল নামক একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার একখানি তাম্রপত্রে দেখা যায়, ১০ পল ২ মাষা ৪ গুঞ্জা পরিমিত রৌপ্যে যাহার কর নির্ধারিত ছিল এমন একটি গ্রাম বিক্রীত হইয়াছিল। উড়িষ্যা ও আন্ধ্র প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে কতকগুলি বিশেষ প্রকারের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে রৌপ্যপলে কর ধার্য করিয়া ভূমিদানের উল্লেখ পাই। বিভিন্ন শাসনে এই করের রৌপ্য পরিমাণ ৯ পল, ৪ পল, ২ পল, ৫ পল, ৪+৪=৮ পল, ৩ পল, ৪ পল, ৮ পল, এবং ১০ মাষা (৫০ রতি) দেখা যায়।

'রাজতরঙ্গিণী'তে বর্ণিত রাজা হর্ষের পলায়নের কাহিনী হইতে বুঝা যায় যে, রত্নাদি এবং স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতিও লোকে কখনও কখনও মুদ্রার ন্যায় ব্যবহার করিত।

৫. কড়ি

মধ্যযুগের শেষভাগে মালদ্বীপ হইতে ভারতে কড়ি আমদানি হইত। কিন্তু প্রাচীনকালে কোথা হইতে কড়ি আসিত তাহা জানা যায় না। মালদ্বীপে ৪০ বা ৪২ পণ (অর্থাৎ ৩২০০ বা ৩৩৬০) কড়ি ৬।৭ আনায় (অর্থাৎ আধুনিক ৩৫।৪০ পয়সায়) পাওয়া যাইত। সেগুলি পশ্চিম ভারতের সুরত বন্দরে ৪ টাকা হন্দর হিসাবে বিক্রীত হইত। ব্যবসায়ীরা মালদ্বীপে টাকায় ৯।১০ হাজার কড়ি কিনিয়া বাংলাদেশের বাজারে টাকায় ২৫০০।৩২০০ হিসাবে বেচিত। ব্রিটিশ আমলের কোনও কোনও স্থানে ট্রেজারিতে কড়িতে খাজনা লওয়া হইত। শ্রীহট্ট জেলার খাজনা ছিল আড়াই লক্ষ টাকা। ইহার সমস্তটাই টাকায় ৫১২০ কড়ির হিসাবে কড়িতে আদায় হইত। এই ১২৮ কোটি কড়ি শ্রীহট্ট হইতে ঢাকায় আনা একটা কঠিন ব্যাপার ছিল।

মহাস্থানলেখে 'গণ্ডক' বা 'গণ্ডা'র উল্লেখ হইতে মৌর্য যুগের বাংলায় কড়ির প্রচলন প্রমাণিত হয়। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন গুপ্তযুগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি বাজারে কেবল কড়ি দেখিতে পান; গুপ্ত সম্রাট্‌গণের স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার ব্যবহার তাঁহার অভিজ্ঞতার বাহিরে ছিল। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে হিউএন-চাঙ কড়ির সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং মূল্যবান্ প্রস্তর বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া লিখিয়াছেন। দুই শতাব্দী পরে আরব বণিক্ সুলেমান বলিয়াছেন যে, পূর্বভারতের পালসাম্রাজ্যে সোনারূপা থাকিলেও কড়িতে ব্যবসাবাণিজ্য চলিত। মিনহাজুদ্দীনের 'তবকাৎ-ই নাসীরী' অনুসারে সেনবংশীয় লক্ষ্মণ-সেনের রাজ্যে কেবলমাত্র কড়ির প্রচলন ছিল এবং ঐ রাজা এমন দানবীর ছিলেন যে, কেহ কিছু চাহিলেই দান করিতেন এবং দানের পরিমাণ কখনও একলক্ষ কড়ির কম হইত না। সেনবংশের তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, ভূমির বার্ষিক আয় কপর্দক-পুরাণের হিসাবে নির্ধারিত হইত। 'কপর্দক-পুরাণ' শব্দের অর্থ 'কড়িতে গণিত পুরাণ (রৌপ্য কার্ষাপণ বা কাহণ)। নেপালে এই রূপ 'পণ-পুরাণের' উল্লেখ আছে। তার অর্থ 'পণ বা তাম্র কার্ষাপণে গণিত পুরাণ বা রৌপ্য কার্ষাপণ'। আসল কথা এই যে, একসময় ভূমির রাজস্ব রৌপ্য মুদ্রায় নির্ধারিত ছিল; পরে পূর্বভারতে রৌপ্য মুদ্রার কিছু অভাব ঘটায় তদনুপাতে বাংলা-বিহারে কড়ি এবং নেপালে তাম্রমুদ্রা ব্যবহৃত হইত। এই রৌপ্যমুদ্রার ওজন ছিল মোটামুটি ২০ রতি।

কাশ্মীর দেশে আদি-মধ্য যুগে 'দিন্নার' শব্দে 'কড়ি' এবং 'অর্থ' বুঝাইত। শব্দটি 'দীনার' নামের বিকার। ভারতীয় ভাষায় 'অর্থ' বুঝাইতে প্রচলিত মুদ্রানামের ব্যবহার চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। "আমি অর্থহীন" বুঝাইতে আমরা বাংলায় "আমার টাকা বা পয়সা নাই" বলিয়া থাকি। নবম শতাব্দীর কাশ্মীরে একখারী ধানের স্বাভাবিক মূল্য ছিল ২০০ দিন্নার (কড়ি)। 'খারী' এখনকার খারওয়ার এবং ইহা আমাদের ৯০ সের বা ৮৪ কিলোগ্রামের সমান। ঐ সময়ে রাজা শঙ্করবর্মা জনৈক ভারবাহীকে দৈনিক ২০০০ দিন্নার বেতন দিতেন। অষ্টম শতাব্দীতে রাজা জয়াপীড়ের সভাপতি উদ্ভট ভট্টের দৈনিক বেতন ছিল একলক্ষ দিন্নার। একাদশ শতাব্দীতে রাজা অনন্ত শাহি-রাজপুত্র রুদ্রপাল ও দিদ্দাপালকে যথাক্রমে দৈনিক দেড়-

লক্ষ এবং ৮০ হাজার দিন্নার বেতনদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি একজন ভৃত্যকে ৯৬ কোটি দিন্নার দান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। রাজকোষে হাঁড়ি ভরিয়া কড়ি রাখা হইত।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, সেকালে কড়িতে প্রচুর অর্থের লেনদেন হইত। কিন্তু যেখানে কড়ির একটা উচ্চ অঙ্কের উল্লেখ আছে, কোনও কোনও সময় তাহার অংশবিশেষ মুদ্রা ও শস্যাদিতে দেওয়া হইত বলিয়া জানা যায়। 'রজতরঙ্গিণী'র একটি কাহিনীতে বলা আছে যে, একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা কলশের আমলে এক ব্যক্তি জনৈক মহাজনের কাছে একলক্ষ দিন্নার গচ্ছিত রাখিয়াছিল। পরে সে মাঝে মাঝে উহা হইতে অর্থে এবং জিনিসপত্রে কিছু কিছু ফেরৎ লয়। কিন্তু রাজা উচ্চলের রাজত্বকালে তাহাকে মহাজনের নামে প্রতারণার দায়ে মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইয়াছিল। তখন গচ্ছিত ধনের অবশিষ্টাংশ বলিয়া মহাজন রাজার নিকট যাহা উপস্থিত করে, তন্মধ্যে কিছু মুদ্রাও ছিল। 'লোকপ্রকাশে' দেখা যায়, দলিলে দিন্নারের অঙ্ক লেখা থাকিলেও দেনা শোধের বেলায় অনুপাত অনুসারে ধান্যের খারী দেওয়া চলিত।

আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাচীন ভারতে একরাষ্ট্রের মুদ্রার পক্ষে অন্য রাষ্ট্রে প্রবেশ ও প্রচলনে বাধা ছিল না। 'রাজতরঙ্গিণী'র একটি কাহিনীতে আছে, রাজা যশস্করের আমলে এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ দূরদেশে উপার্জিত একশত স্বর্ণমুদ্রা লইয়া স্বদেশে ফিরিয়াছিল। তাছাড়া মুদ্রাসম্পর্কিত বাধানিষেধের যুগেও সারা ভারতে প্রচারিত কড়ির ব্যাপারে উহার প্রয়োগ সম্ভব ছিল না। চাবুয়া ও কার্ষাপণ সম্পর্কেও ঐ কথা প্রযোজ্য; কারণ উহাদের ব্যবহার কোন অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না। আবার সেকালে কোন ধাতুনির্মিত মুদ্রা বাজারে প্রবেশ করিলে উহা বহু শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত থাকিত : কারণ পোদ্দার বা মুদ্রাব্যবসায়ীরা মুদ্রার ধাতুমূল্যে অনুসারে উহার দাম নির্ধারণ করিত।

৬. ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যাদি

প্রাচীন জগতে বাণিজ্যের সূচনা হয় দ্রব্যবিনিময় (barter) দ্বারা। কিন্তু এই প্রথার একটা বিশেষ অসুবিধা আছে। একজন গোরুর বিনিময়ে ঘোড়া কিনিতে চাহিলে, যদি ঘোড়াওয়ালার গোরুতে প্রয়োজন না থাকে, তবে লেনদেন হইতে পারে না। তাছাড়া গোরু ও ঘোড়ার দামে পার্থক্য থাকিলেও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য ক্রমে দুইটি একটি নির্দিষ্ট জিনিসের বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়ের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এইরূপে ক্ষেত্রোৎপন্ন ধান্যাদি শস্য এবং গবাদি পশু বাজারে অর্থরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তবে ভারতবর্ষে এবং আরও অনেক দেশে মুদ্রাপ্রচলনের পরেও নানারকমের দ্রব্যবিনিময় একেবারে বন্ধ হয় নাই।

আমরা দেখিয়াছি, মধ্যযুগের কাশ্মীরে মুদ্রার পরিবর্তে অনেক সময় ধান্যাদি ব্যবহৃত হইত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে Stein এবং Lawrence লিখিয়াছেন যে, তখন কাশ্মীরের বাজারে রৌপ্যমুদ্রার অভাব ছিল এবং গৃহস্থঘরের চাকরবাকর ছাড়াও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী পর্যন্ত শস্যে বেতন পাইতেন। Lawrence সাহেবকে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নিজের এবং তাঁহার বিভাগীয় কর্মচারীদিগের জন্য তৈলবীজে বেতন দেওয়া হইয়াছিল। তখন ১৫। ২০ খারী (খারওয়ার) শালি ধান্য গৃহস্থঘরের চাকরের বার্ষিক বেতন ছিল। মহারাজ

গুলাব সিংহের আমলে রৌপ্যমুদ্রায় রাজকর্মচারীদের বেতন ধার্য করা হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্ধারিত অনুপাত অনুসারে শস্যেই কর্মচারীরা বেতন পাইত।

'লোকপ্রকাশে' দেখা যায়, একজন ভৃত্যের বার্ষিক বেতন ১৫ খারী ধান্য বা ৫০০০ দিন্নার স্থির করা হয়। অর্থাৎ এখানে ৩২৫।৩৫০ কড়িকে একখারী ধান্যের সমমূল্য ধরা হইয়াছে। এই গ্রন্থে 'দিন্নারোত্তমর্ণচীরিকা' এবং 'ধান্যোত্তমর্ণচীরিকা'র উল্লেখ আছে। ইহার প্রথমটির অর্থ কড়িতে টাকা ধার লইবার খৎ এবং দ্বিতীয়টির অর্থ ধান্যে টাকা ধার লইবার খৎ। এইরূপ 'দিন্নারহুণ্ডিকা' এবং 'ধান্যহুণ্ডিকা' বলিতে কড়িতে এবং ধান্যে প্রদত্ত অর্থের হুণ্ডী বুঝাইত। 'লোকপ্রকাশ' গ্রন্থখানি একাদশ শতাব্দীতে ক্ষেমেন্দ্র কর্তৃক লিখিত হয়; কিন্তু ইহাতে বহু পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ আছে।

জগতের অনেক দেশের ন্যায় প্রাচীন ভারতে ক্ষেত্রোৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে ক্ষেতের কর নির্ধারিত হইত। একসময় চীন এবং ব্রহ্মদেশে যথাক্রমে ধানের বস্তা ও ধানভরতি ঝুড়ি দ্বারা কর আদায় করা হইত। এই কারণেই অর্থ হিসাবে ফসলের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' বলা হইয়াছে যে, বৈবস্বত মনুকে প্রথম রাজা নির্বাচিত করিয়া লোকে তাঁহাকে শস্যের ষষ্ঠ ভাগ, পণ্যের দশম ভাগ এবং কিছু নগদ টাকা কর হিসাবে দিতে স্বীকার করে। অশোকের লেখ হইতে জানা যায়, তিনি প্রজার নিকট হইতে বলি (অর্থাৎ নগদ টাকায় দেয় কর) এবং ভাগ (অর্থাৎ ক্ষেত্রোৎপন্ন ফসলের রাজার প্রাপ্য অংশ) গ্রহণ করিতেন। আদি-মধ্য যুগে ভারতের কোন কোন অংশে ভূমির রাজস্ব ধান্যে নির্ধারিত হইত। যেমন আসামের তাম্রশাসনে দেখা যায়, একখণ্ড ভূমিকে ধান্যচতুঃসহস্রোৎপত্তিমতী বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ ভূমিখণ্ডে বৎসরে দেশ-প্রচলিত পরিমাপবিশেষের চার হাজার মান পরিমিত ধান্য রাজকোষের প্রাপ্য বলিয়া নির্ধারিত ছিল।

মনুর মতে নিম্নশ্রেণীর রাজকর্মচারীরা দৈনিক এক হইতে ছয়পণ পর্যন্ত বেতন এবং একজোড়া বস্ত্র ও একদ্রোণ ধান্য ভাতা পাইত; কিন্তু উচ্চশ্রেণীর কর্মচারীরা জায়গীর ভোগ করিতেন। ১০২৪ মুষ্টি ধান্যে এক দ্রোণ হইত। কৌটিল্য বিভিন্ন শ্রেণীর রাজকর্মচারীদের বেতন বৎসরে ১২০ হইতে ৪৮০০০ পণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মতে ৬০ পণে এক আঢ়ক (২৫৬ মুষ্টি) ধরিয়া ধান্যে বেতন দেওয়া চলিত। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, রাজকোষে অর্থাভাব ঘটিলে বনজাত দ্রব্য গবাদি পশু এবং ভূমি প্রভৃতি দ্বারা বেতনদানের ব্যবস্থা হইতে পারিত।

৭. **ভূমি, গবাদি পশু ও অন্যান্য দ্রব্য**

কুষাণ আমলের 'মনুস্মৃতি'তে বলা হইয়াছে যে, গ্রামবাসীদের নিকট রাজার প্রাপ্য খাদ্য, পানীয়, ইন্ধন প্রভৃতি গ্রামশাসক কর্মচারী ভোগ করিবেন এবং ১০, ২০, ১০০ ও ১০০০ গ্রামের শাসকগণ যথাক্রমে ১ কুল ভূমি, ৫ কুল, একটি গ্রাম এবং একটি নগর ভোগ করিবেন। একজন চাষী একখানি হল দ্বারা এক বৎসরে যতটা ভূমি কর্ষণ করিতে পারিত, এক কুল ভূমি ছিল তার দ্বিগুণ।

সপ্তম শতাব্দীর চীনদেশীয় পরিব্রাজকও বলিয়াছেন যে, রাজার মন্ত্রী প্রভৃতি কর্মচারীদের ভরণপোষণ রাজদত্ত ভূমি, নগর প্রভৃতি দ্বারা নির্বাহ হইত। তাম্রশাসনাদিতে এইরূপ জায়গীরের উল্লেখ আছে। নিজ জায়গীরের মধ্যে কোন ভূমিখণ্ড দেবতা-ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে

নিষ্কর দানের ব্যবস্থা করিতে হইলে রাজকর্মচারীদিগকে রাজার নিকট প্রার্থনা জানাইতে হইত। জায়গীরে কর্মচারীর স্বত্ব থাকিত না। কিন্তু ভূমিতে স্বত্ব থাকিলেও উহা নিষ্কর করাইতে হইলে রাজকোষে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হইত। কারণ ভূমি রাজার। তাই রাজস্বের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। নচেৎ দানের পুণ্য সমস্তটাই রাজার ভাগে পড়িবার কথা। যথাযোগ্যভাবে নিষ্করদানের ব্যবস্থা হইলে তজ্জনিত পুণ্যের ৬ ভাগের ৫ ভাগ দাতা এবং ১ ভাগ রাজা পাইতেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত বিশ্বরূপসেনের মধ্যপাড়া তাম্রশাসনে জায়গীরমধ্যে তিনটি নিষ্কর সম্পত্তি সৃষ্টির উল্লেখ আছে। সেগুলি রাজপুত্র সূর্যসেন, রাজপুত্র পুরুষোত্তম সেন এবং মহাসান্ধিবিগ্রহিক নাঞিসিংহের জায়গীরে অবস্থিত ছিল। বিশ্বরূপসেন এই তিনটি নিষ্কর সম্পত্তির সৃষ্টি অনুমোদন করিয়াছিলেন। রাজা দামোদরের মেহার তাম্রশাসনে জায়গীরের অন্তর্গত দুইটি নিষ্কর গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দুইটি মহাসান্ধিবিগ্রহিক মুনিদাস এবং মহাক্ষপটলিক দলএব নামক দুই রাজকর্মচারীর জায়গীরের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

বনজাত দ্রব্য, গবাদি পশু এবং ভূমি দ্বারা কর্মচারীর বেতনদান বিষয়ে কৌটিল্যের মত আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অনেকেই জানেন যে, ঋগ্বেদে (১।৮৩।৪) অশ্ব, গো এবং অন্যান্য পশুকে ধনের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে।

৮. মুদ্রাপ্রচারের অধিকার

আমাদের অলোচনা হইতে দুইটি বিষয় মোটামুটি বুঝা যাইবে। প্রথমতঃ, প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রকর্তৃক প্রচারিত মুদ্রাব্যতীত বহুপ্রকারের বস্তু বাজারে অর্থ হিসাবে চলিত। দ্বিতীয়তঃ স্বরাষ্ট্রে মুদ্রার প্রচার ও প্রবেশের ব্যাপারে রাজশক্তির ক্ষমতা মোটেই নিরঙ্কুশ ছিল না। একবার ইংরাজ বণিকেরা মরাঠারাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর নিকট তাহাদের প্রস্তুত মুদ্রা মরাঠারাজ্যে প্রচলনের আদেশ প্রার্থনা করে। শিবাজী জানান যে, এ ব্যাপারে তিনি অনুমতিও দিবেন না, নিষেধও করিবেন না ; কারণ ইংরাজমুদ্রা মরাঠা প্রজার পছন্দ হইলে তাহারা গ্রহণ করিবে, অপছন্দ হইলে বর্জন করিবে। এই নীতির ফলে শিবাজীর রাজ্যে ২৬ প্রকার স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং তাঁহার রাজকোষে ৩২ প্রকার স্বর্ণমুদ্রা এবং ৬ প্রকার রৌপ্যমুদ্রা দেখা গিয়াছিল। তম্মধ্যে বিদেশীয় মুদ্রারও অভাব ছিল না। মধ্যযুগের শেষ ভাগের মহারাষ্ট্র সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, রাজ্যে নূতন মুদ্রা নির্মাণ অথবা উহা বন্ধ রাখার ব্যাপারে সরকারের কিছু ভাবিবার নাই। কারণ বাজারে টাকার প্রয়োজন থাকিলে মহাজন, বণিক্ এবং দোকানদারেরা তাহা ভাবিয়া দেখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সোনা-রূপা টাঁকশালে আনিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া লইবে। সরকারের কাজ কেবল তাহাদের সোনা-রূপা লইয়া তাহাদিগকে পরিমাণমত নূতন মুদ্রা সরবরাহ করা। প্রাচীন ভারতের মুদ্রানীতিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনেকটা এই ধরণের ছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বুদ্ধঘোষের 'বিসুদ্ধিমগ্গ'-সংজ্ঞক টীকা গ্রন্থে কার্ষাপণ নামক রৌপ্যমুদ্রা সম্পর্কে একটি আলোচনা আছে। বলা হইয়াছে যে, থালা-ভরতি কার্ষাপণ দেখিয়া একটি অজাতবুদ্ধি শিশু, জনৈক গ্রাম্য চাষা এবং একজন অভিজ্ঞ স্বর্ণকার বা পোদ্দারের মনোভাব একরূপ হইবে না। শিশুটি কেবল দেখিবে মুদ্রার গায়ের চিত্র ; মুদ্রার দ্বারা যে জিনিষপত্র কেনা যায়, তাহা সে জানিবে না। চাষাটি মুদ্রার গায়ের

চিত্র এবং উহার ক্রয়শক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইবে ; কিন্তু বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে কি পার্থক্য এবং কোন্ মুদ্রাটি খাঁটি, কোন্‌টি অর্ধমূল্যে ও কোন্‌টি জাল, তাহার সে বিষয়ে কোন জ্ঞান থাকিবে না। কিন্তু মুদ্রাব্যবসায়ীর জ্ঞান কেবল ঐ শিশু ও চাষার জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে সীমাবন্ধ থাকিবে না। মুদ্রাগুলি হাতে লইয়া, বাজাইয়া, চাখিয়া ও শুঁকিয়া সে বলিতে পারিবে, কোন স্বর্ণকার কোন মুদ্রা নির্মাণ করিয়াছে এবং উহা কোন গ্রাম, নগর,. পাহাড় বা নদীতীরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, রৌপ্য কার্ষাপণের চিহ্নাবলীর মধ্যে এমন কিছু থাকিত না, যাহাতে উহা কোন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচারিত, সে কথা বুঝা যায়। আমরা মনে করি, অন্ততঃ বুদ্ধঘোষের আমলে রৌপ্য কার্ষাপণ কোন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচারিত হইত না ; উহার নির্মাণ ও প্রচার স্বর্ণকার বা মুদ্রানির্মাতাদেরই হাতে ছিল। ইহাতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কতখানি ছিল, বলা কঠিন। সবসময়ে রাষ্ট্রের পক্ষে দায়িত্ব পালনের শক্তিও থাকিত না।

দক্ষিণ ভারতের শাতবাহন রাজগণের মুদ্রা সাধারণতঃ তামা, সীসা এবং খাদযুক্ত তাম্রে নির্মিত হইত। কিন্তু কোণ্ডপুরে আবিষ্কৃত ছাঁচ হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের রাজ্যে ঐরূপ মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে রৌপ্যকার্ষাপণ এবং পশ্চিমভারতীয় শকরাজগণের রৌপ্য-মুদ্রাও নির্মিত হইত। ইহা শাতবাহন সরকারের কাজ হইতে পারে না ; অবশ্যই মুদ্রাব্যবসায়ীদের কাজ।

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় অনেক সময় মুদ্রাপ্রচারকারীর উপাধি দেখা যায় সেনাপতি, মহাসেনাপতি, মহাগ্রামিক, মহারাষ্ট্রী, তলবর, মহাতলবর ইত্যাদি। ইঁহারা সকলেই রাজ-কর্মচারী বা সামন্ত। মহাগ্রামিক ও মহারাষ্ট্রী ত সামান্য পরগনার শাসকের সংজ্ঞা। আবার কখনও কখনও পঞ্চনৈগম (অর্থাৎ পাঁচটি বণিক্‌সমিতির সমবায়) এবং হিরণ্যাশ্রমনামক ধর্ম-সংস্থাপ্রভৃতির প্রচারিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ তগরনগর এবং ত্রিপুরী, উজ্জয়িনী, ঐরিকিণী ও বারাণসীনগরীর মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি অবশ্যই স্থানীয় বণিক্‌সভা কর্তৃক প্রচারিত, কোন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচারিত নহে। এই প্রসঙ্গে গান্ধিক (গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ীর শ্রেণী) এবং কৌশাম্বিক (কৌশাম্বীর বণিক্‌শ্রেণী) কর্তৃক প্রচারিত মুদ্রারও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই মুদ্রাগুলির কোনটিই রাজপ্রচারিত নহে।

'পৃথ্বীরাজবিজয়' কাব্যে (৫।৮১ ও ৯০) বলা হইয়াছে যে, শাকম্ভরীর চৌহানরাজ অজয় বা সল্হণ (আঃ ১১১৫-২৫ খ্রী.) 'রূপক' অর্থাৎ ঐ নামের রৌপ্যমুদ্রাদ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং তদীয় মহিষী সোমলেখা প্রতিদিন নূতন রূপক প্রচার করিতেন। রাজা অজয়ের রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা মথুরা ও রাজস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পরবর্তী ১১৭১ খ্রীষ্টাব্দের একখানি শিলালেখে ১৬ অজয়রাজ-দ্রম্ম (রূপক) দিয়া একটি বাড়ি কিনিবার কথা আছে। সোমলদেবী অর্থাৎ রাজ্ঞী সোমলেখার নামাঙ্কিত রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। এই রাজ্ঞীর মুদ্রাপ্রচার হইতে বুঝা যায় যে, সেকালে মুদ্রাপ্রচারের অধিকার স্বাধীন রাজায় সীমাবন্ধ ছিল না। রাজ্ঞীর প্রচারিত মুদ্রা রাজকর্মচারীর দ্বারা প্রচারিত মুদ্রার সমতুল্য। সুতরাং যে কোন মুদ্রাই বাজারে চলিত। উহা কাহার প্রচারিত তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হইত না।

এ সম্পর্কে আদি-মধ্যযুগের আর একটি শিলালেখের সাক্ষ্য বিশেষ মূল্যবান্। ইহা

১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দের রেওয়া শিলালেখ। ইহাতে আছে কলচুরিবংশীয় শৈব নরপতি বিজয়সিংহের সামন্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মলয়সিংহের একটি প্রশস্তি। বিজয়সিংহ যে কেবল একজন পরম-মাহেশ্বর ছিলেন তাই নয়; দেড়শত বৎসর পূর্বে তাঁহার জনৈক পূর্বপুরুষ স্বীয় গুরু শৈব সাধু বামশম্ভু বা বামদেবকে নিজরাজ্য দান করিয়াছিলেন এবং তখন হইতে কলচুরি রাজগণ আপনাদিগকে বামদেবের সামন্ত বলিয়া প্রচার করিতেন। বৌদ্ধবংশীয় মলয়সিংহ এবং তদীয় পূর্বপুরুষগণ শৈব কলচুরিবংশের সামন্ত ছিলেন। মলয়সিংহ কর্করেডির বিদ্রোহী সামন্ত সল্লক্ষণকে দমন করিয়া প্রভুর প্রিয়পাত্র হন। বলা হইয়াছে যে, এই মলয়সিংহ ১৫,০০০ টঙ্ক নামক রৌপ্যমুদ্রা ব্যয়ে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার এই কীর্তিই বর্তমান শিলালেখের মুখ্য বিষয়। ঐ মুদ্রাসম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, উহাতে ভগবানের মূর্তি অঙ্কিত ছিল। বৌদ্ধ মলয়সিংহের কাছে 'ভগবান্' অবশ্যই বুদ্ধ। সুতরাং বুদ্ধমূর্তিযুক্ত রৌপ্য মুদ্রা বৌদ্ধ মলয়সিংহই প্রচার করিয়াছিলেন, শৈব বিজয়সিংহ নন। দেখা যাইতেছে, সামন্তনৃপতি মলয়সিংহ দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক রৌপ্যমুদ্রা নির্মাণ করান। উহা বাজারে প্রচারের জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। অবশ্য ঐ মুদ্রার একটিও এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কোনও বিশেষ ব্যাপার উপলক্ষে অল্পসংখ্যায় মুদ্রা নির্মাণের আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত জীবদেবের 'ভক্তিভাগবত' অনুসারে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র এক প্রকার নূতন স্বর্ণমুদ্রা প্রচার করেন; উহাতে রাজার নাম এবং গোপাল অর্থাৎ বালকৃষ্ণের মূর্তি অঙ্কিত ছিল। প্রতাপরুদ্রের শত শত বৎসর পূর্ববর্তী বহু নরপতির অগণিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু মাত্র কয়েক শত বৎসর পূর্বে প্রচারিত এই স্বর্ণমুদ্রার একটিও এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী

১. J. Allan, *Catalogue of Indian Coins in the British Museum* :
(1) *Ancient India*. London, 1936, (2) *Gupta Dynasty*, etc., London, 1914.

২. D. R. Bhandarkar, *Carmichael Lectures* : *Ancient Indian Coins*, Calcutta, 1921.

৩. D. C. Sircar, *Studies in Indian Coins*. Delhi, 1967.

৪. D. C. Sircar, *Early Indian Numismatic and Epigraphical Studies*, Calcutta, 1977.

৫। D. C. Sircar, 'Media of Exchange in Ancient and Medieval India', in *Journel of Ancient Indian History*, Vol. X, 1976-77.

৬। V. A. Smith, *Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta*. Vol. I, Oxford, 1906.

৭। A. Stein, *Kalhana's Rajatarangini*, Vol. II, London, 1900.

দ্বিজ কবিচন্দ্রের রাধিকামঙ্গল

শ্রীচিত্তরঞ্জন লাহা

বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের (রাজ্যকাল ১৭১২-৪৮)[১] সভাকবি দ্বিজ কবিচন্দ্রের (প্রকৃত নাম শঙ্কর চক্রবর্তী) একাধিক রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁর রচিত বৃহৎ গোবিন্দমঙ্গল[২] কাব্যের কয়েকটি পালার (যেমন, কর্ণমুনির পালা, প্রহ্লাদ চরিত্র[৩]) পাণ্ডুলিপি আমরা পেয়েছি। এঁর রচিত অধ্যাত্ম রামায়ণ (যা দক্ষিণ রাঢ়ে বিষ্ণুপুরী রামায়ণ নামে পরিচিত) একদা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

দ্বিজ কবিচন্দ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী বৈষ্ণব কবি। শিবায়ন[৪] ভারত পাঁচালী, কপিলামঙ্গল[৫] ইত্যাদি কাব্য রচনা করলেও ইনি যে মূলতঃ বৈষ্ণব কবি এবং নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব সে সম্পর্কে সন্দেহের কারণ নেই। এঁর রচিত গোবিন্দমঙ্গলের বিভিন্ন পালাগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে।

আমাদের মনে হয় দ্বিজ কবিচন্দ্র শুধু গোবিন্দমঙ্গল নয়, একটি রাধিকামঙ্গল কাব্যও রচনা করেছিলেন। রাধিকামঙ্গলকে গোবিন্দমঙ্গলের অংশবিশেষ বলে ভাবা যেতে পারে। কেননা রাধিকার কথা যেখানে আছে গোবিন্দের কথাও সেখানে থাকবে। কিন্তু রাধিকামঙ্গল এবং গোবিন্দমঙ্গল দুটি পৃথক্ কাব্য বলেই আমাদের ধারণা।

১. ১৭১৮ (?) ৪৮, দ্রষ্টব্য বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড), শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২১৮।

২. যতদূর জানি, সম্পূর্ণ গোবিন্দমঙ্গলের পুঁথি অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত। বিভিন্ন পালার পুঁথি বহু পাওয়া যায়। এই প্রাপ্ত পালাগুলি একত্র করে 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল' নামে মাখনলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ১৩৪১)।

৩. প্রাপ্ত পুঁথির লিপিকাল ১২২৯ সাল, ৩রা আষাঢ়, বুধবার।

৪. কবিচন্দ্র রচিত শিবায়ন কাব্যের উল্লেখ একমাত্র শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থেই পরিদৃষ্ট হয়। দ্রষ্টব্য—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৮-১৯।

৫. কপিলামঙ্গলকে শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় গোবিন্দমঙ্গলের পালারূপেই উল্লেখ করেছেন (দ্রষ্টব্য—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৩৫৭)। কিন্তু কপিলামঙ্গল বোধ হয় একটি পৃথক্ কাব্য। সীমান্ত বাংলায় বিভিন্ন কবি রচিত অজস্র কপিলামঙ্গল কাব্যের পুঁথি পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য-ধারায় কপিলামঙ্গল একটি উল্লেখযোগ্য উপধারা। বিষয়টি অনুসন্ধান ও আলোচনা-সাপেক্ষ।

গোবিন্দমঙ্গল কাব্য কয়েকটি পালার সমষ্টি এবং প্রত্যেক পালায় সেই পালাটির নামোল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে কবি মূল কাব্যটির নামোল্লেখও করেছেন। যেমন, "ইতি গোবিন্দ-মঙ্গলে প্রসাদ চরিত্র সমাপ্ত"। রাধিকামঙ্গলের যে পুঁথিটি আমরা দেখেছি তার সমাপ্তিতে আছে -"রাধিকামঙ্গল গীত কবিচন্দ্রে গায়।হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়।ইতি শ্রীমতীর কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত"। অন্যত্র (পুঁথি পৃষ্ঠা ৫) আছে "রাধিকামঙ্গল গীত করহ শ্রবণ। তাহার কলঙ্ক কৃষ্ণ করিল ভঞ্জন"। অর্থাৎ প্রাপ্ত পুঁথিটি রাধিকামঙ্গল কাব্যান্তর্গত শ্রীমতীর কলঙ্কভঞ্জন পালা।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, রাধিকামঙ্গলের কাহিনীও প্রকারান্তরে কৃষ্ণের মহত্ত্বই প্রকাশ করেছে; কাজেই রাধিকামঙ্গলে আসলে গোবিন্দমঙ্গল কাব্যের অন্যতম পালা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু স্মরণীয় যে, গোবিন্দমঙ্গলের অনান্য পালাগুলি "মঙ্গল" নামে অভিহিত হয়নি, হয়েছে পালা নামে।[১] যেমন "কণ্বমুনির পালা"।[২] তাছাড়া অন্যান্য পালার ক্ষেত্রে কবি মাঝে মাঝেই মূল কাব্যের ("গোবিন্দমঙ্গল") নামটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন[৩]; কিন্তু রাধিকা-মঙ্গল কাব্যের প্রাপ্ত পুঁথির চব্বিশটি পৃষ্ঠাতে কুত্রাপি গোবিন্দমঙ্গলের নাম উচ্চারণ করা হয়নি। সর্বশেষ যুক্তি এই যে, গোবিন্দমঙ্গল কাব্য রচয়িতার পক্ষে রাধিকামঙ্গল কাব্য রচনা করা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

রাধিকামঙ্গলের শ্রীমতীর কলঙ্কভঞ্জন পালার পুঁথিটি আদিতে খণ্ডিত। প্রথম ৪টি পাতা (অর্থাৎ ৮ পৃষ্ঠা) উই-ইঁদুরের ভোজনোৎসবে পরিণত হয়েছে। ৫ম থেকে শেষ—সর্বমোট ১২টি পাতা—অর্থাৎ ২৪ পৃষ্ঠার মধ্যেই পালাটি সমাপ্ত।

পুঁথির কাগজ বেশ পুরু, মনে হয় দুটি পাতা একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া। হরীতকীর কালিতে লেখা এই পুঁথিটির লিপিকাল ১২১৪ সাল ("তাং ১০ শ্রাবণ, বার বৃহস্পতি—পঞ্চমী শুক্লপক্ষি। লিপিকর বাসুদেব শর্মা—দুলমি")। দুলমি পুরানো পাতকুম রাজ্যের (বর্তমানে বিহারের সিংভূম জেলার) একটি গ্রাম। পুঁথির আয়তন ১২" × ৪"।

প্রাপ্ত পুঁথির প্রথম পৃষ্ঠার (অর্থাৎ পালার নবম পৃষ্ঠার) পাঠ নিম্নরূপ। পূর্ববর্তী কাহিনী অনুমান-গম্য।

"––––––গৃহকর্মে রানী হৈল রত।
রাধিকার বাড়ি যায় হঞা উনমত॥
হস্তে বেস্তে প্রবেশিলা রাধার মন্দিরে।
দেখিল যে[৪] রাধা বস্যা পালঙ্ক উপরে॥
রাধিকা প্রেমের নদী রসের পাথার।

১. ক্ষেত্রবিশেষে 'পালা' কথাটিও অনুক্ত। যেমন, "সপ্তমস্কন্ধে প্রসাদ চরিত্র শুনে এক চিতে" (কবিচন্দ্র রচিত 'প্রসাদ চরিত্র', পুঁথি পৃ. ১)।
২. পুঁথির সমাপ্তিতে আছে "ইতি কণ্ব মুনির পারণ পাল্লা সমাপ্ত" (লিপিকাল ১০৭৫ সাল; অবশ্যই মল্লাব্দ)। পালাটি যে গোবিন্দমঙ্গলেরই পুঁথিতে তার অসংশয়িত প্রমাণও আছে।"ভবিষ্যপুরাণ দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।গোবিন্দমঙ্গল গীত কৃষ্ণের কৃপায়।"
৩. যেমন দিবারাসের পুঁথিতে দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় গোবিন্দমঙ্গল"।
৪. পুঁথিতে সর্বত্র 'জে'।

রসিক নাগর তাথে করিল সাতার ॥
কাজরেতে মিশাইল যেন[১] গোরচনা।
নীলমনি[২] মাঝে যেন বসিল কাঁচা সোনা[৩] ॥
কুবলয় মাঝে যেন চম্পকের দাম[৪]।
নবমেঘে যেন বিজুরি অনুপাম[৫] ॥
কৃষ্ণে ঠেকনা দিঞা রাধা বইসে কোলে।
কালিন্দীর কূলে যেন সোসব কুম্ভ হেলে ॥
বেণু-চূড়া হেরাহেরি ফিরাফিরি বাহু।
শরদ পূর্ণিমা চান্দে গরাসিল রাহু ॥
দোঁহার গলাতে দোঁহে পদ্মের মৃণাল।
মদনে মগন হয়া হাসএ গোপাল ॥
কোমল (?) উপরে চন্দ্র খঞ্জন গঞ্জন।
চক্রবাক তেজপুঞ্জ দোলে ঘন ঘন ॥
আবেশে[৬] অবশ হঞা দোঁহে[৭] নিদ্রায়।
জটিলা দেখিয়া আসি করে হায় হায় ॥
উঁকি দিয়া চায়া দেখে আয়ানের[৮] মাতা।
শুন শুন আগো রাই এ কেমন কথা ॥"

রাধাকৃষ্ণ লজ্জায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। আয়ানের মাতা দরজায় শিকল তুলে দিলেন। উদ্দেশ্য—যশোদাকে ডেকে নিয়ে এসে পুত্রের কুকীর্তির প্রমাণ প্রদর্শন করা। তবে ব্যাপারটি এমন লজ্জাজনক যে যশোদাকে খুলে বলাও কঠিন। তাই—

"জটিলা বলেন আমি কি কর্যা বলিব।
প্রকার প্রবন্ধ করা[৯] তারে লঞা যাব ॥
এত বলি ধীরে ধীরে গেলা রানী পাশে।
হরিষ বিষাদ হঞা যশোমতী ভাসে ॥
বিড়ালের[১০] কোলে বসি আছএ মূষিক।
বড়ই অপূর্ব কথা ঝ'ট আসি দেখ ॥"

---

১. পুঁথিতে 'জেন'।
২. ঐ সব 'ণ'ই দন্ত্য ন, এবং প্রায় সর্বত্রই দীর্ঘ ঈ কার স্থলে হ্রস্বই-কার।
৩. ঐ 'সনা'।
৪. ঐ 'দ্বাম'।
৫. ঐ 'য়নুপাম'।
৬. ঐ 'আবেসে'।
৭. ঐ 'দহে'।
৮. ঐ 'য়ানের'।
৯. অর্থাৎ কর্যা।
১০. পুঁথিতে সব বিড়ালই 'বিরাল'।

যশোদা জটিলার সঙ্গে ছুটে গেলেন সেই অপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার জন্য। গিয়ে দেখেন—

"যে যেন ভাবনা করে তেমত সে পায়।
রাধা হল্যা মূষিক মার্জার যদুরায় ॥
ভাবগ্রাহী জনার্দন বাধা কল্পতরু।
বিড়ালের মূর্তি ধরি অখিলের গুরু ॥
জটিলা বদন হেরি যশোদা বিহাসে।
কপাট ঘুচায়্যা ঘরে হাঁসিয়া প্রবেশে ॥
দেখিয়া বিস্ময় হৈল আয়ানের মাতা।"

শেষপর্যন্ত—

"মার্জার হইয়া কৃষ্ণ বাহির হইল।
মূষিক হইয়া রাহী ঘরেতে রহিল ॥"

যশোদা বাড়ি ফিরে এলে কৃষ্ণ জানতে চাইলেন তিনি কোথায় গিয়েছিলেন। যশোদা কৃষ্ণকে মূষিক-মার্জারের অপূর্ব বৃত্তান্ত শোনালেন। কৃষ্ণ মুখে বললেন, পরদিন তিনিও ঐ দৃশ্য দেখতে যাবেন, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, আগামী কালই রাধার কলঙ্কভঞ্জন করবেন। এদিকে—

"বৃষভানু সুতা রাই বিরল মন্দিরে।
কেহো পাছে জানে বল্যা[১] কান্দে ধীরে ধীরে ॥
কান্দিতে কান্দিতে বলে যা করিলে শ্যাম।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কিনী হৈল নাম ॥
কলঙ্কিনী নাম হৈল তারে নাহি ভয়।
হেন অপযশ যেন যুগে যুগে[২] রয় ॥
তোমার কলঙ্ক যেন অঙ্গ আভরণ[৩]।
ভাগে পুণ্যে বহুকাল কর্যাছি অর্জন ॥"

কবিচন্দ্রের রাধার মনে একই সঙ্গে দুটি পৃথক ভাবের খেলা— একদিকে কৃষ্ণ-কলঙ্কের প্রতি দুর্মর স্পৃহা, অপরদিকে কৃষ্ণ-কলঙ্কের জন্য দারুণ ভয়। তিনি নষ্টচন্দ্র দর্শন করেছিলেন কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী হবার জন্য।

"শশধর পানে চাহি শির কর নমি।
শ্যাম কলঙ্কিনী হব বর দেহ তুমি ॥
সেই হৈতে পাইয়াছি তোমা হেন ধন।
কিন্তু ননদিনীর কথা অশেষ আগুন ॥
এতেক বিলাপ করি হৈলা অচেতন।
রাধার তাপের কথা জানে কন জন ॥

১. পুঁথিতে 'বল্যা'।
২. ঐ 'জগে জগে'।
৩. ঐ 'অভরণ'।

কবিচন্দ্র বলে রাধার আর কেহ নাঞি।
রাধারে রাখিতে কেবল ঠাকুর কানাঞি॥"

কবির কথা মিথ্যা নয়। ওদিকে মায়ের কোলে কৃষ্ণ মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন। শুরু হয়েছে রাধার কলঙ্কভঞ্জন নাটকের প্রস্তাবনা।

"কোলে বসি চুম্ব খায় মায়ে চুম্ব দিয়া।
ঐরূপে পড়িলা ভুমে মূর্ছিত হইয়া॥
বক্ষে ধারা বহে কৃষ্ণ মায়া বাক্য বলে।
কেনে বাছাধন বল্যা রানী নিল কোলে॥
মায়ের পানে চায় কৃষ্ণ স্থির আঁখি করি।
মাগো কেমন কেমন করে প্রাণ এই আমি মরি॥
মরি মরি শব্দ করি বাক্য নাহি মুখে।
যশোমতী ভুমে পড়ি কৃষ্ণ করি বুকে॥"

যশোদা হাহাকার করে উঠলেন। গোপীরা সব কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন। জটিলাও এলেন বধূকে সঙ্গে নিয়ে। কুটিলা খুব খুশি।

"জটিলার কন্যা বলে মোর ভাল হৈল।
তোর মোর ভাল হৈল রাধার মত গেল॥
তুমি আমি কি করিব বিধির লিখন।
আপদারার মরণ নাঞি কবিচন্দ্রে কন॥"

গোপীদের দেখে যশোদা ত্রিপদীর দীর্ঘ স্রোতে বিলাপের জোয়ার সৃষ্টি করলেন।

"নন্দের সর্বস্ব পাই উঠ বাছা কানাঞি
বাথানিতে ডাকেন তুমার বাপ।
আমার কথাটি রাখ আঁখি মেলি চাঞা দেখ
না চাহিলে জলে দিব ঝাঁপ॥
আর না যাইবে গোঠে কালিন্দী যমুনাতটে
বংশীবট কদম্বের তলে।
সন্ধ্যার সময়ে[১] কানু আর না পুরিবে বেণু
সেই বেশে না করিবে কোলে॥"

সকলের চোখেই জল। শুধু—

"জটিলার ভয়ে রাধা কান্দিতে না পারে।
মুখে নাহি সরে বাক্য অন্তরে গুমুরে॥"

রাধার অপবাদটুকু রইল, কিন্তু সেই অপবাদের সান্ত্বনাটুকু রইল না।

"কলঙ্কিনী নাম হৈল তারে না ডরাই।
এই দুখ মনে রৈল ছাড়িল কানাঞি॥
প্রাণনাথ ছাড়া[২] গেলে গলে পদ দিয়া।
কৃষ্ণ সঙ্গে মোর প্রাণ যাকু গড়াইয়া॥"

১. পুঁথিতে 'সমএ'।
২. অর্থাৎ ছাড়্যা (=ছাড়িয়া)।

রাধার মনের অবস্থা অনুমান করে কৃষ্ণ আর বিলম্ব করলেন না। চিকিৎসক রূপ ধরে আবির্ভূত হলেন। এদিকে বালক কৃষ্ণ যশোদার কোলেই শুয়ে আছে।

"এক মূর্তি যশোদার কোলে শুঞা থাকে।
চিকিচ্ছক মূর্তি হয়্যা যশোদাকে ডাকে॥"

চিকিৎসক নিজেকে কৃষ্ণের মৈত্র বলে পরিচয় দিলেন এবং যশোদাকে আশ্বাস দিলেন যে, কৃষ্ণের ব্যাধি কিঞ্চিৎ গুরুতর হলেও এ ব্যাধি নিরাময়ের ঔষধ তিনি জানেন। তবে সর্বাগ্রে কৃষ্ণকে মায়ের কোল থেকে সারিয়ে দেওয়া দরকার।

"যশোদার পুত্র দিল রাধিকার কোলে।
রাধা কোলে বৈসে কৃষ্ণ কবিচন্দ্রে বলে॥"

যশোদা জানতে চাইলেন ছেলেকে বাঁচানোর জন্য কোন্ কোন্ বস্তুর প্রয়োজন।

"বৈদ্য বলে এই ব্যাধি বড় কর‍্যা বাসি।
অবিলম্বে আন গিয়া নৌতন কলসি॥
যশোমতী কলসী আনিয়া১ বৈদ্যে দিল।
হাজার গবাক্য২ কলসীর গাত্র বৈল॥
বৈদ্য বলে যশোমতী মোর কথা শুন।
এক কুম্ভ জল পতিব্রতা হাথে আন॥"

যশোদা সবাইকে অনুরোধ করলেন জল আনতে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন যে, জটিলা-কুটিলার মতো পতিব্রতা রমণী আর কেউ নেই। যশোদা জটিলার পায়ে ধরে অনুরোধ করলেন। জটিলার দয়া হল। কন্যাকে পাঠাল জল আনতে।

"কুটিলা কলসী লঞা মুচুকি হাসিল॥
এত লোক থাকিতে আমারে সভে বলে।
আমা হৈত্যে সতী নাহি এ মহীমণ্ডলে॥"

কিন্তু দর্পহারী ভগবান জাগ্রত। যমুনায় কলসি ডুবিয়ে এক পা বাড়াতে-না-বাড়াতেই সব জল মাটিতে পড়ে গেল। শূন্য কলসি নিয়ে কুটিলা ফিরে এল সকলের ধিক্কার কুড়াতে। জটিলা এবার নিজে কলসি নিয়ে গেল জল আনতে। কিন্তু,

"শূন্য কুম্ভ লয়্যা আল্য বৈদ্য দেয় গালি।
কলসীটি লঞা কেবল কলঙ্কের ডালি॥"

একে একে সব গোপী জল আনতে গেল। গোপীরা ফিরে আসে, জল কিন্তু আসে না।

"যত জন জলে যায় জল নাঞি আস্যে৩।
সতী হঞা অসতী হইয়া সভে বসে॥
বৈদ্য বলে ছি ছি সব ব্রজপুর নষ্ট।
যে মাগী প্রথমে গেল সেই মাগী ভ্রষ্ট॥"

১. পুঁথিতে 'য়ানিঞা'।
২. ? গবাক্ষ।
৩. পুঁথিতে 'য়াস্যে'।

কাজেই এবার রাধাকে যেতে হয়। একমাত্র তিনিই বাকি আছেন। যশোদা যেতে পারেন না। কেননা চতুর বৈদ্য প্রথমেই বলে দিয়েছেন, মা নিজে জল আনলে সে জলে ফল হবে না। বৈদ্য ঘোষণা করলেন যার কোলে কৃষ্ণ শুয়ে আছেন তাঁকে সতী বলেই মনে হয়। বৈদ্যের কথা শুনে সবাই গোপনে হাসলেন। শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর! রাধা যে কত বড় সতী তা সকলেই জানে। শেষ পর্যন্ত যশোদার সনির্বন্ধ অনুরোধে রাধাকে জল আনতে যেতে হল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাধা কাঁখে কলসি নিতে বাধ্য হলেন।

"কলসী করিয়া কাঁখে কান্দে কলাবতী।
কানাঞি ঠাকুর জান আমি যত বড় সতী॥"

রাধা চৌতিশ অক্ষরে গোপালের স্তব করলেন। কবিচন্দ্র এখানে কিছু নূতনত্ব দেখিয়েছেন। চৌতিশ অক্ষরে গোপালের নামের মালা না গেঁথে[১] তিনি ক্রমানুসারে চৌতিশটি অক্ষর নিয়ে পদ্য রচনার চাতুর্য ও অভিনবত্ব প্রদর্শন করেছেন। যেমন—

"ট টনক পড়িল প্রভু আমার মাথায়।
টলমল মন মোর শুন যদুরায়॥
ঠ ঠক মোর ননদিনী ঠাকুর কর পার।
ড ডাকি আমি প্রাণনাথ ভরসা তুমার॥
চ চেয়ায়া কলসী পুরি কাঁখেতে করিল।
আনন্দে পড়িল রাধা জল না পড়িল॥
ত তরায় যমুনা ছাড়ি তুরিতে চলিল।
থ থমকিয়া একবার কলসী দেখিল॥
দ দোলাঞা দক্ষিণ হস্ত জল লঞা যায়।
ধ ধারির উপরে লঞা কলসী থামায়॥" ইত্যাদি।

রাধাকে জল নিয়ে ফিরে আসতে দেখে সবাই অবাক্। রাধার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। এতদিন যে রাধাকে অকারণেই কলঙ্কিনী অপবাদ দেওয়া হত সে বিষয়েও সকলেই একমত। যশোদা রাধার খুব সুখ্যাতি করলেন। বৈদ্য বললেন রাধার হস্তে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন যেন কৃষ্ণকে খেতে দেওয়া হয়। তাহলে কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন। যশোদা রাধাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। রাধার হাতে তৈরি "পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন" কৃষ্ণ ভোজন করলেন। বৈদ্যরাজ যশোদার কাছে বিদায় নিয়ে "বাহির দুয়ারে গিয়া অন্তর্ধ্যান হৈল"। রাধাও গৃহাভিমুখে গমন করলেন। পথে রাধার নিকট কৃষ্ণ হাসতে হাসতে সব রহস্য প্রকাশ করে দিলেন।

"কলঙ্কিনী বলিয়া সভাই দিথ গালি।
সভার মাথায় দিলাম কলঙ্কের ডালি॥
এখন নিশ্চিন্ত হঞা থাক জাঞা ঘরে।
নিশ্চিন্তে যাইব আমি বিরল মন্দিরে॥"

১. সাধারণ চৌতিশা স্তবের তাই নিয়ম।

রাধা গৃহে গমন করলেন। কৃষ্ণ মায়ের কোলে ফিরে এলেন। ব্যাসের বর্ণনানুসারী[১] কবিচন্দ্রের কলঙ্কভঞ্জন পালা এখানেই সমাপ্ত।

কবিচন্দ্রের পুঁথির ভাষার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমা বাংলা উপভাষার মিল প্রচুর। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

ও > অ — সনা (সোনা), জসদা (যশোদা) ;

ও > উ —তুমার (তোমার) "তুমার কারণে শ্রীবৃন্দাবন করিলাউ" (দিবারাস) ;

মহাপ্রাণিত এবং সানুনাসিক উচ্চারণের বাহুল্য—হাতে > হাথে ('পুত্রমুণ্ড হাথে করি)' (কর্ণপালা), সবে > সভে ('কালি সভে শুনিবে রাধার কলঙ্কভঞ্জন', (রাধিকামঙ্গল), 'দূরে গেল অভিমান দুঃহাকার যত' (দিবারাস) ;

ঘোষীভবন—উপকার > উপগার (শব্দটি 'উবগার' রূপেও শ্রুত হয়) 'যশোদা বলেন বাপু কৈলে উপগার' (রাধিকামঙ্গল)।

ধাতুরূপে —ইয়া (অ্যা) এবং—ইতে অন্তক অসমাপিকা দক্ষিণ-পশ্চিমা বাংলা উপভাষাকে (বিশেষতঃ সিংভুম-মানভূমের কথ্য ভাষাকে) সুস্পষ্ট রূপে স্মরণ করায়। 'বস্যা থাক মোর কাছে' (দিবারাস), 'খাত্যো শুত্যো পথে জাত্যো কৃষ্ণে ডাকে অবিরত' (প্রসাদ চরিত্র)।

এছাড়া স্বার্থিক ক ('নিকটে আসিবেক যত', দিবারাস), বিশিষ্ট শব্দ এবং শব্দরূপ- *যেমন, ভুলে যাওয়া অর্থে 'পাস্থরা' ('পাশুরিতে নারি তুমার চান্দ মুখের হাসি', দিবারাস), দ্রুত অর্থে 'ঝট' ('ঝট চল সুবেশে গোবিন্দের আঙ্গানা,' দিবারাস), বিদায় > বিদাই ('বিদাই মাগএ রাই', দিবারাস), আপদ্যার্যা (আপদ সৃষ্টি করে যে, রাধিকামঙ্গলের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য). বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ—যেমন, পছন্দ করা অর্থে 'মনে লাগা' ('ভোগাদি বাসনা মনে নাই লাগে অত', প্রসাদ চরিত্র)* ইত্যাদির বহুল প্রয়োগে কবিচন্দ্রের প্রাপ্ত পুঁথিগুলিকে কোনো ঝাড়খণ্ডী মানুষের নিজস্ব রচনা বলে ভ্রম হয়।

১. রাধাকৃষ্ণ পাদ পদ্ম করিয়া স্মরণ। দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ব্যাসের বর্ণন॥

রূপকের আলোকে "রূপজালাল"

শ্রীমতী তপতী রায়নাথ

পশ্চিম গাঁয়ের জমিদার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী রচিত "রূপজালাল" গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়টিকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের "রূপককাব্য" রচনার কাল বলা যেতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সময়টি ছাড়া বাংলা সাহিত্যে "রূপককাব্য" আর বিশেষ রচিত হয় নি। এবং বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সার্থক ও শ্রেষ্ঠ রূপককাব্য— "স্বপ্নপ্রয়াণ"—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে ও পরেও কিছু রূপককাব্য রচিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে প্রথম রূপককাব্য দ্বারকানাথ অধিকারীর 'সুধীরঞ্জন' প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। শিবনাথ শাস্ত্রীর *'নির্বাসিতের বিলাপে'র প্রকাশকাল ১৮৬৮ খ্রী.। বলদেব পালিতের 'কাব্যমঞ্জরী'* ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'যৌবনোদ্যান'—এদেরও প্রকাশকাল ১৮৬৮ খ্রী.। *হেমচন্দ্রের "আশাকানন" প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর 'ছায়াময়ী'-র প্রকাশকাল ১৮৮০ খ্রী.। এছাড়াও অন্যান্য রূপকরচনা (কাব্য বা কবিতা)—যাদের ইতস্ততঃ সন্ধান মেলে— সেগুলির রচনাকালও উক্ত সালের মধ্যেই।*

তবে কি 'রূপক' রচনার প্রয়াস ঊনবিংশ শতকের পূর্বে ছিল না? উত্তর অবশ্যই ইতিবাচক হবে। আমাদের দেশে 'রূপক' রচনা প্রয়াস ঐতিহ্যবাহী ঘটনা।

চর্যাপদে, শাক্ত-সঙ্গীতে বাউলগানে রূপকের ব্যবহার সুপ্রচুর ও সহজগোচর। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, সে-সকল কাব্যে রূপকের ব্যবহার অলংকার হিসাবে মাত্র। ধারাবাহিক রূপকত্ব উক্ত কাব্যগুলি বহন করে নি। ফলে প্রকৃত 'রূপককাব্য' যাকে কেউ কেউ বলেছেন 'সাঙ্গ-রূপককাব্য' সেই জাতীয় রচনার সন্ধান ঊনবিংশ শতকের এই বিশেষ সময়টিতেই (১৮৫৫-১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্ন উঠা সম্ভব 'প্রকৃত রূপককাব্য' কাকে বলা হয়ে থাকে। 'রূপককাব্য' বলতে পাশ্চাত্য সাহিত্যে "allegorical poem"-কে বোঝান হয়ে থাকে। প্রতীচ্য সাহিত্যে "allegory" হচ্ছে "a mode of expression"[১]—ভাবপ্রকাশের একটি পদ্ধতি—বিষয় অপেক্ষা গঠনেই যার অধিকার বেশী—"It belongs to the form of poetry, more than to its content."[২] Chambers's Encyclopaedia-তেও "Allegory"-র সংজ্ঞা নিম্নরূপ নিরূপিত:

"Allegory is a method of literary or pictorial composition whereby the author or artist bodies forth immaterial things in concrete tangible images."[৩]

'allegory' সাহিত্য ও অঙ্কন রচনার এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে লেখক ও শিল্পী অবাস্তবতাকে বাস্তবমূর্ত প্রতিরূপ দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ অমূর্ত ভাবনার মূর্ত প্রতিরূপ হচ্ছে 'রূপক'। Spenser কর্তৃক রচিত "Faerie Queene", Bynyan রচিত "Pilgrim's Progress" প্রতীচ্য সাহিত্যে "allegorical poem"-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রূপক কাব্যালোচনার দ্বারা রূপককাব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেমন ঃ—

ক. দুটি অর্থের (গূঢ়ার্থ ও সহজার্থ) সমান্তরাল অবস্থান।

খ, অমূর্ত ভাবনার মূর্ত রূপ প্রতিষ্ঠা।

গ. বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়, সম্পর্কান্বিতভাবে রূপক অলঙ্কারের ব্যবহার।

এবং আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ঃ—স্বপ্নদর্শন এবং রচয়িতার ভৌগোলিক নয় আভ্যন্তরীণ পরিভ্রমণ প্রভৃতি।*

উক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে পর্দানশীন লেখিকা নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "রূপজালাল" কাব্যের রূপকত্ব নির্ধারণ করা যেতে পারে। একথাও উল্লেখ্য, ফয়জুন "সঙ্গীতসার" ও "সঙ্গীতলহরী" নামক আরও দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বর্তমানে গ্রন্থ দুটি দুষ্প্রাপ্য। উক্ত গ্রন্থদুটিও ছিল "রূপকজাতীয়" রচনা।[৪]

শ্রদ্ধেয় ড. সুকুমার সেন মহাশয় "রূপজালাল" সম্পর্কে বলেছেন, "মুসলমান মহিলার লেখা প্রথম বাংলা বই ফৈজুন্নিসা চৌধুরাণীর 'রূপজালাল' (ঢাকা ১৮৭৬) গদ্যে পদ্যে লেখা প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা।"[৫] এবং সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু-সম্পাদিত "বাঙালী চরিতাভিধানে" আছে "বিড়ম্বিত দাম্পত্য-জীবনের এক করুণ রূপক কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।"[৬]

"বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা" কিম্বা "বাঙালী চরিতাভিধান"-এ কোথাও "রূপজালাল" গ্রন্থটিকে প্রত্যক্ষভাবে 'রূপককাব্য' বলা হয় নি, কিন্তু মূল গ্রন্থ পাঠে এবং ফয়জুন্নেসার জীবনী সন্ধানে জানা যায় "রূপজালাল" গ্রন্থটিতে নবাব ফয়জুনেরই ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনী রূপকের আড়ালে আচ্ছাদন পেয়েছে এবং মহিলা কবি একটি অমূর্ত ভাবনাকে বাস্তব মূর্ত রূপ দিয়েছেন। অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে স্বামীপ্রেম বঞ্চিতা হয়েছিলেন, কাব্যে সেই ক্ষতি পূরণ করে প্রেমরূপকে বাস্তব, মূর্ত করে তুলেছেন। বিবাহিত জীবনে পদার্পণ করে ফয়জুন সাংসারিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। সতীন-যন্ত্রণায় যৌবনেই তিনি পতিস্নেহে বঞ্চিত হন এবং পতির সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু কোন প্রতিহিংসা বা প্রতিবাদ তিনি কখনই করেন নি। নিরুত্তাপ হৃদয়বৃত্তির বশে বিদ্বেষকে জয় করে তাকে মৃত্যুঞ্জয়ী ভালবাসায় পরিণত করেছিলেন। একদিকে নির্লোভ সংস্কারমুক্ত মন অন্যপক্ষে ধর্মীয় অধ্যাত্ম ও সাহিত্যিক চেতনা তাঁর অন্তরকে ঔদার্য ও বিশালতায় সমৃদ্ধ করেছিল। তাই "রূপজালাল" তাঁর ব্যথাহত জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়েও তাঁর সমৃদ্ধমনের ফসল হয়ে উঠেছে। নায়ক জালাল রূপবানু ও হূরবানু দুই পত্নী নিয়ে সুখের নীড় রচনা করতে সমর্থ হয়েছে। মনস্তত্ত্বের আলোকে আমরা বলতে পারি, জীবনে যা কবি অর্জন করেননি রচনার মাধ্যমে কল্পনায় কবি সেই শূন্যতার ক্ষতি পূরণ করেছেন। কাজী নূরুল ইসলাম এ সম্পর্কে লিখেছেন, "উপরি-উক্ত তিনখানি কাব্যগ্রন্থের সুদীর্ঘ পরিসরে তিনি রূপকের আড়ালে নিজেকে সুগভীর দুঃখের পঙ্কে নিক্ষেপ করে সেখানকার ঘটনার ফেনায়িত আবর্তন থেকে উদ্ধার করেছেন অমরাবতীর অমৃত,—যে অমৃতসুধা জীবনকে উত্তীর্ণ করে সুরলোকে।"[৭]

* "allegory" সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধকারের গবেষণাকার্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তিগত বেদনা অনেকাংশে লাঘব হয় প্রকাশের মাধ্যমে। ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীও ব্যথাহত জীবনের বেদনা লাঘবের কারণে "রূপজালালে" এঁকেছেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিচ্ছবি। এ সংবাদ আমরা পাই "গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য" অংশে।

"এই খেদে মন, সদা উচাটন,
ভাবি কিসে হব শান্ত।
রচিনু পয়ার, করিতে নিবার,
এ বলিনু আদি অন্ত॥
শ্রীমতী ফয়জুনে পুস্তক রচনে
বলি অন্যের কাহিনী।"

শ্রীমতী ফয়জুন কিন্তু 'অন্যের কাহিনী' লেখেন নি, লিখেছেন নিজের জীবনের আদর্শায়িত কাহিনী। বিষয়বস্তু অংশে রূপবানু হচ্ছেন ফয়জুন এবং জালাল হচ্ছেন গাজী। রূপবতী রূপবানুর সাথে রাজকুমার জালালের সাক্ষাৎ এবং উভয়ের মধ্যে প্রেমের প্রবল উন্মাদনা—কাহিনীর সূচনা এখানেই। কিন্তু ফোরতাম নামক এক রাক্ষস জালাল-বাঞ্ছিতাকে অপহরণ করলে, গল্পের নায়ক প্রিয়তমাকে লাভের জন্য অসংখ্য বাধাবিপত্তির সম্মুখীন ও দৈত্যদানবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বিশেষ পরিস্থিতিতে জালাল রমপম অধিপতির কন্যা হুরবানুকে বিবাহ করেন। কিন্তু রূপবানুকে না পাওয়া অবধি জালাল কিছুতেই নিরস্ত হন না। এ যেন প্রথমা পত্নীকে ঘরে রেখে প্রেমাতুর গাজী চৌধুরীর বনে বনে শিকার করে বেড়ানো এবং সকলকে বশীভূত করে ফয়জুনকে পাবার কাহিনী।

ফয়জুনের সাহিত্যরস-পিপাসু মন সাহিত্যসৃষ্টি করতে বসে নিজ জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন মাত্র, নিজ জীবনের দুঃখ-কাহিনীকে প্রত্যক্ষভাবে লোকসমক্ষে তুলে ধরতে চান নি। একই সঙ্গে আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশের অভিপ্রায় ছিল তাঁর। বধূ-জীবনের ব্রীড়া একদিকে—সেকারণে আত্মগোপন, অন্যদিকে কবি-জীবনের প্রকাশের বাসনা—অর্থাৎ আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা—এই দুইয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসার কারণে আখ্যান-বিবৃতিতে রূপকরীতি গ্রহণে যেন তিনি তৎপর।

ফয়জুন রূপকের আচ্ছাদন গ্রহণ করেছেন মাত্র, রূপকের সার্থক রূপায়ণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কেননা রূপককাব্যে বাচ্যার্থ ও নিগূঢ়ার্থের দ্বৈতক্রিয়া সমান্তরাল ভাবে চলে এবং প্রথমটি থেকেই দ্বিতীয়টি প্রতীত হয়। বহিরঙ্গের ও অন্তরঙ্গের এই যুগ্ম কার্যক্রম স্বভাবতঃই জটিল হতে বাধ্য। কিন্তু সেই জটিলতার গ্রন্থিমোচন করে রূপক-কাব্যের নিহিতার্থ ও কবিকর্মশালার চেহারাটি ধরতে না পারলে তার কাব্যসৌন্দর্য ও সৃষ্টিনৈপুণ্য অনুধাবন করা সহজ হয় না। ফয়জুন বাচ্যার্থ ও নিগূঢ়ার্থের এই দায় বহন করতে পারেন নি। অসংখ্য অবাস্তব কাহিনী কল্পনা, খাজা খিজিরের ইমমু, হীরামন পাখিবধ, বৃক্ষের উর্ধ্বগমন প্রভৃতি পাঠককে রূপকথার জগতে পৌঁছে দেয়। ফলে বাচ্যার্থ ও নিগূঢ়ার্থের দায় বলিষ্ঠভাবে রক্ষা করা ফয়জুনের পক্ষে সম্ভব হয় না। উক্ত গ্রন্থে উক্ত উভয় অর্থের অনুসন্ধান মহারণ্যে বিপথগামী পথিকের পথানুসন্ধানের সমপর্যায়ভুক্ত হয়।

দ্বিতীয়তঃ সকল রূপককাব্যের অন্তরালে একটা পূর্ব পরিকল্পনার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। ফয়জুন মুসলমানী পুঁথি সাহিত্যের আদলে "রূপজালালে"র কাহিনী বিন্যাস করেছেন। ফলে কাহিনীর মধ্যে সমাবেশ ঘটেছে বহু অবাস্তব অপ্রাসঙ্গিক ও অলৌকিক

উপাখ্যানের ও চরিত্রের—যেগুলির সঙ্গে মূল আখ্যান ও চরিত্রগুলির কোন সম্বন্ধ-সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। সরলগতিতে কিম্বা প্রোজ্জ্বল ভঙ্গিতে নয়, বাঁকাচোরা পথে অনুজ্জ্বল ভঙ্গিতে রূপজালালের কাহিনী লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়েছে। ফলে কবির রূপক কল্পনা ব্যাহত হয়েছে। 'স্থাপত্যধর্মিতা' রূপককাব্যের আরও একটি বৈশিষ্ট্য। "এল ডোরাডোর" পথে সোনা মাণিকের ছড়াছড়ির ন্যায় বিচিত্র সৌন্দর্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বপ্নপ্রয়াণে"র পথঘাট আকীর্ণ। কাহিনীবিন্যাস, ভাষাপ্রয়োগ, গঠনসৌকর্যে "রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ"[৮] তথা "স্বপ্নপ্রয়াণ" কাব্যের প্রতিটি কক্ষ আলোকিত। "রাজপ্রাসাদের বাগান বাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান।"[৯] এতে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নয়, রচনার বিপুল বিচিত্রতাও অপ্রচুর নয়। কিন্তু "রূপজালালে" এত বৈচিত্র্য কোথায়? পরিকল্পনাগত ঐক্য, ভাবের গভীরতা কিম্বা শিল্পগত ক্ল্যাসিসিজিমের একান্ত অভাব, গ্রন্থটির সার্থক কাব্য হওয়ার পক্ষেও অন্তরায় হয়েছে। কবি তাঁর কাব্য রচনায় মধ্যযুগীয় সাহিত্যকে অনুসরণ করেছেন। তিনি কাব্যে বারবার ভণিতা প্রয়োগ করেছেন, বংশ বিবরণ দিয়েছেন, গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন, বারমাসী রচনা করেছেন। নারীদিগের দ্বারা পতিনিন্দা করিয়েছেন। গ্রন্থের নামকরণেও তিনি পূর্বতন ধারারই অনুসারী। 'ইউছুফ্-জোলেখা', 'জেবল মুলুক সামারোখ', 'লায়লী-মজনু' কিম্বা 'বিদ্যাসুন্দর'—নায়কনায়িকার নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণের এই পদ্ধতি "রূপজালালে" ও অনুসৃত হয়েছে। এদিক থেকেতাঁর কাব্যকে মধ্যযুগীয় কাব্যের উত্তরসূরী বলা যেতে পারে।

চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রেও ফয়জুন্নেসা ব্যর্থশিল্পী। রূপক-কাব্যের চরিত্র আইডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে। তবে রচয়িতার প্রতিভাগুণে সীমাবদ্ধতার মধ্যেও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চরিত্র। ব্যানিয়ানের অঙ্কিত চরিত্র এত সজীব, মনেই হয় না সেগুলি রূপকধর্মী যান্ত্রিক চরিত্র। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও আখ্যায়িকার মানুষগুলির প্রতীক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও তাদের অনেকটা প্রাণবন্ত করে তুলতে পেরেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন লেখেন,

"হাস্য বলে 'ও সব সংক্ষেপে সার'।
কবিতার, সবিতার, বনিতার, ভণিতার, কারো
নাহি ধারি ধার ;
পেট্‌টি জানি সার
মণ্ডা যা'তে লয় পায় গণ্ডা-দশ-বারো।"

তখন 'হাস্য' উদরসর্বস্ব সকল চরিত্রকেই উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টি সমক্ষে উপস্থিত করতে সমর্থ হয়।

অথবা, "থামিল তুরঙ্গ-রাজি ক্ষণ পরে
'নাম' কবি এই 'ঠাঁই' কল্পনা কহিল মৃদুস্বরে
নামিলে সে গুণী
কল্পনা তরুণী
নামিল মরাল যেন ফেলি সরোবরে।"

এখানে 'কল্পনা' নামক শক্তি সজীব মানবীয় রূপ গ্রহণ করে কবির পথপ্রদর্শিকা হয়ে উঠেছে।

"রূপজালালে" মহিলাকবি এরূপ প্রতীকধর্মী জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন নি একটিও। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে রূপকথার (রাজপুত্র, রাজকন্যা) চরিত্র। জামাল অধিপতির পুত্র জালাল, রূপবানু, রাজা-রানী, দৈত্যেশ্বর, গন্ধর্বেশ্বর প্রভৃতি চরিত্র, চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিয়েও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে নি। সব চরিত্রগুলিই যেন ভাবের প্রতীক না হয়ে ভাল বা মন্দ—বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে। জালাল যখন শোক প্রকাশ করে—

——"হায় হায় প্রিয়তমা কোথারলে প্রাণসমা
কোথারলে এজীব-জীবন
হায় হায় কেন এসে, ভঙ্গিতে আমাকে নেশে,
নিদয় হরিলে প্রাণধন।"

তখন একান্তই একজন নিরীহ প্রেমিককে স্মরণ করিয়ে দেয়। রানী-চরিত্রও অদৃষ্ট-বিশ্বাসী রমণী-মনের প্রতিচ্ছবি—

"আহা প্রভো নিদয় কেন, দুঃখ পরে দুঃখ হেন
মহাপাপ হেন কি করেছি।

আহা প্রভো পতি নিলা আমাকে বিধবা কৈলা
শুধুদেহে আছি চিরকাল।
আহা প্রভো কেঁদে মরি, শূন্য শয্যা সদা হেরি
মমদৃষ্টে যেন এ জঞ্জাল।"

অবশ্য দূতী চরিত্র অঙ্কনে তিনি কিছুটা উজ্জ্বলতার পরিচয় দিয়েছেন--তবু তা মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের কুটনী চরিত্রগুলিকেই স্মরণ করায়।

"এত ভেবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে সে কুটনী।
দেখে তথা আছে স্থিতা একটি রমণী॥
বলে বোন কেগা তুমি কিবা তব নাম।
কি হেতু এস্থানে স্থিতি কোথা তব ধাম॥

মনে মনে ভেবে দূতী এই স্থির করে
কার্য্যের সম্পন্ন ইহা হ'তে হতে পারে।"

মধ্যযুগীয় কুটনী চরিত্রের উগ্রতা এই চরিত্রে নেই। মনে হয় উগ্র কুটনী চরিত্রের সহজ সংস্করণ মহিলা-কবি অঙ্কিত এই কুটনীচরিত্র। ভারতচন্দ্রের হীরামালিনীর চরিত্রের ধার উক্ত কুটনীচরিত্রে অনুপস্থিত। চিত্ররচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ পারদর্শী শিল্পী। শব্দের তুলিতে তিনি "স্বপ্নপ্রয়াণে" ছবির পর ছবি এঁকেছেন—ছবির কারুশালা নির্মাণ করেছেন যেন

"দক্ষিণের দ্বার খুলি মৃদুমন্দ গতি।
বনভূমে পদার্পিয়া ঋতুকুলপতি
লতিকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইল ফুল।
অঙ্গ ঘেরি পরাইল পল্লব দুকূল॥

কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হ'ল মলয় বাতাস।
ফুলের ঘোমটা খুলি কাড়য়ে সুবাস।
'এ নহেসে' বলি শেষে ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥"

একান্তই বস্তুময় চিত্র—কিন্তু অঙ্কনকলার সহজ অধিকারে চিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আবার শব্দের অর্থে নয়, ধ্বনি দিয়েও তিনি চিত্র এঁকেছেন,

১. সরিৎ ত্বরিত বহে তট চুমি চুমি।

২. জানালা ঠেলিয়া বায়ু চলি' যায় বলি "সর্সর্"।

কবি ফয়জুন্নেসা শব্দের চয়নে কিম্বা ধ্বনির তরঙ্গে এরূপ সহজ সুন্দর বস্তুময় চিত্র কোথাও কি অঙ্কন করতে সমর্থ হয়েছেন? "রাজকুমারের উদ্যানদর্শন" অংশে উদ্যানের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন ঃ—

"প্রবেশিবা মাত্র যেন মন্দ সমীরণ।
সমস্ত গৌরব ডালি কৈল বিতরণ ॥
মন্দ সমীরণ স্পর্শে মন হরষিত।
নৃপকুমারের দেহ হৈল রোমাঞ্চিত ॥
বৃক্ষ ডালে ফল সব দুলিছে অপার।
বিশেষ বিহঙ্গরব শ্রুতি চমৎকার ॥
চারিভিতে হেরে ঘুরে বাতুল আকার।
দেখে পুষ্প সারি সারি বিবিধ প্রকার ॥
বর্ণিব তাহার শোভা, কিন্তু সাধ্যাতীত।
গোলাপ মল্লিকা জুতি জাতি অগণিত ॥"

মহিলাকবি চর্মচক্ষুতে যা দর্শন করেছেন তাকেই উপস্থিত করেছেন তাঁর রচনায়, সত্যবাস্তবকে কল্পনারসে রসায়িত করে কবিত্বমণ্ডিত করতে তিনি পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ যেখানে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে প্রকৃতিকে অঙ্গের সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায় করেছেন—"অঙ্গ বেরি পরাইল পল্লব দুকূল।"

কিম্বা "ফুলের ঘোমটা খুলি কাড়য়ে সুবাস।"

সেখানে মহিলাকবির সহজ স্বীকৃতি—

"বর্ণিব তাহার শোভা, কিন্তু সাধ্যাতীত।"

একই সঙ্গে তত্ত্বজিজ্ঞাসায় দক্ষ মনীষা ও কাব্যকল্পনায় দক্ষ কবিত্বশক্তির অধিকারী হওয়ায় দ্বিজেন্দ্রনাথের পক্ষে যে সার্থকতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল, পর্দানশীন নারী হিসেবে ফয়জুনের পক্ষে সে সার্থকতা অর্জন সম্ভব হয় নি। তত্ত্বজিজ্ঞাসায় দক্ষ মনীষা ও দক্ষ কবিত্বশক্তি সার্থক রূপককাব্য সৃষ্টির প্রধান শর্ত—যার অভাব ছিল ফয়জুনে। সুপরিকল্পিত কল্পনা, স্থাপত্যধর্মিতা কিম্বা সমান্তরাল রূপককাব্য ধারার অবস্থান "রূপজালাল" কাব্যে অনুপস্থিত থাকলেও বিচ্ছিন্ন ভাবে রূপককাব্যের অন্যান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচ্য কাব্যটিতে লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'রূপককাব্য' মাত্রই নিহিতার্থে নীতিমূলক বা আদর্শমূলক। Spenser-এর "Faerie Queene" এবং Bynyan-এর Pilgrim's Progress", দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বপ্নপ্রয়াণ" নীতিমূলক রচনা। "স্বপ্নপ্রয়াণের" তত্ত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, "ভ্রান্তি ও ভ্রান্তিজনিত দুঃখের ফলে কবি কল্পনাকে

হারাইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু অবশেষে দুঃখের তপস্যার অবসানে তিনি কল্পনাকে উজ্জ্বলতর রূপে লাভ করিলেন। নন্দনপুরে যাহাকে হারাইয়াছিলেন আনন্দপুরে তাহার সহিত পুনর্মিলন ঘটিল। Aesthetic-লোকে অপহৃত ধনকে আনন্দলোকে ফিরিয়া পাইলেন, বীর্যে ও কল্যাণে চরিতার্থ কবি সৌন্দর্যরূপিণী ও আনন্দদায়িনী কল্পনাকে পাইয়া চরিতার্থ হইলেন। ইহাই স্বপ্নপ্রয়াণের তত্ত্ব।"[১০] "Faerie Queene"-কাব্যেও দেখি নাইট সকলেরা সবরকমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আদর্শ নীতিলোক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছে। "রূপজালাল" গ্রন্থেরও উদ্দেশ্য প্রেমনিষ্ঠার আদর্শলোক সৃষ্টি। ফয়জুন-মানস নায়ক জালালকে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন করে এবং বাধাবিপত্তির নানান্তর পার করে যে আদর্শ প্রেমলোকে পেঁাছে দিয়েছেন সেখানে নায়ক জালাল নায়িকা রূপবানুর সঙ্গে পুনর্মিলনে আনন্দলোক সৃষ্টি করে প্রেমাদর্শের পরিচয় রেখেছে। ভ্রান্তি বা ভ্রান্তিজনিত দুঃখের পঙ্কে নয়, অদৃষ্টজনিত দুঃখ সাগরে মহিলাকবি তাঁর নায়ক ও নায়িকাকে নিমজ্জিত করেছেন। এবং সেই দুঃখসাগর থেকে উত্তোলন পূর্বক পেঁাছে দিয়েছেন প্রেমানন্দলোকে প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় কাব্যারম্ভের প্রারম্ভেই ফয়জুন্নেসা অদৃষ্টবাদের কাছে নতিস্বীকার করেছেন, "অহো! অদৃষ্ট কি অখণ্ড্য, নির্বন্ধের লিখার ব্যতিক্রম করিয়া দ্রষ্টব্য কার্য্যও করার সাধ্য হয় না।"—এই অদৃষ্টবাদ ভারতীয় আর্যধর্মানুসারী। এবং 'রূপজালালের' প্রেমনিষ্ঠা মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া মলুয়া ও নাথগীতিকার অদুনা-পদুনার প্রেমনিষ্ঠার ধারাবাহী। যদিও উভয় ক্ষেত্রে প্রেমের আধারস্থান বিপরীত। দ্বিতীয়তঃ দেশী বিদেশী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত রূপক কার্যগুলিতে একটি করে অভিযাত্রার কাহিনী আছে। মহাকাব্যগুলিতে আমরা ভৌগোলিক বহিরঙ্গ যাত্রার বিবরণ পাই, কিন্তু রূপককাব্যে সেই যাত্রা মন্ময়। বানিয়ান বাইবেলের ধর্মীয় প্রেরণাকে সম্বল করে খ্রীষ্টীয়ান নামক এক ব্যক্তির ধ্বংসনগর থেকে দিব্যনগরে আধ্যাত্মিক যাত্রার বিবরণ রচনা করেছেন। "Faerie Queene", 'স্বপ্নপ্রয়াণ' ও "Divine-comedy"-তেও কবি পুরুষেরা আধ্যাত্মিক অভিযাত্রার বিবরণ দিয়েছেন। পাপ-প্রবণতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অন্তিম সিদ্ধিলাভ উক্ত গ্রন্থগুলির মূলকথা। আলোচ্য গ্রন্থে পাপপ্রবণতা কিম্বা কবিমনের দ্বন্দ্বসংঘাতের কোন বিবরণ বা ঘটনা নেই। তবে নায়ক জালাল বিভিন্ন পথপরিক্রমা করে বাধাবিপত্তিকে জয় করে নায়িকা রূপবানুকে যেভাবে লাভ করেছে তা একটি আদর্শ প্রেমলোকে যাত্রারই কাহিনী। এ যাত্রা আধ্যাত্মিক না হলেও আত্মিক বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা হয় না। এ যাত্রাও ভৌগোলিক নয়, কবির কল্পলোকে পরিভ্রমণ।

উপরি-উক্ত কাব্যগুলির নায়ক নির্বাচনেও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' ও ও 'কম্মোদিয়া' উভয় কাব্যেরই নায়ক স্বয়ং কবি—দ্বিজেন্দ্রনাথ ও দান্তে। 'কম্মোদিয়া'তে কবির ঈশ্বরমুখী মনোযাত্রায় সহায়ক ছিলেন প্রথমে জ্ঞানরূপী ভার্জিল, পরে প্রেমরূপিণী বিয়াত্রিচে। 'স্বপ্নপ্রয়াণে' কবির পথপ্রদর্শক তাঁরই অন্তর্নিহিত শক্তি প্রথমে কল্পনা পরে করুণা। "রূপজালাল" গ্রন্থে কবির পথপ্রদর্শক জ্ঞানরূপী কোন ব্যক্তি কিম্বা অন্তর্নিহিত শক্তি কবিকল্পনা নয়—প্রেমপ্রত্যাখ্যাত ও প্রেমজয়ী মানসিকতা। ব্যক্তিজীবনে স্বামী প্রেমবঞ্চিতা হওয়ায় ফয়জুন অন্তরাশ্রয়িনী হয়েছিলেন এবং এই অন্তর্মুখিনতারই অমর অবদান "রূপজালাল" কাব্য। এখানে একটি বক্তব্যবিষয়, অন্য দেশী বিদেশী রূপক কাব্যগুলি পুরুষ কবির রচনা। সেই কারণে কবিরা নিজেদের একাত্ম করেছেন নায়কের সঙ্গে। কিন্তু রূপজালাল কাব্যটি একজন মহিলা কবির রচনা এবং আত্মজীবনীর উপাদান

নিয়ে লিখিত বলে এখানে কবি নিজেকে একাত্ম করেছেন নায়িকার সঙ্গে। তবে এক্ষেত্রে "কম্মোদিয়া" বা "স্বপ্নপ্রয়াণের" মত নায়ক বোঝাতে উত্তমপুরুষের একবচন ব্যবহার করা হয় নি। কল্পিত চরিত্র রূপবানুর ছদ্মবেশে কবি ফয়জুন নিজেকে প্রচ্ছন্ন করেছেন।

আর বিস্তৃত আলোচনা নয়, তবে গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি আলোচনার দ্বারা প্রবন্ধটিকে উপসংহার অংশে উপনীত করা যেতে পারে।

প্রেমবঞ্চিতা যে নারী প্রতিঘাতে নম্র, মৃত্যুঞ্জয়ী ভালবাসায় জীবনকে সার্থক করতে চেয়ে "যৌবনে যোগিনী" হয়েছিলেন, তিনি প্রেমের কাব্য লিখতে বসে পাঠককে পেঁছে দিয়েছেন রূপকথার জগতে—একের পর এক সোপান অতিক্রম করে। 'রূপকথাও' এক অর্থে 'রূপক'। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "রূপকথা কতকগুলি অসম্ভব বাহ্য ঘটনার ছদ্মবেশ পরিয়া আমাদের মনের সহিত ইহার প্রকৃত ঐক্যের কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই ছদ্মবেশ খুলিলেই ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র সুস্পষ্ট হইবে। বাস্তব জগতে যে শক্তি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে, যে আদর্শের আমরা সন্ধান করি, রূপকথার রাজ্যেও সেই মানব-মনের আদিম, সনাতন নীতিরই আধিপত্য। সেই পরিপূর্ণ সুখের সন্ধান, সেই দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ, সেই সৌন্দর্য পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি, সেই আশাতীত শক্তি-সম্পদ্ লাভ, পাপপুণ্য, জয়-পরাজয়—পৃথিবীর সমস্ত পুরাতন জিনিসই এই নূতন রাজ্যের অধিবাসী। পৃথিবীর চিরপরিচিত মূর্তিগুলিই একটু অতিরঞ্জনের রাগে রঞ্জিত হইয়া, কল্পনার দ্বারা সামান্য মাত্র রূপান্তরিত হইয়া রূপকথার রাজ্যের অলিতে-গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে সব রাক্ষস-খোক্কস আমাদের পথরোধ করে তাহারা আমাদের পার্থিব বাধা-বিঘ্নেরই একটা রূপান্তরিত সংস্করণ মাত্র।" ১১

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রূপকথা'র সংজ্ঞা অনুযায়ী "রূপজালাল" কাব্যকে 'রূপকথা'ও বলা যেতে পারে। এ কাব্যের মধ্যেও আছে পরিপূর্ণ সুখের সন্ধান, দুঃখ হতে অব্যাহতি লাভ, আশাতীত শক্তি-সম্পদ্ লাভ, পাপপুণ্যের জয়-পরাজয়। রাক্ষস-খোক্কসও নানাভাবে নায়কের অভিপ্রায় অভিমুখে যাত্রার পথরোধ করেছে। নায়ক জালাল খাজাখিজিরের ইসমু বা মন্ত্রের জোরে সে সকল বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে। আরব্য রূপকথার সিন্দাবাদের কাহিনীর মতো কুমার জালাল মায়াবীকন্যার নির্দেশে এক রকপাখি দ্বারা অপহৃত হয়েছে।

"একদিন তরণীর ছাতের উপর।
অনিল কারণে শুয়ে ছিল নরেশ্বর॥
হেনকালে এক রকপাখী ভয়ান্বিত।
উড়িতে উড়িতে তথা হলো উপস্থিত॥
আচম্বিত কুমারকে দেখে পাখীবর।
ঝম্পদিয়ে নিয়ে তারে উড়িল সত্বর॥"

এখানেই শেষ নয়—রকপাখি কুমারকে এক তরুর উপর রাখলে কুমার তরু হতে অবরোহণের চেষ্টা করে। কিন্তু "বায়ুগতি হয়ে তরু উড়িল সত্বর।" এরপর নায়ক অসম্ভব সব ঘটনার সম্মুখীন হল। দেখেন একটি দিব্য সরোবরের দ্বারে একটি ভয়ঙ্কর মূর্তি যার অর্ধ অঙ্গ মনুষ্যাকার, অর্ধ ব্যাঘ্রমত, হস্তীমুণ্ডের দুই করের ন্যায় দুটি হাত। আচম্বিতে মূর্তির বদন থেকে দুটি ভীষণকায় বিড়াল নির্গত হ'ল এবং তারা একটি নারী প্রসব করল। এরপর যাদুকর কন্যার সঙ্গে নায়ক জালালের সাক্ষাৎ ও বন্দীত্ব গ্রহণ। এবং যাদুমন্ত্রের বলে

নায়কের যাদুপুরী থেকে উদ্ধার লাভ—প্রভৃতি ঘটনার সমাবেশ বাস্তবিক রূপকথার জগৎ রচনা করে। গন্ধর্ব রাজার উদ্যানে প্রবেশ করে কুপ হতে দৈত্য রাজপুত্র দিগ্‌বিজয়ের "জীবন" উদ্ধার কিম্বা রাক্ষসের প্রাণপাখি "হীরামন" বধ "ঠাকুরদার ঝুলি"র রূপকথাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কবি ফয়জুন্নেসা মুসলমানী পুঁথি সাহিত্যের আদলে তাঁর কাব্যের কাহিনী বিন্যাস করায় রাজপুত্র, রাজকন্যা, হুরী, পরী, দৈত্যদানব, গন্ধর্বেশ্বর সকলে একত্র হয়ে রূপকথার জগৎ রচনা করে তুলেছে—যে জগৎ মায়াজাল বিস্তার করে রহস্যের ঐক্যতান সৃষ্টি করে। যে তান স্টীলের কলমের মুখে ছিন্নভিন্ন হয় না কিন্তু ঠাকুরমার স্নেহসিক্ত গরম, তরল কণ্ঠস্বরে উদ্বেল হয়ে ওঠে।

সুতরাং উপসংহারে এ বক্তব্য হয়ত অযৌক্তিক হবে না, রূপকথা যে অর্থে রূপক একমাত্র সেই অর্থেই "রূপজালাল" নামক গদ্যে-পদ্যে রচিত কাব্যটিকে 'রূপককাব্য' বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে একথাও সত্য যে আধুনিক রূপক কাব্য বা allegory-র সঙ্গে "রূপজালাল" কাব্যের সম্পর্ক অতিক্ষীণ হলেও রূপকের কিছু লক্ষণ এসে গেছে 'রূপজালালে'। হয়তো কবিরও অজ্ঞাতে—কারণ আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যে রূপককাব্যধারার সূত্রপাত মোটামুটি পাশ্চাত্য আদর্শকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে ফয়জুন্নেসার পরিচয় ছিল না। তবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয়, একজন পর্দানশীন নারী যে সম্পদ্ আমাদের দান করেছেন তার সাহিত্যবিচারে যথেষ্ট মূল্য না পেলেও সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে তার মূল্য অনস্বীকার্য।

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১. C. S. Lewis : The Allegory of love : 1936 ; P. 48.
২. Ibid ; P. 48.
৩. Chambers's Encyclopeadia : New Edition. Allegory.
৪. কাজী নজরুল ইসলাম / ফয়জুন-মানস / শতবার্ষিকী স্মরণী, ১৯৭৬ ; রূপজালাল/ পৃ. ৬১।
৫. ড. সুকুমার সেন / বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) পঞ্চম সংস্করণ/ পৃ. ১৭৪।
৬. শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু/সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান/প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ৬২৮।
৭. কাজী নজরুল ইসলাম/ফয়জুন-মানস/শতবার্ষিকী স্মরণী ১৯৭৬/ ; রূপজালাল পৃ. ৬১-৬২।
৮-৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / জীবনস্মৃতি / বিশ্বভারতী ১৯৭২/সাহিত্যের সঙ্গী / পৃ. ৭৩।
১০. শ্রীপুলিনবিহারী সেন প্রকাশিত/স্বপ্নপ্রয়াণ, ১৯৬৯/পৃ. ১৮৮।
১১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/রূপকথা/University Bengali Selections, পৃ. ২৪৪।

কৃষ্ণমিশ্র কি রাঢ়ের সন্তান ছিলেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

এক

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে "প্রবোধচন্দ্রোদয়" একটি আশ্চর্য কীর্তি। এর চরিত্রগুলি বিভিন্ন দার্শনিক ও ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ধারণার মানবিক রূপ। নাটকটি রূপকধর্মী। বিবেককে রাজ্যচ্যুত করে মহামোহ সর্বত্র বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, ষড়্‌রিপু ও বৌদ্ধ-জৈন-কাপালিক চার্বাকপন্থীরা তার অনুচর, মিথ্যাদৃষ্টি বিভ্রমাবতী রতি হিংসা ও তৃষ্ণাও তার শিবিরে। রাজ্যচ্যুত বিবেক উপনিষদ্ দেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রবোধোদয় নামক সন্তানের জন্ম দেন, বস্তুবিচার, সন্তোষ, বৈরাগ্য, নিদিধ্যাসন, সংকল্প ও আস্তিক দর্শন-গুলির মিলিত বাহিনী মহামোহ ও তার সঙ্গীদের পরাস্ত করে। উপনিষদের তত্ত্বমসি তত্ত্বের সঙ্গে বিষ্ণুভক্তির প্রস্থান মিলিয়ে কৃষ্ণমিশ্র একটি বিশিষ্ট মতবাদও প্রচার করেন। নাটকটি খুব খোলাখুলি প্রচারমূলক, কোনো কলাকৈবল্যের লীলার জন্য এটি লেখা হয় নি। শিল্পের দাবিকে খুব একটা ক্ষুণ্ণ না করেই বিমূর্তনগুলিকে মানবিক চেহারা দেওয়া হয়েছে।

রূপকনাট্য : কৃষ্ণমিশ্র নিজেই এই রূপকনাট্যধারার স্রষ্টা, না প্রাচীনতর কোনো রীতির অনুসারক—এ-বিষয়ে স্বয়ং বেরিডেল কীথ একই বইএর দু জায়গায় দু রকম মত দিয়েছেন।[১] শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণের পুরঞ্জন উপাখ্যানে (4 স্কন্ধ, 25 থেকে 29 অধ্যায়) রূপক চরিত্র আছে, খুঁটিয়ে পড়লে মনে হয় কৃষ্ণমিশ্র এখান থেকে কিছু কিছু ব্যাপার সংগ্রহ করে ছিলেন। তারও আগে জয়ন্ত ভট্টের "আগমডম্বর" বা "সম্মত নাটক"-এ জয়ন্ত, বিশ্বরূপ, ধর্মোত্তর, মঞ্জীর ইত্যাদি নামে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতামতের কথা পাওয়া যায়, অশ্বঘোষের লেখা একটি রূপক নাটকের খণ্ডাংশও পাওয়া গেছে, ভাসের "বালচরিত"-এও রূপক চরিত্র আছে। সুতরাং কৃষ্ণমিশ্র এই রূপকনাট্যধারার স্রষ্টা নন। কিন্তু পরবর্তী রূপকনাট্যগুলির তুলনায় "প্রবোধচন্দ্রোদয়" বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আসলে সেগুলি কৃষ্ণমিশ্রের প্রভাবেই লেখা। কবি কর্ণপুরের নাটকের নামে ও চিরঞ্জীব শর্মার "বিদ্বোন্মাদতরঙ্গিণী"তেও তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা "প্রবোধচন্দ্রোদয়" আলোচনা প্রসঙ্গে বুনিঅন-এর "যাত্রিকের গতি" (Pilgrim's Progress, 1578 ও 1684) বইটির উল্লেখ করেন ও তার তুলনায় কৃষ্ণমিশ্রের সাফল্যকে ছোটো করে দেখেন।[২] কিন্তু এই তুলনা যথার্থ নয়। ইওরোপে চতুর্দশ শতাব্দীতে যে নীতিনাট্য বা মর‍্যালিটি প্লে-র উদ্ভব হয়েছিল, তার সঙ্গেই বরং "প্রবোধচন্দ্রোদয়"-এর চরিত্র মেলে। কিন্তু ইওরোপের এই ধারার নাটকগুলিতে পাপ পুণ্য ভক্তি অনুতাপ প্ররোচনা ইত্যাদি বিষয় এত বড়ো হয়ে দেখা দেয় যে নাটকের চরিত্রগুলি সর্বদাই ভীষণ একমাত্রিক রূপক হয় বটে, কিন্তু মানবিক রূপ পায় না। ধর্মীয় প্রয়োজনে সেগুলি যতটা নীতিগর্ভ ততটা নাট্যধর্মী নয়, সব মিলিয়ে বরং একটা কাষ্ঠভাব থাকে। "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়"-এর চরিত্রগুলি সে-তুলনায় অনেক প্রাণময়। ভিক্ষু কাপালিক ও ক্ষপণকের চরিত্র অত্যন্ত অল্প পরিসরে খুবই পূর্ণাঙ্গ।

রচনাকাল : নাটকের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, শ্রীমৎ গোপালের আদেশে এর অভিনয় হচ্ছে। রাজা কীর্তিবর্মার দিগ্‌বিজয় যাত্রার ব্যাপারে তাঁকে অনেক দিন যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে, চেদিপতি কর্ণকে পরাস্ত করে শেষে কৃতকৃত্য হয়েছেন। এখন তিনি শান্তরসের নাটক দেখে বিনোদিত হতে চান। সপরিষদ রাজা কীর্তিবর্মাও শ্রীমৎ গোপালের গুরু কৃষ্ণমিশ্রের নাটকটি দেখতে ইচ্ছুক [অংক। 1, পৃ. 10-14]।

এর থেকে নাটকটির রচনাকাল সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায়। চেদিপতি কর্ণের সঙ্গে চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মার যুদ্ধ ও কর্ণের পরাজয় সম্পর্কে পাথুরে প্রমাণ আছে। বীর-বর্মণের অজয়গড় শিলালেখ ও মহোবা শিলালেখের সঙ্গে নাটকটির প্রস্তাবনা অংশের ভাষা ও অলঙ্কারগত মিল পাওয়া যায়। "হুলৎস্ অনুমান করেছিলেন, মহোবা শিলালেখের লেখক "প্রবোধচন্দ্রোদয়"-এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ঐতিহাসিক প্রমাণেও দেখা যায়, 1073 সালের আগেই কর্ণ রাজোপাধি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। সুতরাং কীর্তিবর্মার কাছে পরাজয়ের ঘটনা নিশ্চয়ই 1070 সালের কাছাকাছি কোনো সময়ের।[৩] অধ্যাপক কোসম্বী নাটকটির রচনাকাল 1065 খ্রীষ্টাব্দ বলে নির্দেশ করেছেন।[৪] ড. জয়দেব বিদ্যালংকারের মতে, আনুমানিক 1080 খ্রীষ্টাব্দ।[৫] এক "প্রবোধচন্দ্রোদয়" ছাড়া কৃষ্ণমিশ্রের আর কোনো নাটক বা অন্য কোনো রচনা এখনো পাওয়া যায় নি। প্রাচীনতম কোষগ্রন্থ "সুভাষিতরত্নকোষ"-এ অবশ্য কৃষ্ণমিশ্রের নামে কোনো শ্লোক নেই। কোসম্বীর অনুমান, বিদ্যাকর বৌদ্ধ ছিলেন বলেই বৌদ্ধবিদ্বেষী কৃষ্ণমিশ্রের স্থান হয় নি।[৬] "সদুক্তিকর্ণামৃত"-এ "প্রবোধচন্দ্রোদয়" এর একটি শ্লোক (2·34) আছে।[৭] উচ্চাবচ প্রবাহের 'নিস্পৃহ' অংশের শ্লোকটি (2319) কৃষ্ণমিশ্রের নামে থাকলেও সেটি "প্রবোধচন্দ্রোদয়"-এ নেই। "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" তে ঐ শ্লোকটিই ভর্তৃহরির নামে আছে, "সুভাষিতাবলী"তে 'কেষামপি' বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।[৮] "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি"তে "প্রবোধচন্দ্রোদয়"-এর আরও দুটি শ্লোক (1·5 ও 1. 11) পাওয়া যায়। "সুভাষিতাবলী"তেও কৃষ্ণমিশ্রের চারটি শ্লোক পাওয়া যায়। তার সবকটিই "প্রবোধচন্দ্রোদয়" থেকে নেওয়া।[৯] আরো কিছু শ্লোক 'কৃষ্ণমিশ্রস্য' বলে নানা কোষগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সেগুলি হয় অন্য কোনো কৃষ্ণমিশ্রের, নয় "প্রবোধচন্দ্রোদয়" ছাড়া অন্য কোনো রচনা থেকে।[১০]

কৃষ্ণমিশ্রের পরিচয় : আভ্যন্তর প্রমাণ : কৃষ্ণমিশ্রের পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। নাটকটি অভিনীত হয়েছিল শ্রীমৎ গোপালের আদেশে। শ্রীমৎ গোপাল কে ? মহেশ্বর ন্যায়ালংকারের টীকায় গোপালকে অমাত্য বলা হয়েছে।[১১] হেমচন্দ্র রায়ও সম্ভবত তাঁরই অনুসরণে রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁকে 'সামন্ত' (ফিউডেটরি) বলে উল্লেখ করেছেন।[১২] শিশিরকুমার মিত্র বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন, প্রস্তাবনার যে-পদাংশ (সকলসামন্ত চক্রচূড়ামণি···) থেকে তাঁকে প্রধান সামন্ত বলে মনে করা হচ্ছে সেটি আসলে আরো বড়ো সমাসবদ্ধ পদের অংশ (···মরীচিমঞ্জরীনীরাজিতচরণকমলেন)। বরং 'সহজসুহৃৎ' শব্দটি থেকে অনুমান করা যায়, তিনি কীর্তিবর্মার মাতৃ বা পিতৃকুলের সম্পর্কিত ভাই।[১৩] গোপালের সভাতেই নাটকটি হয়। বোধহয় খাজুরাহোর কাছাকাছি কোনো অঞ্চলেই নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়েছিল।

প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলে, গোপাল তাঁকে আদেশ করেছেন, "আমার গুরু ও আপনারও (পূজ্য) শ্রীকৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নামে যে-নাটকটি নির্মাণ করে আপনাকে সমর্পণ করেছেন

তা-ই আজ রাজা কীর্তিবর্মার সামনে আপনাকে অভিনয় করতে হবে" (পৃ. 13)। অস্মদ্ গুরুভিস্তত্রভবদ্ভিঃ শ্রীকৃষ্ণমিশ্রৈঃ—নাট্যকারের পক্ষে এ এক দুর্লভ সম্মান। অন্য কোনো নাট্যকার 'গুরু' বলে অভিহিত হবার সম্মান কোথাও পেয়েছেন কি না, জানি না। রাজাদের লেখা নাটকে অবশ্য নিজেদের সম্পর্কে অনেক লম্বাচওড়া সমাস ও অলঙ্কারের ঘটা থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে এর গুণগত প্রভেদ আছে।

কৃষ্ণমিশ্র হয়তো বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু কোন্ সম্প্রদায়ের তা নাটক থেকে বোঝা যায় না। আদিকেশবের মতো শিব সম্পর্কেও শ্রদ্ধাবাচক শ্লোক আছে (4.29), কৈটভসূদন বিষ্ণুকে 'খণ্ডেন্দুচূড়াপ্রিয়'-ও বলা হয়েছে। পঞ্চম অংকে বিষ্ণুভক্তিকে শ্রদ্ধা বলেন, বৈষ্ণবশৈব সৌরাদয়ঃ দেব্যা সকাশমাগতাঃ। ঐ একই অংকের আরও দুটি শ্লোক (5.8 ও 5.9) থেকে এমনও অনুমান করা হয়েছে যে, কৃষ্ণমিশ্র স্মার্ত পঞ্চোপাসনার কথা বলছেন।[১৪] নাটকের নান্দীতে ব্রহ্ম (সান্দ্রানন্দং…অমলং স্বাত্মাববোধং) এবং চন্দ্রার্ধমৌলি অর্থাৎ শিবের উপাসনা করা হয়েছে—এই তথ্যটুকুও লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত, কীর্তিবর্মা নিজে ছিলেন শৈব, কিন্তু বৈষ্ণবদের সঙ্গে তাঁর বোধহয় কোনো বিরোধ ছিল না। দেওগড় শিলালেখে তাঁকে 'অগদং নূতনং বিষ্ণুম্' (গদাবিহীন নতুন বিষ্ণু বলা হয়েছে।[১৫] ('অগদ' অর্থে নীরোগ, সুস্থও হতে পারে)।

আভ্যন্তর প্রমাণ থেকে কৃষ্ণমিশ্র সম্পর্কে এর বেশি কিছু বলা যায় না, বাহ্য প্রমাণ নেই। আর যা আছে, তা কিংবদন্তী। যেমন, তিনি ছিলেন শংকরাচার্যের অনুগামী, হংস-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, অদ্বৈত বেদান্তের প্রচারক। তাঁর এক শিষ্য ছিল দর্শনচর্চায় বিমুখ। তাকে সৎপথে আনার জন্যই, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের পুরঞ্জয় উপাখ্যানের ঢঙে "প্রবোধচন্দ্রোদয়" রচনা করলেন। "পুণ্য শ্লোকমঞ্জরী" থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, কৃষ্ণমিশ্র কামকোটি পীঠের 47তম অধ্যক্ষ চন্দ্রশেখর সরস্বতীর (1097-1165 খ্রীষ্টাব্দ) সমসাময়িক।[১৬] যদিও পাথুরে প্রমাণ অন্য কথাই বলে। এরপর থাকে তথ্যনির্ভর অনুমান। কৃষ্ণমিশ্রের পরিচয় সম্পর্কে কিছু অনুমান প্রচলিত আছে। সেগুলি বিচার করে কোনো সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত করা যায় কি না দেখা যাক।

দুই

দুটি বিপরীত মত ঃ পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র মিশ্র বলেছেন, "শ্রীকৃষ্ণমিশ্র কহাঁকে রহনেবালে থে ইস বিষয়মেঁ হমারা বিশ্বাস হৈ কি বে বিহারকে হী থে, কেঁ্যাকি উন্ হোঁনে অপনী কৃতিমেঁ দ্বারকা, মথুরা আদিকো ছোড় কর 'মন্দার' বিহারস্থিত নামক তীর্থকা সাদর উল্লেখ কিয় হৈ ঔর গৌড়োঁকী দাম্ভিকতাকা সরস উপহাস প্রস্তুত কিয়া হৈ। আপ বিহারী ন হোতে তো ইস তরহ গৌড়োঁসে পরিচয় নহী রখতে।"[১৭] শেষ কথাটি খুবই অদ্ভুত। গৌড়ের পরিচয় রাখার জন্যে বিহারী না হয়ে গৌড়ী হলেই তো আরো সুবিধা হবার কথা।

বাঙালী পণ্ডিতদের মধ্যে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন কৃষ্ণমিশ্রকে "ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামবাসী" "রাঢ়ের সন্তান" বলে দাবি করেছেন।[১৮] এর সপক্ষে তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন অহংকারের উক্তি ঃ

> গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী
> ভূরিশ্রেষ্ঠক নাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা। (2.7)

[গৌড় অনুত্তম (শ্রেষ্ঠ) রাষ্ট্র, তার চেয়ে নিরুপমা হলো রাঢ়াপুরী। ভূরিশ্রেষ্ঠক নামে পরম সুন্দর ধাম, আমাদের পিতা সেখানকার উত্তম (সর্বশ্রেষ্ঠ) লোক।]

ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এ-কথা মানতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, "কৃষ্ণমিশ্রকে (১১শ-১২শ শতক) কেহ কেহ [পাদটীকায় ক্ষিতিমোহন সেনের "চিন্ময় বঙ্গ," পৃ. ১২০-র উল্লেখ করা আছে] বাঙালী মনে করেন। কিন্তু নাটকের যে শ্লোক হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, সেই শ্লোকে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত নাই। এই নাটকের প্রস্তাবনায় যে গোপালের উল্লেখ আছে, তিনি বাংলার পাল-রাজা গোপাল কি না জানা যায় না। গোপাল কোন বিশেষ রাজার নাম না হইয়া রাজপর্যায় শব্দ হিসাবেও প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে ; 'নাটকাভরণ' ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে 'গাং ভুবং পালয়তীতি গোপালঃ।'"[১৯]

শ্রীমৎ গোপালের সঙ্গে বাংলার পালবংশীয় রাজা গোপালকে গুলিয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই। পালবংশীয় গোপাল ব্রাহ্মণ ছিলেন না, চেদিপতি কর্ণের গৌড় আক্রমণের সময় গৌড়ের রাজা ছিলেন নয় পাল ও তৃতীয় বিগ্রহ পাল। গোপালের অন্তত তিন শ বছর বাদে কর্ণের উদ্ভব। কিন্তু "প্রবোধচন্দ্রোদয়"-এ শুধু তো ভূরিশ্রেষ্ঠকের নাম নেই, রাঢ় সম্পর্কে আরো একটি উল্লেখ আছে। বাংলার ইতিহাস বা হাওড়া-হুগলী প্রসঙ্গে 'গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং' শ্লোকটি প্রায় সব ঐতিহাসিকই উল্লেখ করেন।[২০] কিন্তু চতুর্থ অংশে শ্রদ্ধার একটি উক্তি সকলেরই নজর এড়িয়ে গেছে। শ্রদ্ধা বলেন, দেব্যা এতদেবমুক্তম্। অস্তি রাঢ়াভিধানো জনপদঃ। তত্র ভাগীরথীপরিসরালংকারভূতে চক্রতীর্থে মীমাংসানুগতয়া মত্যা কথংবিদ্ধার্য-মাত্রপ্রাণো ব্যাকুলেনান্তরাত্মনা বিবেক উপনিষদ্ দেব্যাঃ সংগমার্থং তপস্তপস্যতীতি [দেবী এ কথাই বললেন ; রাঢ় নামে একটি জনপদ আছে। সেখানে ভাগীরথীর কাছে অলংকার স্বরূপ চক্রতীর্থে বিবেক মীমাংসা-অনুগত মতির সঙ্গে কোনো রকমে প্রাণ ধারণ করে ব্যাকুল হৃদয়ে উপনিষদ্ দেবীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে তপস্যা করছেন। অংক, 4, পৃ. 138] অর্থাৎ, "প্রবোধচন্দ্রোদয়"-এ রাঢ়ের দুটি স্থান—ভূরিশ্রেষ্ঠক ও চক্রতীর্থের কথা আছে। এ ছাড়াও অবশ্য সিন্ধু, গান্ধার, পারসিক, মাগধ, অন্ধ্র, হূণ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ইত্যাদি ম্লেচ্ছপ্রায় দেশ, পামরবহুল পাঞ্চাল, মালব, আভীর, আবর্ত ও সাগরানূপ (সমুদ্রতীরবাসী) দেশের উল্লেখ রয়েছে (অংক 5, পৃ. 176-177)। এগুলির তাৎপর্যও কম নয়। কিন্তু নাটকের মূল ঘটনাস্থল বারাণসী ও মন্দারতীর্থ, প্রসঙ্গত শালিগ্রাম ও আরেকটি চক্রতীর্থের কথাও বলা হয়েছে (অংক 5, পৃ. 166-167)। নাটকের অন্যত্র উৎকলের সাগরতীর সন্নিবেশে পুরুষোত্তম নামক দেবায়তনের কথাও বলা হয়েছে (অংক 2, পৃ. 78)। এ সবই খাজুরাহো থেকে অনেক দূর। আমরা প্রথমে ভূরিশ্রেষ্ঠক ও চক্রতীর্থের পরিচয় নেবার চেষ্টা করব।

ভূরিশ্রেষ্ঠ পরিচয়ঃ ভূরিশ্রেষ্ঠকের আরো কয়েকটি নামান্তর পাওয়া যায়ঃ ভূরিসৃষ্টি, ভূরিশ্রেষ্ঠ, ভূরিশ্রেষ্ঠী। বাংলার কুলশাস্ত্রের বিখ্যাত বই এড়ুমিশ্রের কারিকায় বলা হয়েছেঃ নগনদীবনেভ্যশ্চ ভাষা রূপান্তরা ভবেৎ। তথা স্ত্রীনীচবাক্যেষ্বপভ্রংশো দৃশ্যতে সদা॥ ভূরিসৃষ্টো তু ভুসৃটঃ স্যাৎ...।[২১] দশম শতাব্দীতে শ্রীধর তাঁর প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের টীকা "ন্যায়কন্দলী"র শেষে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

আসীদ্ দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাম্।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠি জনাশ্রয়ঃ॥[২২]

[দক্ষিণরাঢ়ে ভূরিকর্মা ব্রাহ্মণদের ভূরিসৃষ্টি নামে অনেক শ্রেষ্ঠীর আশ্রয় (বাসস্থান) একটি গ্রাম ছিল।]

এক শতাব্দী বাদে এই ভূরিসৃষ্টিই ভূরিশ্রেষ্ঠকে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলার ইতিহাস-কাররা সবাই একমত যে এই ভূরিসৃষ্টি বা ভূরিশ্রেষ্ঠকই আজকের ভুরশুট (ভুরসুট) বা ভূরশো। কিন্তু এই ভুরশুট কোথায়? নীহাররঞ্জন রায় একই বইএর এক অধ্যায়ে ভুরশুটকে হাওড়া জেলায়, অন্য অধ্যায়ে হুগলী জেলায় অবস্থিত বলেছেন।[২৩] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসে বলা হয়েছিল, ভূরশুট হুগলী-হাওড়া জেলায় দামোদরের তীরে (হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী)।[২৪] সুকুমার সেন বলেছেন, ভূরশুট "হুগলী-হাওড়া জেলার সীমান্তে অবস্থিত।"[২৫] সুখময় ভট্টাচার্য বলেছিলেন, "বর্তমান হুগলী জিলায়।"[২৬] ডঃ সুশীলকুমার দে-র মতে, "বর্ধমানের কাছে,"[২৭] ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন, "বর্ধমানের অন্তর্গত।"[২৮]

ভূরিশ্রেষ্ঠ ধাম ও পরগনা ঃ এই বিচিত্র ভৌগোলিক ব্যাখ্যানের কারণও বোঝা যায়। বাংলার ইতিহাসে ভুরশুট নামটি খুবই পরিচিত। কিন্তু 'ভূরিশ্রেষ্ঠ ধাম' ও 'ভুরশুট পরগনা' সম্পূর্ণ এক ব্যাপার নয়। আঞ্চলিক কাহিনী অনুসারে,[২৯] আদিশূরের বংশধর যামিনীশূর যখন অপারমন্দারের (পরে গড় মান্দারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী"তে এর কথা আছে) রাজা, তখন ভূরিশ্রেষ্ঠ বলে একটি রাজ্য (অর্থাৎ সামন্তের জমিদারি) ছিল। পাণ্ডুদাস নামে এক কায়স্থ রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। পরে বাগদী-বীর শনি ভাঙ্গড় ভূরিশ্রেষ্ঠ জয় করেন [মতান্তরে, একটি ধীবর রাজবংশ এখানে অনেক দিন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারই শেষ রাজা ছিলেন শনি ভাঙ্গড়]। তারপর গড়ভবানীপুরবাসী চতুরানন নিয়োগী (মহানেউকী) এই রাজ্য দখল করেন [মতান্তরে, ব্রাহ্মণ সন্তান চতুরাননকে বলি দেওয়ার জন্যে নিয়ে আসা হয়েছিল, শনি ভাঙ্গড়ের কাপালিক গুরু তাঁকে স্নেহবশত বাঁচিয়ে রাখেন]। চতুরাননের কোনো ছেলে না-থাকায় প্রথমে তাঁর জামাই, ও পরে দৌহিত্র কৃষ্ণ রায় এই ব্রাহ্মণ বংশের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। কৃষ্ণ রায়ের পরবর্তী ইতিহাস স্পষ্ট হয়েছে ভুরশুট পরগনার বিভিন্ন তায়দাদ পরীক্ষার ফলে।[৩০] প্রাচীন দলিলপত্রে তার নাম ভুরস্যুট, ভুরসিট্ট, ভূরশিট ইত্যাদি। কিন্তু ইতিহাসের বাইরেও আছে আরো অন্যান্য আঞ্চলিক কাহিনী। কালাপাহাড় বা রাজু নামক বিগ্রহভাঙার সর্দারের জন্মস্থান সম্পর্কে একই সঙ্গে দুটি অঞ্চল দাবিদার—বীরজাওন গ্রাম (থানা মান্দা, রাজশাহী, বর্তমানে বাংলাদেশ) ও ভুরসুট।[৩১] 'রায়বাঘিনী' প্রবাদের মূলেও আছেন ভুরশুটের রানী ভবশংকরী —এমন দাবি করেছেন ঐ বংশের কুলগুরু পরিবারের এক বংশধর।[৩২] ইতিহাসেও দেখা যায়, ঐ রাজবংশেরই এক শরিকের ছেলে ছিলেন কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। 1119 বঙ্গাব্দে ভুরশুট পরগনা দখল করেন বর্ধমানের অবাঙালী রাজা কীর্তিচন্দ্র। ভারতচন্দ্র দুঃখ করে লিখেছিলেন, "রাজবল্লভের কার্য—কীর্তিচন্দ্র নিল রাজ্য" [রাজবল্লভ ছিলেন ভারতচন্দ্রের জ্ঞাতি কাকা]।[৩৩]

এরপর থেকেই ভুরশুট বর্ধমানের এলাকায় চলে যায়, ফলে ভুরশুট নিয়ে এখন হাওড়া-হুগলী-এর পর থেকেই ভুরশুট বর্ধমানের কথা ওঠে। পুরনো ভুরশুট পরগনা ছিল বর্তমান হাওড়া ও হুগলীর নানা অঞ্চল জুড়ে। ভুরশুট পরগনার জমিদার প্রতাপনারায়ণ শাহজাহান

ঔরঙ্গজীবের আমলে 'রাজা' খেতাব পেয়েছিলেন। "চন্দ্রপ্রভা" ও "রত্নপ্রভা"-কার ভরত মল্লিক, "অনঙ্গরঙ্গ" ও "মেঘদূত"-এর "অর্থবোধিনী মালতী" নামক টীকার লেখক কল্যাণমল্ল ভূপতিরও বাস ছিল ভুরশুটে। কিন্তু এ হলো সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা। দশম-একাদশ শতাব্দীতে ভূরিশ্রেষ্ঠ বলে কোনো রাজ্য ছিল না, তবে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম নিশ্চয়ই ছিল। শ্রীধর ও কৃষ্ণমিশ্র দুজনেই তার সাক্ষী।

এখন ভুরশুট বলে দুটি গ্রাম আছে—ডিহি ভুরশুট ও পার ভুরশুট। প্রথমটি পড়ে উদয়নারায়ণপুর থানা, হাওড়া জেলায়; দ্বিতীয়টি জঙ্গীপাড়া থানা, হুগলীতে। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছিলেন, "কানা দামোদরে'র তীরে অবস্থিত 'ডিহি ভুরশুট' নামক ক্ষুদ্র পল্লীটিই প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ হইতে অভিন্ন বলিয়া আমরা অনুমান করি।"[৩৪] বিনয় ঘোষও ঐ অঞ্চলে ঘুরে এসে একই মত প্রকাশ করেছেন: "ডিহি ভুরশুট আজ যে দামোদরের তীরে অবস্থিত তা কানা দামোদর হলেও এককালে এই কানাই ছিল বিশাল নদী। তখন তমলুকের পথে স্বচ্ছন্দে সমুদ্রগামী পোত এই নদীপথেই চলত এবং তাতে বণিকরা বাণিজ্যসম্ভার বোঝাই করে দূর দেশান্তরে অনায়াসে বাণিজ্যযাত্রা করতে পারতেন। বহু শ্রেষ্ঠীজন সেই জন্য ভূরিশ্রেষ্ঠীতে বসবাস করতেন। অনুমান করা যায়, সুসমৃদ্ধ বাণিজ্য নগরের মতন ছিল ভুরশুট।"[৩৫]

টীকা ও অনুবাদ-বিভ্রাট: এই অনুমানই যথার্থ। কিন্তু বাঙালী পাঠক তাঁর দেশের ইতিহাস থেকে এ-কথা যত সহজে (বা যত কষ্ট করে) বুঝে নিতে পারেন, অবাঙালী টীকাকার ও অনুবাদকরা তা পারেন নি। বরং ভূরিশ্রেষ্ঠক নিয়ে ঐ শ্লোকটির টীকা ও অনুবাদে চূড়ান্ত হাস্যকর ও ভুল ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। "ভূরিশ্রেষ্ঠকনাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা"— চন্দ্রিকা-টীকায় বলা হয়েছে, "ভূরয়ঃ শ্রেষ্ঠা মহানুভাবা যস্মিন্ধামনীতি" আর "উত্তমনামকঃ"। প্রকাশ-টীকার মতে, "রাঢ়াপুর্যাং ভূরিশ্রেষ্ঠিক ইতি নাম যস্য তস্য পরমং ধাম উৎকৃষ্টং গৃহম্।" রামচন্দ্র মিশ্রের টীকায়: "তত্র গৌড়ে অপি নিরুপমা অসমানা রাঢ়া তদভিখ্যয়া প্রথমানা পুরী নগরী, তত্র রাঢ়পুর্যাম্ অপি ভূরিশ্রেষ্ঠকনাম তদভিধানম্ পরমম্ উৎকৃষ্টম্ ধাম গৃহম্, তত্র ধামনি উত্তমঃ সর্বশ্রেষ্ঠ নঃ পিতা জনয়িতা।"

এর ফলে যে অনুবাদ দাঁড়াবে বাঙালী বা কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন যে-কোনো লোকই তাতে হাসবেন: "গৌড় শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র, তার চেয়েও নিরুপমা রাঢ়া নগরী (!), সেই রাঢ়া নগরীতে ভূরিশ্রেষ্ঠক বলে একটি উৎকৃষ্ট গৃহ (!) আছে। সেখানে উত্তম নামে (!) আমাদের পিতা থাকেন।" রামচন্দ্র মিশ্রের হিন্দী তর্জমাটিও চমৎকার: "গৌড় এক অনুত্তম দেশ হৈ, উসমে নিরুপমেয় রাঢ়া নামকী নগরী হৈ, জহাঁ ভূরিশ্রেষ্ঠক বাস করতে হৈ। উস ভূরিশ্রেষ্ঠ কোমৌ উত্তম হমারে পিতা হৈ।"

Self-Sufficiency: Hearken; in Gaur, a country of unrivalled excellence there is a city named Rarapoor, which contains a celebrated place called Bhuri Shrestek; there my worthy father dwells.[৩৬]

দক্ষিণরাঢ়াপ্রদেশ, টেলর-এর অনুবাদে, city Rara in the Dakshin! টেলরের অনুবাদে তৃপ্তি না-পেয়ে বার্লিনফেরৎ ডক্টর সীতা কৃষ্ণ নাম্বিয়ার আরও উদ্ভট অনুবাদ করেছেন: Gauda is an unequalled country, there is a city called Radhapuri. There is a celebrated house (!) called **Bhurisresthika** ইত্যাদি।[৩৭]

অন্যদিকে, বাঙালীর অনুবাদে ও টীকায় সর্বদাই 'ধাম' অর্থে 'গ্রাম' বা 'নগর'। মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার লিখেছিলেন, "গৌড়দেশীয়নামহংকৃতত্বাৎ তত্রাপি রাঢ়ীয়ানাংতত্রাপি ভূরিশ্রেষ্ঠক-গ্রামীয়াণমহংকৃতত্বাৎ। ভূরিশ্রেষ্ঠগ্রামস্য অধুনা ভুরসুট্ ইতি প্রসিদ্ধি।"

অথবা, "অত্যুত্তম রাজ্য এক, গৌড় তার নাম
তাহারি গো রাঢ় দেশে ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রাম ;
সে গ্রামে করেন বাস শ্রেষ্ঠ মোর পিতা…" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)[৩৮]

"শ্রেষ্ঠ রাজ্য গৌড়, তার মধ্যে নিরুপমা প্রদেশ রাঢ়াপুরী, সেখানে সুন্দর ভুরিশ্রেষ্ঠক নগরে আমার বাস। আমার পিতা সেখানকার একজন মুখ্য ব্যক্তি।" (সুকুমার সেন)[৩৯]

বোঝা যায়, 'পুরী' অর্থে 'নগরী' অর্থ ধরায় প্রথম ভুল হয়েছে। কিন্তু আসল সমস্যা হয়েছে 'ধাম' শব্দটি নিয়ে। দক্ষিণী টীকা নাটকাভরণ-এর বলা হয়েছে ঃ ধাম গৃহম্।[৪০] অবাঙালী টীকাকাররা সকলেই এই অর্থ ধরেছেন (নাটকাভরণ-টীকায় গৌড় নিয়ে বাণভট্টের কায়দায় সুন্দর ঠাট্টাও করা হয়েছে ঃ গৌড়মিতিদ্যুমণ্ডলপরিমণ্ডনাখণ্ড মার্তণ্ডমন্ডল বদ-খণ্ডভূপরিমণ্ডনং হি গৌড়মিতি ভাবঃ)। "অমরকোষ"-এ ধাম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 'গৃহদেহত্বিট্প্রভাবাঃ। "মেদিনীকোষ"-এর অর্থসম্ভার একটু বেশি ঃ ধাম দেহে গৃহে রশ্মৌ স্থানে জন্মপ্রভাবয়োঃ। অর্থাৎ 'স্থান' অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করা যায়, কিন্তু গ্রাম বা নগর অর্থে এর প্রয়োগ সুলভ নয়। ফলে মনিএর-উইলিঅম্স্ অর্থ ধরেছিলেন ঃ dwelling place, house, abode, domain &c &c (esp. seat of the gods) এবং the inmates of a house or members of a family, class, troop, band, host &c &c (এ ছাড়া আরো অন্য অর্থও আছে, সেগুলি বর্তমান প্রসঙ্গে আসে না)। 'তীর্থস্থান' অর্থে 'ধাম' শব্দটিকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ("বঙ্গীয় শব্দকোষ") বাংলা বিশিষ্টার্থ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পৌরাণিক মতে পুরীধাম, গয়াধাম ইত্যাদি চারটি ধামের কথা বাংলার বাইরেও প্রচলিত। বৈকুণ্ঠধাম বা গোলকধামের সঙ্গে সাদৃশ্যসূত্রেও এগুলি চালু হয়ে থাকতে পারে [টেলর অবশ্য ভূরিশ্রেষ্ঠক সম্পর্কে পাদটীকায় বলেছিলেন, A renowned holy place (পূর্বোক্ত সং, পৃ. 14), কিন্তু ভুরিশ্রেষ্ঠক গ্রামটির কোনো তীর্থ বা পবিত্রস্থান-খ্যাতি নেই]।

বাংলা লৌকিক প্রয়োগে 'ধাম' শব্দটির অন্য একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে ঃ ঠিকানা ; বাস নির্দেশ।[৪১] কারো নামধাম জানতে চাওয়া মানে নাম ও 'বাড়ি কোথায়' জিজ্ঞাসা করা। বর্তমান প্রসঙ্গে কৃষ্ণমিশ্র এই অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর ভিত্তিতে এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে, তিনি সত্যিই "রাঢ়ের সন্তান" ছিলেন। বিশেষত, ভুরিশ্রেষ্ঠকবাসী অহংকার আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করে, একমাত্র রাঢ়ের পটভূমিকাতেই তার সঠিক অর্থ করা সম্ভব।

অহংকার বলে ঃ আঃ পাপ, অস্মাভিরপি দক্ষিণরাঢ়াপ্রদেশপ্রসিদ্ধ-বিশুদ্ধিভির্নাক্রমণীয়-মিদমাসনম্। শৃণু রে মূর্খ,

নাস্মাকং জননী তথোজ্জ্বলকুলা সচ্ছ্রোত্রিয়াণাং পুন-
র্ব্যূঢ়া কাচন কন্যকা খলু ময়া তেনাস্মি তাতাধিকঃ।
অস্মচ্ছ্যালকভাগিনেয়দুহিতা মিথ্যাভিশপ্তা যত-
স্তৎসম্পর্কবশাম্ময়া স্বগৃহিণী প্রেয়স্যপি প্রোজ্ঝিতা॥ 2.9

[অস্মচ্ছ্যালকভাগিনেয়দুহিতা-র বহু পাঠান্তর পাওয়া যায়।]

[আমাদের মা তত উজ্জ্বল কুলের নন। আমি আবার সচ্ছোত্রিয় (সৎ+শ্রোত্রিয়) কুলের একটি কন্যা বিবাহ করেছি, সে কারণে আমি বাবার চেয়েও বড়ো। আমার শালার ভাগ্নের মেয়ে যেহেতু মিথ্যা কলংকিতা হয়েছে, সেই সম্পর্কের বশে, প্রেয়সী হলেও, আমার গৃহিণীকে আমি ত্যাগ করেছি।]

সিজার-এর বউ কোনো দোষ করতে পারেন না—ব্যাপারটা শুধু এইটুকুই নয়। লক্ষণীয় 'সচ্ছোত্রিয়' শব্দটি। বাংলা কুলশাস্ত্রে এটি একটি পারিভাষিক শব্দ। একটি রাঢ়ী পঞ্জিকায় বলা হয়েছে[৪২], ধরাশূরের আমলে রাঢ়ীব্রাহ্মণরা কুলাচল ও সচ্ছোত্রিয়—এই দুটিভাগে ভাগ হন। হরিমিশ্রের নামে একটি কারিকায় বলা হয়েছে :

পূর্বোঽথ পালধিশ্চৈব সিম্ধলঃ কুশাড়ী তথা।
কাঞ্জ্যাড়ী বাপুলিশ্চৈব মাসসাহড়িয়ানকৌ ॥
ভূরিষ্ঠানোঽথ কুসুমো বটব্যালোঽম্বলী তথা।…
সচ্ছোত্রিয় মহাত্মনঃ সর্বে এতে দ্বিজাতয়ঃ ॥

ধরাশূরের পর থেকে কুলাচল, সচ্ছোত্রিয় ও সাধারণ শ্রোত্রিয় (এঁরাই কি সপ্তসতী ?)—এই সম্মানভেদ চালু হয়। "কুলতত্ত্বার্ণব" ও "কুলমঞ্জরী"-মতে, বল্লালসেন কুলাচলদের বাইশটি গাঞি (গ্রাম) থেকে আটটি গাঞিকে মুখ্যকুলীন ও বাকি চোদ্দটিকে গৌণকুলীন হিসেবে বেছে নেন।[৪৩] সাধারণ ভাবে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের ছাপ্পান্ন গাঞির মধ্যে ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভূরিষ্ঠাল নামে একটি গাঞি আছে।[৪৪] বন্দ্যঘটী (আধুনিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীতে বাঁড়ুরী বা বাঁড়ুয্যে), চাটুতি (আধুনিক চট্টোপাধ্যায় বা চাটুয্যে), মুখটি (আধুনিক মুখোপাধ্যায় বা মুখুয্যে) ইত্যাদি গাঞির মতো ভূরিষ্ঠাল গাঞির ব্রাহ্মণও আছে। "বল্লালচরিত" ও অন্যান্য কুলশাস্ত্রের মতে, কাশ্যপ গোত্রে দক্ষের সন্তান শুভ ভূরিশ্রেষ্ঠক গাঞিতে বসবাস করতে থাকেন।[৪৫] কাশ্যপ গোত্রের ষোলটি গাঞির নাম এখন আর পদবি হিসেবে সুলভ নয়। চাটুতি অনেক দেখা যায় বটে, গুড়, পাকড়াশী, ভট্টশালী, পালধিও একেবারে দুর্লভ নয়, কিন্তু অম্বুলী (আমরুলিক), কয়ারি (কয়্যারি), তৈলবাটী, পোড়ারি (দগ্ধবাটী) ইত্যাদি গাঞিনামের মতো ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভূরিষ্ঠালও অপেক্ষাকৃত অপরিচিত নাম। উনিশ শতকের শেষে লালমোহন বিদ্যানিধি বলেছিলেন, "শান্তিপুরে ভূরিষ্ঠালগ্রামী শ্রোত্রিয় ভট্টাচার্য্য বিশেষ বিখ্যাত।"[৪৬] অথাৎ ভট্টাচার্য, উপাধ্যায়, চক্রবর্তী, মিশ্র বা এই ধরনের উপাধি ব্যবহার করায় ভূরি গ্রামী-রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের পরিচয় পেতে কিছু অসুবিধা হয়।

ভূরি গাঞির ব্রাহ্মণরা কুলীন নন, শ্রোত্রিয়, কারণ কুলীনের নবধা লক্ষণের মধ্যে একটি গুণ, আবৃত্তিতে এঁরা খাটো ছিলেন, অর্থাৎ পুত্রকন্যার বৈবাহিক আদান-প্রদানে যথেষ্ট সাবধান ছিলেন না।[৪৭]

"বল্লালচরিত" ও বাংলা কুলশাস্ত্রের নানা কারিকা, পঞ্জিকা ইত্যাদি হলো লোক-ইতিহাস, বাস্তবকল্পনামেশানো কাহিনী। কিন্তু অহংকারের উক্তিতে এরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশে কৌলীন্যপ্রথার উৎপত্তি ও বিকাশ (অর্থাৎ পেশাদার বহুবিবাহকারীর উদ্ভব) সম্পর্কে কোনো বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস এখনো লেখা হয় নি। ফলে, কৌলীন্য মর্যাদা বল্লাল সেনেরই সৃষ্টি, না তার আগে থেকেই এ-দেশে কুলীন শ্রোত্রিয় বিভাগ চালু ছিল—নিশ্চিত ভাবে তা বলা সম্ভব নয়। বালবলভীভুজঙ্গ ভবদেব ভট্টের প্রশস্তিতে সিম্ধল গাঞির ব্রাহ্মণদের কেবলমাত্র শ্রোত্রিয় বলা হয়েছে,[৪৮] লোক-ইতিহাস মতেও সিম্ধল গাঞি অকুলীন।[৪৯] যাই হোক, পরবর্তীকালের (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক) কারিকাতেও

'সচ্ছ্রোত্রিয়' শব্দটি পাওয়া যায়, যেমন—

শ্রুতশীল কুলীনজ নহে এরূপ নিস্তেজ
তারা নিষ্পাপী কন্যা লয়।
স্পৃহা-শূন্য ধন্য মান্য, কুলে হয় অগ্রগণ্য,
সৎপুত্র-জন্য স্বদারে রয়॥
শ্রুতশীল সৎ-শ্রোত্রিয় গন্ধে-পুষ্পে আরত্রিয়
দেবে করে কন্যা সম্প্রদায়।[৫০]

অথবা,

পঞ্চাননের বিধি, ত্যজ্য অসচ্ছ্রোত্রিয়।
যার ছিল না সদ্‌বৃত্তি, আর যে নিষ্ক্রিয়॥[৫১]

লোকাচার অনুযায়ী, কুলীন পাত্রের সঙ্গে সচ্ছ্রোত্রিয় কন্যার বিবাহ হতে পারত, কিন্তু কুলীন কন্যার সঙ্গে সচ্ছ্রোত্রিয় পাত্রের বিবাহ হতো না। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে কন্যাগত কুলমর্যাদাই চালু ছিল, বিবাহের সময় বরপক্ষই কন্যাপণ দিত। বাংলার নব্যস্মৃতিতে 'কন্যাশুল্ক'-এরই উল্লেখ পাওয়া যায়[৫২] (বরপণ ব্যাপারটি বোধহয় পেশাদার বহুবিবাহকারদেরই সৃষ্টি)। কৌলীন্যপ্রথার গোড়ার যুগের ইতিহাস অস্পষ্ট থাকায় এর বেশি কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু অবাঙালী টীকাকাররা এই তথ্যগুলি না জানায় 'সচ্ছ্রোত্রিয়' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ ধরতে পারেন নি, বরং লিখেছেন 'সমীচীন শ্রোত্রিয়' বা 'সাধু বেদাধ্যায়ী'! কন্যাগত কুলের তাৎপর্য প্রসঙ্গেও তাঁরা নীরব। অথচ অহংকারের অহংকৃত উক্তির মধ্যে জাত যাবার ভয়টুকুও লক্ষণীয়।

রাঢ়ী ব্রাহ্মণের ঔদ্ধত্য ঃ আর রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের ঔদ্ধত্য ও ভক্তিহীনতা বোধহয় প্রবাদপ্রসিদ্ধ। কয়েক শতাব্দী পরেও তার রেশ মিলিয়ে যায় নি। হরিচরণের "অদ্বৈতমঙ্গল"-এ "অদ্বৈতাষ্টক-"কার শ্যামাদাস আচার্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

শ্যামাদাস আচার্য হএন রাঢ়দেশবাসী।
রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সেহি সর্ব্বক্ষুদ্রবাসী॥
শাস্ত্র পড়িয়াছেন করিয়া যতন।
ভক্তিশাস্ত্র নাহি দেখি উদ্ধত তার মন॥
যাহাঁ তাহাঁ ফিরেন তবে বিচার করিতে।
সর্ব্ব শাস্ত্রে জিনে হারে ভক্তিতে॥[৫৩]

"প্রবোধচন্দ্রোদয়"-এর অহংকারকে এ-রকম মার্কামারা পাণ্ডিত্য-উদ্ধত ব্রাহ্মণ হিসেবেই দেখানো হয়েছে। দম্ভ বলে ঃ

জ্বলন্নিবাভিমানেন প্রসন্নিব জগৎত্রয়ীম্।
মৎসর্যন্নিব বাগ্‌জালৈঃ প্রজ্ঞয়োপহসন্নিব॥ (2.2)

তথা তর্কয়ামি। নূনময়ং দক্ষিণরাঢ়াপ্রদেশাগতো ভবিষ্যতি। (অঙ্ক 2, পৃ. 52)

["প্রজ্বলিত অভিমানে ত্রিলোক করিয়া যেন গ্রাস, তিরস্কারি বাক্যজালে প্রজ্ঞারে করিয়া উপহাস" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ)। তাই অনুমান করি, ইনি নিশ্চয়ই দক্ষিণরাঢ়াপ্রদেশ থেকে এসেছেন।]

গৌড়ে মীমাংসাচর্চা ঃ অহংকারের কথা থেকে বোঝা যায়, তিনি মীমাংসক। জগৎ, তাঁর মতে, মূর্খবহুল। আর, যারা প্রভাকর, কুমারিল, শারিকাগিরি, বৃহস্পতি, মহোদধি

ও মহাব্রতের কথা জানে না তারা সকলেই নরপশু (অঙ্ক 2, পৃ. 53)। [সন্ধ্যা বস্তু-বিচারণা নৃপ-ডিভিঃ স্বপ্নেঃ কথং স্থীয়তে—প্রকাশ-টীকায় বলা হয়েছে : বস্তু ঔপনিষদং ব্রহ্ম তদ্‌বিচারণা। এ ব্যাখ্যা স্পষ্টতই ভুল, মীমাংসকের কাছে 'বস্তু' মানে 'ব্রহ্ম' (তা-ও আবার উপনিষদের ব্রহ্ম) হতে পারে না।] স্বাধ্যায়াধ্যয়নমাত্রনিরত বেদবিপ্লাবক (চন্দ্রিকা-ও প্রকাশ-টীকায় 'ঘটশাসিনঃ' ও 'শুষ্কবৈদিকান্'—এই দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'ঘটশাসী'-র অর্থ স্পষ্ট নয়), ভিক্ষামাত্রগৃহীতযতিব্রতী মুণ্ডিতমুণ্ড পণ্ডিতম্মন্য বৈদান্তিক শৈবপাশুপতাদি, অক্ষপাদমতাবলম্বী (নৈয়ায়িক), মহাদণ্ডী, দ্বৈতাদ্বৈতমার্গপরিভ্রষ্ট ত্রিদণ্ডী —সকলেরই সে নিন্দা করে। [গুণরত্নের (চতুর্দশ শতক) মতে, নৈয়ায়িকরা শৈব ও বৈশেষিকরা পাশুপতসম্প্রদায়ভুক্ত, ত্রিদণ্ডীরা সাংখ্যমতাবলম্বী।[৫৪] চন্দ্রিকা ও প্রকাশ-টীকায় ত্রিদণ্ডী অর্থে ভট্টভাস্করমতানুবর্তীদের উল্লেখ করা হয়েছে।] অহংকারের তালিকায় কৌমারিল দর্শনের উল্লেখ থাকলেও, নাটকের অন্যত্র (অঙ্ক 6, পৃ. 225) রাজা মারফৎ কুমারিলকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে (সাধু কুমারিলস্বামিন্, সাধু প্রজ্ঞোঽস্যায়ুষ্মন্)। মীমাংসকদের মধ্যে একমাত্র কুমারিলই রাজার প্রশংসা পান, তাছাড়া মীমাংসা ও যজ্ঞবিদ্যাকে নিন্দার্হ রূপেই দেখানো হয়েছে।

কুমারিলকে প্রশংসা করার একটা কারণ বোঝা যায়—মীমাংসাদর্শনকে আস্তিক পথে নিয়ে আসার জন্যেই তাঁর "শ্লোকবার্তিক" লেখা। কুমারিল স্পষ্টই বলেছিলেন :

প্রায়েণৈব হি মীমাংসা লোকে লোকায়তীকৃতা।
তামাস্তিকপথে কর্তুময়ং যত্নঃ কৃতো ময়া ॥[৫৫]

অহংকার ঐ লোকায়তীকৃতা মীমাংসারই অনুগামী, চার্বাকের মতো তাকেও মহামোহের অনুচর হিসেবে দেখানো হয়েছে। "নৈবাশ্রাবি গুরোর্মতং" শ্লোকটি (2.3) সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন, "শ্রীধরের প্রায় ১০০ বৎসর পরে ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামের পাণ্ডিত্য খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মার সভাপতি কৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে প্রকারান্তরে রাঢ়দেশের সামাজিক ও সারস্বত ইতিহাসের মূল্যবান্ তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সমুচিত আলোচনা এখন পর্যন্ত কেহ করেন নাই।" তাঁর মতে, অহংকারের "উক্তি মধ্যে কি কি গ্রন্থ তৎকালে রাঢ়দেশে বিশেষ করিয়া অধীত হইত, তাহার একটি তালিকা পাওয়া যায়।…নবদ্বীপের নব্যন্যায়ের ন্যায় তৎকালে (প্রায় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে) একমাত্র ভট্ট ও প্রভাকরমীমাংসাই অন্য শাস্ত্রের চর্চাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তালিকামধ্যে গুরু (অর্থাৎ প্রভাকর), শালিক ও মহোদধি প্রভাকর মতের গ্রন্থকার এবং তুতাতিত (অর্থাৎ কুমারিল), বাচস্পতি মিশ্র ও মহাব্রত ভট্টমতের গ্রন্থকার। গুরুমতের প্রথম উল্লেখ দ্বারা ভট্টমতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার তৎকালে তাহার উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে। অথচ শ্রীধরের সময়ে গুরুমতের প্রাধান্য দেখা যায় না। কবি কৃষ্ণমিশ্র অহঙ্কার নাম দিয়া শ্রীধরের পৌত্র কিংবা প্রপৌত্র পর্যায়ের ভূরিশ্রেষ্ঠ নিবাসী কোন সমকালীন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছেন।"[৫৬] এই তালিকা প্রসঙ্গে অন্যত্রও তিনি বলেছেন, "প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে…তৎকালীন বঙ্গদেশীয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থিগণের একটি মূল্যবান্ পাঠ্যপুস্তক তালিকা লিপিবদ্ধ আছে—যাহার অধ্যাপনা কাশী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল না।[৫৭] (অধোরেখা আমার—রা. ভ.)

রাঢ়ে মীমাংসাচর্চার ঐতিহ্য যে দীর্ঘদিনের তাতে সন্দেহ নেই। শালিকনাথ গৌড়েরই লোক। উদয়নাচার্যের "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"-তে যে-'গৌড়মীমাংসক':-এর কথা আছে, বরদরাজ-

কৃত টীকায় সে-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ "গৌড়মীমাংসকঃ পঞ্জিকাকারঃ।"[৫৮] 'পঞ্জিকা' শালিকনাথেরই রচনা। রামানুজাচার্যের "তন্ত্ররহস্য"-এ প্রভাকরের পর শালিকনাথকেই পূর্বাচার্য বলা হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে শংখধরের "লটকমেলক" প্রহসনে একটি 'মনোহর শ্লোক' পাওয়া যায় ঃ তথাহি রাঢ়ীয়াবচনরচনা—

এষ ব্যাকরণং ন বেত্তি ন কৃতঃ কাব্যেষ্বনেন শ্রমঃ
শ্রুত্বাচার্যমতি ভট্টবার্ত্তিকগিরঃ স্নাতি স্পৃশংস্তদ্বিদঃ।
চণ্ডালানিব তর্কশাসনপটূন্ নৈয়ায়িকান্ মন্যতে
রাঢ়ীয়ৈরতিহর্ষগদ্গদগলৈঃ প্রাভাকরঃ শ্রূয়তে॥[৫৯]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে "কাব্যপ্রকাশ"-এর দীপিকাটীকায় চণ্ডিদাস (ইনি "সাহিত্যদর্পণ"কার বিশ্বনাথ কবিরাজের খুল্লপিতামহ) বলেছেন, "যদি তু প্রাভাকরৈঃ সার্ধং বিজিগীষুকথাকণ্ঠাদুন্দুর্ রোদেহস্তদা তামেব মৃগয়িতুং রাঢ়াদিরাষ্ট্রং গচ্ছতি।"[৬০] অহংকার এই প্রাভাকর বা গুরুমতেরই অনুরাগী।

তাছাড়া গৌড়ে মীমাংসাচর্চার ধারাটিও একটু ভিন্ন ছিল। অহংকার যে-ভাবে বৈদিক ব্রাহ্মণদের নিন্দা করে—অর্থাবধারণ বিধুরাঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নমাত্রনিরতা বেদবিপ্লাবকা এব—তাতে বোঝা যায়, তার আগ্রহ অর্থভেদে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত হলায়ুধের প্রাক্-সায়ণ বেদভাষ্য "ব্রাহ্মণসর্বস্ব"-এও এর সমর্থন পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলছেন,

> উৎকলপাশ্চাত্ত্যাদিভির্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে রাঢ়ীবারেন্দ্রৈস্তবধ্যয়নং বিনা কিয়দেব বেদার্থস্য কর্মমীমাংসাদ্বারেণ যজ্ঞেতিকর্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে।[৬১]

হলায়ুধ অবশ্য একে সমর্থন করেন নি, কারণ এর কোনোটিতেই মন্ত্রার্থজ্ঞান হয় না। "এতৈস্তু রাঢ়ীয়বারেন্দ্রকৈরর্থবিচার এব কেবলঃ ক্রিয়তে। এবং চোভয়োরপি গ্রন্থার্থতো বেদজ্ঞানং নাস্ত্যেব। তত্বরং বেদৈকদেশস্যাপি যথাবিধ্যধ্যায়নং কৃত্বার্থবিচারঃ ক্রিয়ত ইত্যুবিতং ভবতি।" বেদচর্চার এই দুরবস্থা দূর করার জন্যই হলায়ুধ বেদের অবশ্যপাঠ্য কিছু অংশ বেছে নেন ও তার বিশদ ব্যাখ্যা করেন। হলায়ুধের এক শতাব্দী আগেই বেদচর্চা প্রায় বন্ধ বা বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। "প্রবোধচন্দ্রোদয়"-এ চার্বাক বলে, ব্যতীতবেদার্থপথঃ প্রথীয়সীং যথেষ্টচেষ্টাং গমিতো মহাজনঃ।...তত্রোত্তরাঃ পথিকাঃ পাশ্চাত্যাশ্চ ত্রয়ীমেব ত্যাজিতাঃ।...অন্যত্রাপি প্রায়শো জীবিকামাত্রকলৈব ত্রয়ী।" (অংক 2, পৃ. 76)। প্রসঙ্গত বলা যায়, দাক্ষিণাত্যে 'বৈদিক' বলতে তাঁদেরই বোঝায় যাঁরা অর্থ না বুঝেও যথারীতি বেদগান করতে পারেন।[৬২]

ওপরের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, ভূরিশ্রেষ্ঠক তথা রাঢ়ের সমাজজীবন ও সারস্বতচর্চা সম্পর্কে কৃষ্ণমিশ্র অনেক খুঁটিনাটি খবর রাখতেন। কেবলমাত্র দূর থেকে দেখলে এত গভীর ধারণা হওয়া সম্ভব নয়।

॥ তিন ॥

চক্রতীর্থপরিচয় ঃ দ্বিতীয় কথা ঃ চক্রতীর্থ।

স্কন্দপুরাণে চারটি চক্রতীর্থের কথা বলা হয়েছে, "রাঢ়াভিধান জনপদ"-এ "ভাগীরথীপরিসরালংকারভূত" চক্রতীর্থ তারই একটি কিনা—সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। পুরী, কাশী, প্রভাস ও বৃন্দাবন ছাড়াও দক্ষিণসমুদ্রতীরের আরেকটি চক্রতীর্থের কথা

স্কন্দপুরাণেই পাওয়া যায়। "প্রবোধচন্দ্রোদয়"-এর পঞ্চম অংকে যে-চক্রতীর্থের কথা বলা হয়েছে, তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় বরাহপুরাণে।

রাঢ়ের চক্রতীর্থও বিখ্যাত জায়গা। বর্তমান চব্বিশ-পরগনা জেলার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় মথুরাপুর থানার একটি গ্রাম চক্রতীর্থ। গঙ্গা, সঙ্কেতমাধব, অম্বুলিঙ্গ শিব ও ত্রিপুরাসুন্দরী শক্তি—এই চতুর্ব্যূহ মহাশক্তির অধিষ্ঠানের জন্যই নাকি এর নাম চক্রতীর্থ। এর মধ্যে সঙ্কেতমাধব একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি, ব্রহ্মশীলা বা কষ্ঠিপাথরের তৈরি। আদি ভাগীরথীর ধারা দূরে সরে গেছে, মহাশ্মশানের বুকে এখন প্রাচীন চক্রতীর্থের অবস্থান। এ অঞ্চলে পাল আমলের ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে।[৬৩]

চক্রতীর্থ নামের উৎপত্তি নিয়ে একটি কাহিনী আছে। "চৈতন্য ভাগবত"-এর বর্ণনায় দেখি, ভগীরথ যখন গঙ্গাকে নিয়ে আসছেন তখন মহাদেব বিরহে অধীর হয়ে গঙ্গাকে অনুসরণ করেন এবং ছত্রভোগের কাছে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। জলস্রোতের আওয়াজ না পেয়ে ভগীরথ বারবার শাঁখ বাজাতে থাকেন, তখন গঙ্গা তাঁর হাতের জ্যোতির্ময় চক্র দেখিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করেন। গঙ্গা তারপর তো এগিয়ে চললেন। জলস্রোত থেমে যেতে শিব শিলাময় লিঙ্গরূপে স্থলে দেখা দিলেন। শিব গঙ্গার মিলনস্থলে চক্র দেখানো হয়েছিল বলেই নাকি এর নাম চক্রতীর্থ।[৬৪]

চক্রতীর্থের কাছেই ছত্রভোগ। চৈতন্য পুরী যাবার সময় এই ছত্রভোগের খাঁড়ি দিয়েই নৌকাযাত্রা করেছিলেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর "চণ্ডীমঙ্গল"-এও ত্রিপুরাসুন্দরী ও অম্বুলিঙ্গ শিবের কথা আছে।[৬৫] ত্রিপুরাসুন্দরী একটি শক্তিপীঠ, অম্বুলিঙ্গ এর ভৈরব। আসলে ত্রিপুরাসুন্দরীকে কেন্দ্র করে তান্ত্রিক পীঠস্থানের মহিমা বোধহয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতেই গড়ে উঠেছিল—দীনেশচন্দ্র সরকারের অনুসরণে বিনয় ঘোষ এই রকম একটি মত প্রকাশ করেছেন।[৬৬] একাদশ শতাব্দীতে বোধহয় সঙ্কেতমাধব ও অম্বুলিঙ্গের মাহাত্ম্যই বেশি প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণমিশ্র যে-ভাবে বারাণসী ও আদি কেশব-প্রশস্তিতে শিব ও বিষ্ণু দুএরই মহিমা কীর্তন করেছেন, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এই মতই সত্য হওয়ার সম্ভাবনা।

কলি ও চার্বাক : কৃষ্ণমিশ্রের গৌড়ীয় উৎসের সপক্ষে আরো দুটি গৌণ তথ্য হাজির করা যায়। "প্রবোধচন্দ্রোদয়"-এর দ্বিতীয় অংশে চার্বাককে যে-ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে, "নৈষধ-চরিত"-এর সঙ্গে তার মিল প্রচুর।[৬৭] দু জায়গাতেই চার্বাককে স্বয়ং কলি বা তার অনুচর হিসেবে দেখানো হয়েছে। শ্রীহর্ষের গৌড়ীয় উৎস (অন্তত প্রাচ্য ভারতীয় উৎস) সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। নীলমাধব ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ পণ্ডিত বহু আভ্যন্তর ও বহিঃসাক্ষ্যের সাহায্যে তা প্রমাণ করেছেন।[৬৮] "বিজয় প্রশস্তি" রাজা বিজয় সেনের প্রশস্তি হল শ্রীহর্ষ দ্বাদশ শতাব্দীর কবি। দুজনেই বোধ হয় গৌড়াঞ্চলে প্রচলিত বার্হস্পত্য দর্শন বিষয়ক কোনো গ্রন্থ থেকে লোকায়তমতের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেছিলেন। এ সময়ে লোকায়ত মত ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল, অল-বিরুনির বিবরণেও তার সাক্ষ্য মেলে।[৬৯] কৃষ্ণমিশ্র ও শ্রীহর্ষ উদ্ধৃত কয়েকটি লোকায়তিক শ্লোক মাধবাচার্যের "সর্বদর্শন সংগ্রহ"-এও স্থান পেয়েছে।[৭০]

প্রবোধচন্দ্রোদয় ও দেবীভাগবত পুরাণ : "প্রবোধচন্দ্রোদয়"-এর তৃতীয় অংকে ভিক্ষু ক্ষপণক ও কাপালিকের যে-ছবি রয়েছে, তার সঙ্গে দেবীভাগবত পুরাণের একটি উপাখ্যান (দ্বাদশ স্কন্দ, অষ্টম-নবম অধ্যায়) মিলিয়ে পড়ার মতো। পুরাণটি গৌড়েই রচিত, রচনাকাল দশম থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে।[৭১] সেখানে দেখি, জনমেজয় ব্যাসদেবকে প্রশ্ন

করছেন, ব্রাহ্মণরা শক্তি উপাসনা না করে অন্য দেবতা গ্রহণ করছেন কেন ? কেউ বৈষ্ণব, কেউ গাণপত, কেউ বা চীনমার্গরত বল্কলধারী কাপালিক, অথবা দিগম্বর (জৈন), বৌদ্ধ বা চার্বাকপন্থী। নানাতর্কবিচক্ষণ বুদ্ধিমান পণ্ডিতরাও বেদের প্রতি শ্রদ্ধা বিবর্জিত। এর কারণ কী ? উত্তরে ব্যাসদেব ঋষি গৌতম ও তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী ব্রাহ্মণদের কাহিনী বললেন। গৌতম চক্রান্তকারীদের শাপ দিয়ে বললেন, তারা কাপালিক মতাসক্ত ও বৌদ্ধ-শাস্ত্ররত হবে, মাতা, কন্যা ও ভগিনীগামী হবে, পরস্ত্রীলম্পট হবে, এবং তাদের বংশধররাও এই শাপে দগ্ধ হবে। তারই ফলে—

মূল প্রকৃতিমব্যক্তাং নৈব জানন্তি কর্হিচিৎ।
তপ্তমুদ্রাঙ্কিতা কেচিৎ কামাচাররতাঃ পরে।
কাপালিকাঃ কৌলিকাশ্চ বৌদ্ধাজৈনাস্তথাপরে।
পণ্ডিতা অপি তে সর্বে দুরাচারপ্রবর্তকা॥
লম্পটা পরদারেষু দুরাচারপরায়ণাঃ॥
কুম্ভীপাকং পুনঃ সর্বে যাস্যন্তি নিজকর্মভিঃ॥[৭২]

'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-এ ভিক্ষুর চরিত্রটি এই ধরনের এক দুরাচারপরায়ণের। ভিক্ষু বলে ঃ অহো সাধুরয়ং সৌগতোধর্মো যত্র সৌখ্যং মোক্ষশ্চ। তথাহি—

আবাসো লয়নং মনোহরমভিপ্রায়ানুরূপা বণিঙ্-
নার্যো বাঞ্ছিতকালমিষ্টমশনং শয্যা মৃদুপ্রস্তরাঃ।
শ্রদ্ধাপূর্বমুপাসিতা যুবতিভিঃ ক্লৃপ্তান্নদানোৎসব-
ক্রীড়ানন্দভরৈর্বজন্তি বিলসজ্জ্যোৎস্নোজ্জ্বলা রাত্রয়ঃ॥ (3.9, পৃ 104-105)

[অহো সৌগত (বৌদ্ধ) ধর্মই সাধু, সেখানে সুখও আছে, মোক্ষও আছে। মনোহর গৃহে বাস, ইচ্ছানুরূপা বেশ্যা (বা বণিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠীদের স্ত্রী), বাঞ্ছিত কালে মিষ্টান্ন ভোজন, কোমল আস্তরণযুক্ত শয্যা, শ্রদ্ধাপূর্বক উপসিতা যুবতীদের অন্নদান-উৎসব, ও ক্রীড়ার আনন্দে জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল রাত্রি কেটে যায়।]

চন্দ্রিকা-টীকায় বলা হয়েছে ঃ অত্র বৌদ্ধমতে বৌদ্ধপরিব্রাজকলিঙ্গপূজাং স্বপত্যানু-মত্যৈব কুর্বন্তি তে পরিব্রাজকাস্তেষাং মন্মথছত্রাণি পূজয়ন্তীতি তদাগমক্রমঃ।

এ হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের চেহারা। তন্ত্রের প্রভাবও অত্যন্ত স্পষ্ট। সোম-সিদ্ধান্তের কাছে ভিক্ষুর আত্মসমর্পণ তন্ত্রের কাছে বৌদ্ধধর্মের আত্মসমর্পণেরই রূপক।[৭৩]

এই সব তান্ত্রিক আচার ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম যে গৌড়েরই বৈশিষ্ট্য ছিল—এমন নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই তন্ত্রের ব্যাপক প্রভাব ছিল। আবার নিরীশ্বরবাদী দর্শনপ্রস্থান সম্পর্কেও বৈষ্ণবদের বিরাগ সুপরিজ্ঞাত। "হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র"-এ বলা হয়েছে জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এব চ। কপিলাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ॥ এতন্মতানুসারেণ বর্তন্তে যে নরাধমাঃ। তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তাস্তেভ্যস্তন্ত্রং ন দাপয়েৎ॥[৭৪] (গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রামাণ্য স্মৃতিগ্রন্থ "হরিভক্তিবিলাস"-এও এটি উদ্ধৃত হয়েছে।[৭৫] আদি মীমাংসা, বৌদ্ধমত, নাস্তিকমত (লোকায়ত, অথবা কেবলমাত্র বেদবিরোধী অর্থে) ও নগ্ন (জৈন, অথবা পাশুপত বা অন্য কোনো নাগা সম্প্রদায়)—এদের সঙ্গে সাংখ্য ও ন্যায়দর্শনের সমীকরণ খুবই চিত্তাকর্ষক। বিষ্ণুভক্ত বৈদান্তিক কৃষ্ণমিশ্রও বোধহয় এই 'ছয় হেতুবাদী'র নরাধমত্ব সম্পর্কে একমত ছিলেন। তর্কবিদ্যার শিষ্যদের মধ্যে তিনি বৈশেষিক, ন্যায় ও সাংখ্যকে হাজির করেছেন, মীমাংসা ও যজ্ঞবিদ্যাও নিন্দিত হয়েছে (অংক 6, পৃ. 215-230)।

শ্রীহর্ষের মতো কৃষ্ণমিশ্রও গৌড়ের বাইরে বসে নাটক রচনা করলেও তাঁর জন্মভূমির ঘটনাগুলিকেই হাজির করেছেন। বারাণসীর যে-ঘাটে অহংকারের নৌকা এসে থামে, সেখানে নিশ্চয়ই অন্য রাজ্য থেকেও নৌকা আসতো, কিন্তু কৃষ্ণমিশ্র বিশেষ করে উল্লেখ করেন রাঢ়ের ভূরিশ্রেষ্ঠক ও চক্রতীর্থের। তাঁর সমসাময়িক বা অব্যবহিত পরের গৌড়ীয় কবিরা যে-বিষয়গুলি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, তার সঙ্গে তাঁর নাটকের মিল থাকা তাই আশ্চর্য নয়।

ভূরিশ্রেষ্ঠ ও চক্রতীর্থের উল্লেখ ও বিশদ বিবরণ, গৌড় অঞ্চলে বিশিষ্টার্থে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার, রাঢ়ী ব্রাহ্মণের টিপিক্যাল রূপায়ক, মীমাংসা ও বেদচর্চার অবস্থা—মূলত এই ক-টি বিষয়ে কৃষ্ণমিশ্র যে-সব নমুনা উপস্থিত করেছেন, তার ভিত্তিতে তাঁকে "রাঢ়ের সন্তান" মনে করা আদৌ অসমীচীন হবে না।

॥ সূত্র নির্দেশ ॥

*"প্রবোধচন্দ্রোদয়", বাসুদেব লক্ষ্মণ পণশীকর সম্পাদিত। নান্দিল্ল গোপের 'চন্দ্রিকা' ও রামদাস দীক্ষিতের 'প্রকাশ' টীকা সমন্বিত। বোম্বাই : নির্ণয় সাগর প্রেস, 1910 (তৃতীয় সং)। উদ্ধৃতি ও পৃষ্ঠানির্দেশ সর্বত্রই এই সংস্করণ থেকে।

১. It must remain uncertain whether there was a train of tradition leading from Ashvaghosa to Krishnamishra, or whether the latter created the type of drama afresh ; the former theory is more likely. A. B. Keith, **Sanskrit Drama,** Oxford : Oxford University Press, 1924, 85

We cannot say whether Krishnamishra's **Prabodhachandrodaya** was a revival of a form of drama, which had been practised regularly if on a small scale since Ashvaghosa or whether it was a new creation, as may easily have been the case. ibid, 251

২. Cf. S. K. De, **A History of Sanskrit Literature,** Classical Period, Vol. I, ed. S. N. Dasgupta, Calcutta : University of Calcutta, 1962 (2nd ed.), 481.

৩. Sisir Kumar Mitra, **The Early Rulers of Khajuraho,** Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay, 1958, 100 ; E. Hultzsch, "A Chandella Inscription from Mohoba", **Epigraphica Indica,** Vol. I. Calcutta 1892, 220

৪. D. D. Kosambi, Introduction, **Subhasitaratnakosa of Vidyakara,** (Harvard Oriental Series 42), Cambridge, Mass ; Harvard University Press, 1957, CXIV.

৫. Jai Dev Vidyalankar, "Krishnamishra's Indebtedness to Mahendravikramavanman's Matral. Vitosam" Vishvesharanand Indological Journal, Vol. 13. 1975, 119n1.

৬. সূত্র ৪ XXXIII

৭. **Sadriktikarnamrta of Sridharadasa** (1205), ed. Suresh Chandra Banerjee, Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay, 1965, 150 (sl. 559)

Sarngadharapaddhati, ed. Peter Peterson (Bombay) Sanskrit Series, XXXVII), Bombay, 1888, 47 (sl. 308)

৮. **Subhasitavali** of Vallabhadeva, ed. Peter Peterson (Bombay Sanskrit Series, XXXI), Bombay, 1886, 570 (sl. 3475)

৯. সূত্র ৮ 621 (sl. 4067) ও 444 (sl. 3081)

সূত্র ৮ 412 (sl. 2400) ; 509 (sl. 3077, 3078) ; 545 (sl. 3321) যথাক্রমে "প্রবোধচন্দ্রোদয়", 2.9 ; 2.1 ; 2.5 ; 2,9

১০. V. Raghavan, **New Catalogus Catalogarum**, Vol. IV, Madras : University of Madras, 1968, 344 এবং Ludwik Sternbach, **Mahasubhasita-Samgrahah**, Vol I, Delhi : Motilal Banarsidass, 1974, 327 দ্র।

১১. "প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকম্" (সটীকম্) সং শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী, কলকাতা : বি. এন. নন্দী, তাং নেই, 6, টীকা 3

১২. H. C. Ray, **The Dynastic History of Northern India** (Early Mediaeval Period), Vol. II, New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers, 1973, 2nd ed (1st pub. University of Calcutta, 1931-36), 695, 697, 700.

R. C. Mazumdar, **Ancient India**, Varanasi : Motilal Banarsidass, 1968, 331

১৩. সূত্র 3, 96 ও 98-99 দ্র। 'সামন্ত' শব্দটির ব্যঞ্জনার জন্য জ্যোতি ভট্টাচার্য, "পরিপ্রশ্ন", কলকাতা : সুপর্ণা, 1975, 52-56 দ্র।

১৪. জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "পঞ্চোপাসনা", কলকাতা : কে. এল. মুখোপাধ্যায়, 1960, 306, 323-24, 339-40 দ্র।

১৫. F. Kielhorn, Deogarh Rock Inscription of Kirtivarman," **Chandella Inscriptions, The Indian Antiquary** (18), August 1889, 238

১৬. M. Krishnamachiar, **History of Classical Sanskrit Literature**, Madras, 1937, 676 ও 678 (অনুচ্ছেদ 750, 751) দ্র।

১৭. "প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্", প্রকাশনামক সংস্কৃত হিন্দী টীকা সহ পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র মিশ্র সম্পাদিত, বারাণসী : চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, 1968, সমালোচনা, 8

১৮. ক্ষিতিমোহন সেন, "চিন্ময় বঙ্গ", কলকাতা : শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, 1957, 120, 145 ও 165 দ্র।

১৯. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান", কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, 1369 বঙ্গাব্দ, 120-121

২০. বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, "হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস" (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, 1232 বঙ্গাব্দ, 46

The History of Bengal (Vol. I), ed. R. C. Majumdar, Dacca : The University of Dacca, 1963 (2nd impression) ; 313 n1

সুকুমার সেন, "প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী" (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : 12), কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, 1972, 35

নীহাররঞ্জন রায়, "বাঙ্গালীর ইতিহাস" (আদিপর্ব), কলিকাতা : বুক এম্পোরিয়ম 1359 বঙ্গাব্দ, 149, 152, 359

সুধীরকুমার মিত্র, "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ", কলকাতা : মিত্রানী প্রকাশন (দ্বিতীয় সং), 1962, পৃ. 40. উদ্ধৃতি ও মন্তব্য দুটিই অবশ্য ভুলে ভরা।

বিনয় ঘোষ, "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি", কলকাতা : পুস্তক প্রকাশক, 1957, 576

শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ, "গৌড় কাহিনী", কলকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরি, 1884 শক, 15, 180. অনুবাদে মারাত্মক ভুল আছে ("গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং···এই বর্ণনানুসারে গৌড় এক নিকৃষ্ট জনপদ হলেও তার অঙ্গরাজ্য রাঢ়ের কোন তুলনা নেই।" !)

২১. লালমোহন বিদ্যানিধি, "সম্বন্ধ নির্ণয়", কলকাতা, 1896 [দ্বিতীয় সং], ক্রোড়পত্র 58-য় উদ্ধৃত।

২২. প্রশস্তপাদ ভাষ্যম্ (পদার্থধর্মসংগ্রহাখ্যম্) শ্রীধরভট্ট প্রণীতয়া ন্যায়কন্দলীব্যাখ্যায়া সংবলিতম্। শ্রীদুর্গাধর ঝা শর্মা সম্পাদিত। বারাণসী : বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, 1963, 787 (শ্লোক 3)

২৩. সূত্র 19 "বাঙ্গালীর ইতিহাস", 149 ও 359 দ্র।

২৪. সূত্র **The History of Bengal** vol. 1, 14 এবং R. C. Majumdar, **History of Ancient Bengal**, Calcutta : G. Bharadwaj & Co. 1971, 7 এবং 14-এও একই কথা বলা হয়েছে।

২৫. সূত্র 19 "প্রাচীন বাঙ্গালী", 34

২৬. সুখময় ভট্টাচার্য, "বৈশেষিক দর্শন", কলকাতা : বিশ্বভারতী, 1360 বঙ্গাব্দ, 4

২৭. সূত্র 19 **The History of Bengal**, 313. রমেশচন্দ্র মজুমদারও "কাছে" এই আপেক্ষিক শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

২৮. ক্ষিতিমোহন সেন, "বাংলার সাধনা", কলকাতা : বিশ্বভারতী, 1371 বঙ্গাব্দ, 69. এ ছাড়া, সূত্র 18, 68 দ্র।

২৯. আঞ্চলিক কাহিনীর জন্য বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ও বাণীকুমার, "রায়বাঘিনী ও

ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকাহিনী", কলকাতা : নবভারতী, 1364 বঙ্গাব্দ [প্রথম প্রকাশ ঃ "বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী", 1326", বঙ্গাব্দ] ব্যবহার করা হয়েছে। বন্ধনীর মধ্যে যে মৌখিক ইতিবৃত্ত রয়েছে সেটি বিনয় ঘোষের সংগ্রহ। সূত্র 19 "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি", 577-78.

এ ছাড়া "বাংলায় ভ্রমণ" (প্রথম খণ্ড), প্রচার বিভাগ, পূর্ববঙ্গ রেলপথ, 1940, 54 দ্র। পুরো কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা অবশ্য খুবই সন্দেহজনক।

৩০. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভুরশুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ "প্রবাসী", ভাদ্র 1359 বঙ্গাব্দ, 535-39।

৩১. সূত্র 28 "রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকাহিনী", ভূমিকা (পৃ. ১৪-য়) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কালাপাহাড়ের ভুরশুট উৎস সমর্থন করেছিলেন। বারেন্দ্র পক্ষের গল্পের জন্য দুর্গাচন্দ্র সান্যাল, বাংলার সামাজিক ইতিহাস", কলকাতা : লোকনাথ এণ্ড কোম্পানী, সন 1317 সাল (নূতন সং), 88 দ্র। দুটি গল্পেই একটি সুন্দর হিন্দু-মুসলমান রোমান্স আছে। আধুনিক ঐতিহাসিকরা অবশ্য এর কোনোটিই স্বীকার করেন না। "বাংলাদেশের ইতিহাস" (দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ) রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, কলকাতা : জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, 1373 বঙ্গাব্দ, 123 (টীকা) দ্র।

৩২. সূত্র 28 "রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকাহিনী", 374 দ্র। এই গল্পটিকে জোর দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। তার 'রায়বাঘিনী ও কালাপাহাড়', "প্রবাসী", পৌষ 1061 বঙ্গাব্দ, 277-78 দ্র।

৩৩. ভারতচন্দ্র রায় "রাসমঞ্জরী", গ্রন্থারম্ভ, "ভারতচন্দ্র রচনাসমগ্র", ড. ক্ষেত্রগুপ্ত ও ড. বিষ্ণু বসু সম্পাদিত, কলকাতা : ভৌমিক অ্যাণ্ড সন্স, 1974, 390.

৩৪. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, "বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান : বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা", কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, 1358 বঙ্গাব্দ, 7.

৩৫. সূত্র 19 "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি", 574

৩৬. **Prabodh Chandrodaya,** or **The Moon of Intellect,** trans. J. Taylor, Calcutta : Reprinted at the Poornochundrodoy Press, 1854, 13-14.

৩৭. **Prabodhachandrodaya,** trans. Dr. Sitakrishna Nambiar, Delhi : Motilal Banarsidass, 1971, 33

৩৮. "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী" তৃতীয় ভাগ, কলকাতা : বসুমতী সাহিত্য মন্দির, তাং নেই, 135

৩৯. সূত্র [19 "প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী", 359] নীহাররঞ্জন রায়ও লিখেছেন, "এই গ্রাম আজও ভুরসুট নামে পরিচিত।" [19 "বাঙ্গালীর ইতিহাস", 359]

৪০. **Prabodhachandrodaya** ed. **K. Sambasiva Sastri,** Trivandrum Sanskrit Series, CXXII, Trivandrum, 1936, 48 [with **Natekabharana** Commentary by Sngovindamrtabhayarvan]

৪১. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, "বাঙ্গলা ভাষার অভিধান", কলকাতা : দি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, (দ্বিতীয় সং), তাং নেই, 4নং অর্থ দ্র।

৪২. নগেন্দ্রনাথ বসু, "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", প্রথম ভাগ (ব্রাহ্মণ কাণ্ড), প্রথম অংশ, কলকাতা, তাং নেই, 133-34.

৪৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, "বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র", কলকাতা : ভারতী বুকস্টল, 1973, 72

৪৪. সূত্র 20, 28 ; সূত্র 19 **The History of Bengal**, 635-36 দ্র।

৪৫. সূত্র 20, 24

৪৬. সূত্র 20, ক্রোড়পত্র, 18. মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গল"-এও (কালকেতুর উপাখ্যান। ব্রাহ্মণগণের আগমন) গাঁঞি-এর তালিকায় আছে : "কাঞ্জারী সাহরি ভুরিঠাল।" (বসুমতী সং 69)

৪৭. সূত্র 20, 299-300।

৪৮. 41, 306-07 ও 341 দ্র।

৪৯. সূত্র 20, 299-300 ; ঐ, ক্রোড়পত্র, 65-66 দ্র।

৫০. সূত্র 20, 472

৫১. ঐ, 554. পরবর্তীকালে 'সচ্ছোত্রিয়ে'র বদলে 'সিদ্ধ শ্রোত্রিয়' শব্দটিই বেশি ব্যবহার হয়েছে। যেমন, "দু'একটী বংশ ব্যতীত সাধারণতঃ কুশারিগণ সিদ্ধ বা সৎ শ্রোত্রিয় মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিলেন।" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ" (হিতৈষণা গ্রন্থাবলী. 32), কলকাতা, 1933, 215.

৫২. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী", কলকাতা ; এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, 1368 বঙ্গাব্দ, 67-08

৫৩. সুকুমার সেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", (প্রথম খণ্ড) পূর্বার্ধ, কলকাতা : ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, 1970, 390, টীকা 1-এ উদ্ধৃত।

৫৪. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, "ভারতীয় দর্শন" (প্রথম খণ্ড), কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, 1960, 4-5, টীকা 6 দ্র।

৫৫. কুমারিল ভট্ট, "মীমাংসাশ্লোক বার্তিকম্", মানবল্লী তৈলঙ্গ রামশাস্ত্রী সম্পাদিত, কাশী, 1898, গ্রন্থকার প্রতিজ্ঞা, 4 (শ্লোক 10).

৫৬. সূত্র 33, 7-8

৫৭. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'বালবলভী ভুজঙ্গ ভট্ট ভবদেব', "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ জয়ন্তী উৎসব স্মারক গ্রন্থ", কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তাং নেই, 264 [প্রবন্ধটি প্রথমে "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা", বর্ষ 52, সংখ্যা 3-4, 1352-য় প্রকাশিত হয়েছিল।]

৫৮. **Nyayakusumanjali** (আশুতোষ সংস্কৃত গ্রন্থমালা 4). ed. Narendrachandra Bhattacharya, Part II, Calcutta, University of Calcutta, 1964, 253 (স্তবক 3,14) & **Nyayakusumanjali-bodhani** (The Prince of Wales Saraswati Bhavana Texts, No 4), ed. Gopinath Kaviraj, Allahabad,

1922, 123. গৌড় মীমাংসক ও শালিকনাথ বিষয়ে ডঃ সুশীলকুমার দে অবশ্য নিশ্চিত নন, সূত্র 19 **The Hiitory of Bengal**, 323. টীকা 4 দ্র।

৫৯. শঙ্খধর "লটকমেলক" (নির্ণয়সাগর কাব্যমালা গ্রন্থাবলী), পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ শর্মা সম্পাদিত। বোম্বাই : নির্ণয়সাগর প্রেস, 1900, 22

৬০. সূত্র 56, 264 (টীকায় উদ্ধৃত)। এছাড়া 'রাঢ়দেশের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ', "প্রবাসী" জ্যৈষ্ঠ, 1356 বঙ্গাব্দ, পৃ. 116-তেও দীনেশবাবু এটি পুঁথি থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

৬১. হলায়ুধ, "ব্রাহ্মণসর্বস্ব", দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা : সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, 1960,8

৬২. সূত্র 17, 55

৬৩. সূত্র 19 "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি", 625. বিস্তৃত আলোচনার জন্য কালিদাস দত্ত, 'ছত্রভোগ', "প্রবাসী", মাঘ 1359 বঙ্গাব্দ, 433-38 দ্র।

৬৪. বৃন্দাবন দাস, "চৈতন্য ভাগবত" (অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়), সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, কলকাতা ঃ দেব সাহিত্য কুটীর, 1974, 370

৬৫. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, "কবিকঙ্কণ চণ্ডী", কলকাতা ঃ বসুমতী সাহিত্য মন্দির, তাং নেই, 182 [ধনপতি সওদাগরের উপাখ্যান। শ্রীমন্তের গমন-অংশ। পাঠান্তরে (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃ. 196) ত্রিপুরাসুন্দরীর কথা নেই।]

৬৬. সূত্র 19 "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি", 632

৬৭. শ্রীহর্ষ, "নৈষধচরিত" (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, উত্তরার্ধরূপে দ্বিতীয় খণ্ড, 1849 শকাব্দ), সর্গ 17 দ্র। কলির বন্দীকে ইন্দ্র 'লোকায়ত!' বলেও সম্বোধন করেছেন (17.96)।

৬৮. সূত্র 17, 73-74. ও সূত্র 23 "History of Acient Bengal", 395-398 দ্র। সুশীলকুমার দে অবশ্য এক্ষেত্রেও নিশ্চিত নন। (ঐ, 396 দ্র)

৬৯. "...the book **Lanka yata**, composed by Brihaspati, treating of the subject that in all investigations we must exclusively rely upon the appreciation of the senses...", Alberunis **India**, Vol. I. trans. E. C. Sachan, London : Paul, Trench, Trebnen & Co, 1910, 132. এই প্রসঙ্গে কপিলের "সাংখ্য", পতঞ্জলি, কপিলের "ন্যায়-ভাষ্য", জৈমিনির "মীমাংসা", লোকায়ত, অগস্ত্যমত ইত্যাদির উল্লেখও পাওয়া যায় (ঐ, 132)।

৭০. **Sarvadarsamhanasagra** of Sayana=Madhava (Govt. Oriental (Hindi) Series I). ed. MM. Vasudev Sastri Alhyankar, Poona : **Bhandarkar** Oriental Research Institute, 1924. 2-5, 7,13-15 দ্র। তুলনীয় "নৈষধ" 17·38 ; 17.70 ; 17.202 ও "প্রবোধ" 2.20, 21, 23, 25, 27, 28.

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, "চার্বাকদর্শন", কলকাতা ঃ পুরোগামী প্রকাশনী, 1959, 176 দ্র।

৭১. সূত্র 18, 225-226 দ্র। 4-তে, "মত্তবিলাসপ্রহসন" (সপ্তম শতাব্দী)-এর কাছে কৃষ্ণমিশ্রের ঋণ সম্পর্কে যে আলোচনা আছে সে কথা মনে রেখেও বলা যায়, একাদশ শতাব্দীতে বাংলার বৌদ্ধরা বাস্তবেও এই একই ধরনের বিলাসী জীবন যাপন করতেন : রোম-তন-এর লেখা

অতীশের জীবনীতেও তার প্রমাণ আছে। সপ্তম শতাব্দী থেকেই এই অবক্ষয়ের নজির সংস্কৃত, তিব্বতী, চীনা ইত্যাদি সূত্রে পাওয়া যায়। Viney Kumar, Luxurious Living of Indian **Bnddhists", Vishvesh Narun and Indological Journal** Vol 13. 1975, 415-16 দ্র।

৭২. **"দেবীভাগবতপুরাণ,"** হরিচরণ বসু সম্পাদিত, কলকাতা : সারস্বত লাইব্রেরী, 1816 শকাব্দ (12.9.95-97)

৭৩. **The Hayasirsapansaratram,** ed. Late Pandit Bhuban Mohan Sarikhyatirtha, Rajsahi : Varendra Research Society, 1592. Vol. I, 18 (পঞ্চম পটল, শ্লোক 2-3)

74. **"হরিভক্তিবিলাস",** রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, মুর্শিদাবাদ, 1289 বঙ্গাব্দ (প্রথম বিলাস, 48).

পরিষদ-সংবাদ

প্রসঙ্গ : পরিষৎ পত্রিকা :

দীর্ঘদিন যাবৎ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার অনিয়মিত প্রকাশে ৮৭তম বর্ষের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি উদ্বিগ্ন। নিয়মানুযায়ী ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে পত্রিকার চারিটি সংখ্যা প্রকাশই তাঁহারা করণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তদনুযায়ী গত ভাদ্রমাসে দায়িত্বভার গ্রহণের পরেই পরিষদ পত্রিকার ৮৬তম বর্ষের ১ম সংখ্যা মুদ্রণ ও প্রকাশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার্য যে, আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উক্ত সংখ্যা প্রকাশ করিতে পৌষের ডাক প্রায় ব্যর্থ হইতে চলিল। এই বিলম্বের জন্য বিদ্যুৎ-ঘাটতি, মুদ্রণ-বিভ্রাট, দুর্লভ কাগজ প্রভৃতিকে উল্লেখ করা গেলেও ইহার মূলে উদ্যোক্তার অসহায়তা প্রকাশ করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। একান্ত ইচ্ছা, আন্তরিক প্রচেষ্টাও ইহার প্রকাশকে ত্বরান্বিত করিতে পারে নাই।

পরিষদ ভবনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

১৩৮৫ বঙ্গাব্দ যখন অস্তাচলে তখন এক সন্ধ্যায় (১০ই মার্চ, ১৯৭৯) তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বাঙালীর সংস্কৃতির পীঠস্থান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রদর্শনে আগমন করেন। ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ডঃ চন্দ্রের দীর্ঘ পরিচয় থাকিলেও শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে এই প্রথম তিনি পরিষদে আসেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিগত ৮৬ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী জাতি তথা ভারতীয় কৃষ্টি ও শিক্ষাজগতে একনিষ্ঠভাবে সেবা করিয়া আসিতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কেবলমাত্র সহস্র সহস্র দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পুঁথি ও প্রত্নবস্তুর সংগ্রহশালা নহে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ জাতীয় জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ বাঙ্গালীর বরণীয় ও স্মরণীয় মনীষিবৃন্দ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া পরিষৎ মন্দিরের মাধ্যমেই এক অনন্য ভূমিকা পালন করিয়া গিয়াছেন।

সেই মহান্ ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের নানা সমস্যার প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নিদারুণ অর্থসঙ্কটে এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম, পুঁথিশালা,

প্রকাশন বিভাগ বহু দেশী ও বিদেশী গবেষকদের চাহিদা অনুযায়ী কার্য করিতে অক্ষম। এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখিতে, ইহাকে নবজীবন দান করিবার জন্য বারংবার কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের নিকট আবেদন করিয়া আসিতেছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের নিকট হইতে এই প্রতিষ্ঠান এই পর্যন্ত যে অর্থানুকুল্য লাভ করিয়াছে। তাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

রাজ্যপাল মাননীয় এ. এল. ডায়াস এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য 'আর. সি. দত্ত কমিশন' নামে এক কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন অতি যত্নে ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় এক রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। উক্ত রিপোর্টে পরিষদ্ ভবনের সংস্কার ও অন্যান্য উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ হইতে ১১.৫২ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়, পরিষদের প্রকাশন, গবেষণা ও কর্মীদের বেতন বাবদ ও কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ হইতে ৩.১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। ইহা ছাড়া পরিষদের আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ৩৭ লক্ষ টাকার এক গচ্ছিত তহবিল গঠনের সুপারিশ করা হয়।

আর. সি. দত্ত কমিশনের উক্ত রিপোর্ট রাজ্যসরকারের মতামতের জন্য ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে পাঠানো হয়। এই রিপোর্ট পরিষদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করিলেও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই রিপোর্ট তখনো পর্যন্ত রাজ্যসরকারের বিবেচনাধীন ছিল। এখনো সেই রিপোর্টের সম্পর্কে মতামত রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠাইয়াছেন কিনা আমরা জানি না। এই ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে একান্ত অনুরোধ করা হয়।

ইতিমধ্যে পরিষদের নানা সমস্যা তীব্রাকার ধারণ করিয়াছে। পরিষদ্-ভবনের দেওয়ালে ফাটল ধরিয়াছে, দরজা জানালা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, নিরাপত্তার অভাব তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, গ্রন্থাগারে স্থান সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে, সংগৃহীত গ্রন্থ রাখিবার স্থানাভাব, পাঠকক্ষে স্থানাভাব, প্রত্নবস্তুর সংগ্রহশালায় স্থানাভাব, বৈদ্যুতিক লাইনগুলি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; আলো পাখার একান্ত অভাব, মনীষীদের তৈলচিত্র ও প্রতিকৃতিগুলির আশুসংস্কার প্রয়োজন, অনেকগুলি নূতন করিয়া বাঁধাই করিতে হইবে, বহু প্রাচীন দুর্লভ গ্রন্থের প্রতিচিত্র গ্রহণের আধুনিক কোন যন্ত্রপাতি নাই, সংগ্রহশালা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি নাই, ফলে বহু মূল্যবান জিনিস নষ্ট হইয়া যাইতেছে, প্রয়োজনের তুলনায় কর্মীসংখ্যা খুবই অল্প। যাহারা আছেন তাঁহাদের বেতনক্রম খুবই কম। গ্রন্থাগারে প্রায় বার হাজার পত্রপত্রিকা রাখিবার কোন জায়গা নাই, প্রায় ৪৫,০০০ গ্রন্থ বিজ্ঞানভিত্তিক নথিভুক্ত হওয়ার অবস্থায় আছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নানা সমস্যার আশু সমাধানের জন্য স্মারকলিপিতে একটি উন্নয়ন-পরিকল্পনা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দেওয়া হয় এবং তাহার জন্য বিভিন্ন খাতে অবিলম্বে প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকার এক দাবী পেশ করা হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পরিষদের দাবীগুলি সুবিবেচনার আশ্বাস দেন এবং অবিলম্বে গৃহসংস্কার ও সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এককালীন দুই লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

পরিষদ্-ভবনে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী :

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পরিদর্শনের অব্যবহিত পরে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী পার্থ দে গত ৬ই চৈত্র (২০ মার্চ, ১৯৭৯) পরিষদ্ মন্দির পরিদর্শন করিতে আসেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর নিকটেও একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্ম হয় ১৩০১ বঙ্গাব্দে তখন তাহার সংগৃহীত গ্রন্থ সংখ্যা ছিল মাত্র ১৯০ খানি, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে সেই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার। বলা প্রয়োজন, ইহার প্রায় সবই ব্যক্তিগত দানে গৃহীত। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, এই গ্রন্থাগারে আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীর ব্যক্তিগত সংগ্রহের গ্রন্থরাজি। এইরূপ ব্যক্তিগত দানে এই প্রতিষ্ঠান তিলে তিলে বাঙ্গালীর সারস্বত তিলোত্তমায় পরিণত হইয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব সকলের। বিশেষ করিয়া সরকারকে এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিতেই হইবে। সেজন্য গ্রন্থাগার-বিষয়ক মন্ত্রী বলিয়া শিক্ষামন্ত্রীর নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারের নানা সমস্যার কথা স্মারকলিপিতে উল্লেখিত হইয়াছে। গ্রন্থাগারে বর্তমানে যে সংগ্রহ আছে তাহার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন গ্রন্থ-ভবনকে সুরক্ষিত করা, দুর্লভ গ্রন্থসমূহের প্রতিচিত্র গ্রহণের জন্য (Microfilm, Photostat প্রভৃতি) আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা, পরিষদের নিজস্ব ভবনে গ্রন্থ বাঁধাইয়ের ব্যবস্থা করা, কীট নাশের ব্যবস্থা করা, সংগৃহীত গ্রন্থরাজির বিজ্ঞানভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করা, তালিকাভুক্ত গ্রন্থগুলিকে গ্রন্থভবনে সুবিন্যস্তভাবে রাখার ব্যবস্থা করা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত সকল গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করিয়া রাখা ; কিন্তু অর্থাভাবে এই কাজ সম্ভবপর হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যায় যখন কোন দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গে নাই তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি রেজিস্ট্রার অব পাব্লিকেশনকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এক কপি করিয়া গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা দিবার নির্দেশ দেন তাহা হইলে পুস্তক সংগ্রহের সমস্যার অনেকটা সমাধান করা যায়।

বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে বিভিন্ন খাতে বাৎসরিক মাত্র সাইত্রিশ হাজার টাকার অনুদান লাভ করে অথচ বর্তমানে পরিষদের বার্ষিক ব্যয় প্রায় এক লক্ষ টাকার ন্যায়। সেজন্য পরিষদের পক্ষ হইতে বার্ষিক ৭২,০০০ টাকার অনুদান দেওয়ার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়। ইহা ছাড়া গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনা পেশ করা হয়।

শ্রী দে পরিষদ পরিদর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পরিষদের দাবীগুলি সুবিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন।

কর্মীসংঘের দাবী :

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্মীসংঘের পক্ষ হইতেও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে পৃথক্ পৃথক্ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কর্মীসংঘ তাহাদের স্মারকলিপিতে

কর্মীদের বেতনক্রমের অপ্রতুলতা ও তজ্জনিত তাঁহাদের দুরবস্থার প্রতি মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কর্মীসংঘ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রাজ্যসরকারের কাজে কর্মীদের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের দাবী জানান।

কেন্দ্রীয় সরকারের দুই লক্ষ টাকা অনুদান :

১৩৮৬ বঙ্গাব্দের প্রথম দিকেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহসংস্কার ও সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে এককালীন অনুদান হিসাবে দুই লক্ষ টাকা লাভ করে। গত আষাঢ় মাসে পরিষদ্ ভবন সংস্কার ও সংরক্ষণ বিষয়ে কার্যনির্বাহক সমিতি সাতজন সদস্যকে লইয়া একটি উপসমিতি গঠন করেন।

উপসমিতি এই কার্যের জন্য কলিকাতা পৌর সংস্থা এবং সি. এম. ডি. এ.-র স্থপতিদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। আশা করা যায় অবিলম্বে এই কাজ শুরু করা যাইবে।

রাধাগোবিন্দ নাথ ও রাজেশ্বর দাশগুপ্তের জন্ম বার্ষিকী :

কার্যনির্বাহক সমিতি এই বৎসরে পরিষদ মন্দিরে কৃষিবিজ্ঞানী ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ রাজেশ্বর দাশগুপ্তের জন্মশতবার্ষিকী এবং রাধাগোবিন্দ নাথের চিত্রপ্রতিষ্ঠা ও জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

১ম খণ্ড : টা. ২০'০০

২য় খণ্ড : টা. ৩০'০০

বাংলা সাময়িক পত্র

১ম খণ্ড : টা. ১১'০০

২য় খণ্ড : টা. ৭'৫০

বাংলার 'সাহিত্যিকগণের প্রামাণ্য জীবনী

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রথম হইতে একাদশ খণ্ড একত্রে : টা. ১৬০'০০

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, সম্পাদক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ও বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স, ৫৭-এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৬তম বর্ষ ॥ দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ-পৌষ

১৩৮৬

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৬তম বর্ষ ॥ দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা
শ্রাবণ-পৌষ
১৩৮৬

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক :
সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক :
শ্রীমতী রেখা দে
শ্রীহরি প্রিণ্টার্স
১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০ ০৪

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৮৬তম বর্ষ ॥ সংখ্যা : ২য়-৩য়

শ্রাবণ-পৌষ, ১৩৮৬

॥ সূচীপত্র ॥

"রাঢ়াপুরী ও ভূরিশ্রেষ্ঠক"

শ্রীসুকুমার সেন

কাল সন্ধ্যার পর ৮৬তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' আমার হাতে এল। আজ সকালে তা পড়তে বসলুম। সূচীপত্র দেখে প্রথমেই খুললুম শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'কৃষ্ণমিশ্র কি বাঙ্গালী ছিলেন' প্রবন্ধটি।

তিন চার পাতা উলটোতেই আমার চোখ পড়ল ভুরসুটের আলোচনায়। আমার মনে হল এ ব্যাপারে আমি প্রকাণ্ড ভুল করেছি। আর সকলের মতো রাঢ়াপুরীকে রাঢ়দেশের নামান্তর মনে ক'রে এবং অহংকারের উক্ত "ভূরিশ্রেষ্ঠক" শব্দটিকে শ্রীধরের উক্ত 'ভূরিসৃষ্টি' গ্রামের নামের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে ভুল করেছি। এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি তা নয়।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে বাঙালী কুলীন বামুন অহংকারে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে বলেছেন এই কথা,

> গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী
> ভূরিশ্রেষ্ঠকনাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।

বাংলায় যথাযথ অনুবাদ করলে এই রকম হয়:

'অনুত্তম (যে) গৌড় রাজ্য সেখানে (যে) নিরুপম রাঢ়াপুরী (যা) যথার্থ বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পরম আশ্রয়স্থান সেখানে (যাঁর নাম) উত্তম (অথবা সেখানে যিনি উত্তম) (তিনি) আমাদের বাবা।'

মূল সংস্কৃতে যদি আর একটা 'তত্র' থাকত 'রাঢ়াপুরী-র পরে তাহলে আমাদের সকলের গৃহীত অর্থ খাটত। তা নেই। সুতরাং "ভূরিশ্রেষ্ঠক নাম পরমং ধাম" রাঢ়াপুরীর সমানাধিকরণ পদ। এখানে তার্কিক তর্ক তুলতে পারেন—ওই যে 'নাম' শব্দ রয়েছে। ভূরিশ্রেষ্ঠক তাহলে স্থান নাম। এর বিরুদ্ধে যুক্তি যা আমরা কেউই আগে এড়াতে পারিনি যে রাঢ়াপুরী গ্রাম-নগর নাম ছাড়া ব্যাপক স্থান নাম হতে পারে না। এই বিরোধ ঘুচে যায় এবং আমার এই প্রবন্ধের বক্তব্যের প্রতিপাদন হয় যদি 'নাম' শব্দটি বাক্যালঙ্কার রূপে গ্রহণ করি। যেমন কালিদাসের প্রয়োগ,

> পরিশ্রমং নাম বিনীয় চ ক্ষণম্।

এখন প্রশ্ন উঠবে রাঢ়াপুরী নিয়ে। এ নামটি খাঁটি কিনা। এ কি গৌড়ের রাজধানী ছিল? না কোন বিশিষ্ট গ্রাম? এর কোন মীমাংসার উপায় এখন দেখা যাবে না। তবে 'রাঢ়াপুরী' যদি সত্য সত্য তখনকার কোন গ্রামের নাম হয় আর সে গ্রাম-নাম যদি অত্যাবধি চলে এসে থাকে তবে তা এখন হবে 'রাড়ুরি' অথবা 'রাড়ুলি'

বা এমনি কিছু। মনে হয় 'রাড়ুলি' গ্রাম নাম শুনেছি, কিন্তু কোথায় তা ঠিক করতে পারছি না।

রাঢ়াপুরী বলতে যদি কৃষ্ণমিশ্র রাঢ়দেশের শহর বা গ্রামের সাধারণ নাম বুঝিয়ে থাকেন—অর্থাৎ 'রাঢ়া' দেশের 'পুরী' (সহর-গ্রাম) তাহলে ভূরিশ্রেষ্ঠিক নগর-গ্রামের নাম বলতে পারি। কিন্তু তা সঙ্গত মনে হচ্ছে না।

তবে এটা হয়ত ঠিক যে গৌড়রাজ্যের খাঁটি বিবরণ কৃষ্ণমিশ্রের জানা ছিল না। তিনি 'রাঢ়াপুরী' জানতেন, ভূরিশ্রেষ্ঠক নামও জানতেন। কিন্তু কোথায় কী তা ভালো করে জানতেন না। তাই এই গোলমাল।

শ্রীধর নিজের সহর-গ্রামের নাম করেছেন, বলেছেন

ভূরিসৃষ্টির ইতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ॥

অর্থাৎ বহু ধনী বণিকের আশ্রয় ভূরিসৃষ্টি (অর্থাৎ—প্রচুর শস্যশালী) গ্রাম। এখানে—অর্থাৎ দামোদর-সরস্বতীর প্রাচীন খাতের ধারে ধারে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়তগুলি ছিল। সেই কারণে এখানে ছিল শ্রেষ্ঠীদের বসতি। সপ্তগ্রাম-হুগলি-চুঁচুড়ায় বণিকদের (সোনার বেনেদের) বাস সেদিন পর্যন্ত চলে এসেছিল।

২১.১.৮০

বাংলা সাহিত্যতত্ত্ব

জগদীশ ভট্টাচার্য

কবিমানস*

১

সাহিত্য একটি শিল্প বা চারুকলা। 'একটি' বলায় তাৎপর্য হল সব শিল্প বা চারু-কলাই সাহিত্য নয়। সাহিত্য সেই শিল্প বা চারুকলা যার বাহন ভাষা। অর্থাৎ ভাষাবাহন শিল্পই সাহিত্য। বলাই বাহুল্য, বাংলায় 'শিল্প' শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'ইনডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন'-এর বাংলা করা হয়েছে শিল্পবিপ্লব। আবার অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা বা সাহিত্যকলাকে বলা হয় অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প বা অবনীন্দ্রনাথের বাণীশিল্প। আমরা এই আলোচনায় চারুকলা বা আর্ট অর্থেই শিল্প শব্দের ব্যবহার করব।

শিল্পবিচারে তিনটি জিজ্ঞাসা মুখ্য: কে, কি এবং কেন। প্রথম, কে শিল্পস্রষ্টা, তাঁর স্বরূপলক্ষণ কি, কোন্ গুণে তাঁকে শিল্পী বলব। দ্বিতীয়, শিল্প কি, অর্থাৎ শিল্পের উপকরণ, প্রকরণ ও কলাবিধি—এক কথায় শিল্পকৃতি কি বস্তু। তৃতীয়, শিল্পসৃষ্টি করা হয় কেন, তার লক্ষ্য কি, যদি রসিকসমাজই শিল্পের লক্ষ্য হয় তাহলে কাকে শিল্পরসিক বলব, আবার শিল্পের ভালমন্দ বিচার করবেন যিনি, রসিকসমাজের মধ্যে তাঁর গুণ বা বৈশিষ্ট্যই বা কি। শিল্পজিজ্ঞাসার এই কে, কি এবং কেন—এই তিনটি জিজ্ঞাসাকে আমরা তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছি: কবিমানস, শিল্পকৃতি এবং রসিকসমাজ।

ভাষাবাহন শিল্পের স্রষ্টা হলেন বাক্‌শিল্পী কবি। কবির সৃষ্ট শিল্প বলেই বাক্‌শিল্পের নাম কাব্য। সংস্কৃতে 'কাব্যে'র যে অর্থ ছিল বাংলায় তা সংকুচিত হয়েছে। বাংলায় বাক্‌শিল্পী মাত্রেই কবি নন। কথাশিল্পী, নাট্যশিল্পীরাও বাক্‌শিল্পী। কিন্তু বাংলায় তাঁদের কবি বলা হয় না। বাংলায় বাণীশিল্পীর সাধারণ নাম সাহিত্যিক। সংস্কৃতে যা কাব্য তাই সাহিত্য। তবে কাব্য অর্থে সাহিত্য শব্দের ব্যবহার ঈষৎ অর্বাচীন। কিন্তু মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশ' আর বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ' সমার্থক সাহিত্যশাস্ত্র।

সাহিত্যের ব্যুৎপত্তি সহিতত্ব থেকে। শব্দার্থের সহিতত্বই সাহিত্য। কিন্তু মানুষের ভাষায় শব্দ এবং অর্থ নিত্যসম্পৃক্ত। কাজেই শব্দার্থের সহিতত্বমাত্রই সাহিত্য

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত 'রামলাল হালদার ও হরিপ্রিয়াদেবী স্মৃতিবক্তৃতা-মালা'র প্রথম বক্তৃতা।

নয়। এই সহিতত্ব যখন সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আনন্দনিস্যন্দী হয় তখনই তা হয় সাহিত্য। শব্দার্থের সহিতত্বে যিনি সৌন্দর্য ও আনন্দের সৃষ্টি করেন তিনিই সাহিত্যিক, তিনিই কবি। এই অর্থে রসসাহিত্যের স্রষ্টামাত্রকেই সম্প্রসারিত অর্থে বলা যেতে পারে কবি।

কবিমানস শব্দটি সংস্কৃতে ছিল না। 'পোয়েটিক মাইণ্ড' অর্থে এই যোগরূঢ় শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। বাচ্যার্থে কবিমানস হল কাব্যস্রষ্টা কবির মন। কিন্তু কবি এখানে শুধু কাব্যস্রষ্টাই নন, যে অর্থে সাহিত্যিকমাত্রই কবি সেই অর্থেই এখানে শব্দটি ব্যবহৃত, এবং মানস শব্দের যোগে যে রূঢ়ী অর্থের উদ্ভব হয়েছে এক কথায় তা হল বাক্‌শিল্পীর মানসধর্ম।

২

এই কবিমানস-রহস্য জানার কি কোনো উপায় আছে? সংস্কৃত আলংকারিকগণ বলেছেন, অপার কাব্যসংসারে কবিই একমাত্র প্রজাপতি বা সৃষ্টিকর্তা; তাঁর রুচি অনুসারেই তাঁর কাব্যসংসার সৃষ্ট হয়ে থাকে। এও বলা হয়েছে, কবির সৃষ্টি নিয়তি-কৃতনিয়মরহিত, অনন্যপরতন্ত্র। যদি তাই হয়ে থাকে তবে সেই অপার রহস্যলোকে অনুপ্রবেশের একমাত্র উপায় হল সৃষ্টি থেকে স্রষ্টাকে জানা। কাব্যজিজ্ঞাসার যে ত্রিতত্ত্বের কথা আমরা বলেছি তার একদিকে আছেন কবি, অন্যদিকে রসিক, মাঝখানে আছে কাব্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র। বক্তব্যকে একটু শোধন করে কবি পুনশ্চ বললেন, বস্তুত বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করছে, যে সংগীত ধ্বনিত করে তুলছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের মতে, মন প্রকৃতির আরশি নয়, সাহিত্যও প্রকৃতির আরশি নয়। মন প্রাকৃতিক জিনিসকে মানসিক করে নেয়—সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করে তোলে। মনের আবার দুটি রূপ আছে, ব্যক্তিমন আর বিশ্বমন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রথমটি হল কবির নিজত্ব, আর দ্বিতীয়টি তাঁর মানবত্ব। তিনি বললেন জগতের উপর মনের কারখানা বসেছে, এবং মনের উপর বিশ্বমনের কারখানা,—সেই উপরের তলা থেকেই সাহিত্যের উৎপত্তি। অর্থাৎ, জগতের অন্তর্লোক এবং বহির্লোক নিয়েই কবির কারবার। সেই অন্তর্লোক ও বহির্লোককে কবি প্রথম গ্রহণ করেন তাঁর ব্যক্তিমন দিয়ে, কিন্তু ব্যক্তিমনের সেই মানসিক বস্তু সাহিত্য নয়। জগৎকে ব্যক্তিগত ভাবে না দেখে বিশ্বগত ভাবে দেখতে পারলে তবেই কবির মানসিক উপাদান সাহিত্যিক উপকরণে পরিণত হয়। সাহিত্যসৃষ্টির এটিই মূল রহস্য।

রসিকের পথ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর সম্মুখে বিশ্বলোক নেই, আছে কবিসৃষ্ট সাহিত্যলোক। এই সাহিত্যলোকে অনুপ্রবেশ করেই রসিক বিশ্বভুবনের অন্তর্লোক ও বহির্লোকের আনন্দঘন রহস্যে অবগাহন করেন। চিত্রের সাহায্যে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা যেতে পারে।
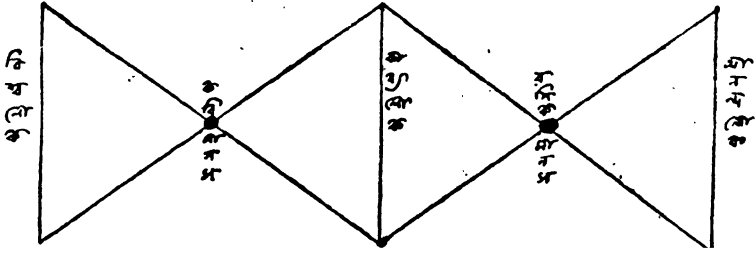
এই রেখাচিত্রে প্রথমে আমরা পাচ্ছি বিশ্বলোককে। এই বিশ্বলোকের মধ্যে আছে (১) মানবলোক—মানুষের জীবন, মানুষের চরিত্র, মানুষের ভাব ও ভাবনা। আর আছে (২) নিসর্গলোক এবং (৩) দেবলোক। এক কথায় তাকে বলা যেতে পারে বিশ্বসত্য। এই বিশ্বসত্য কবিমানসে এসে হয়ে উঠছে মানসসত্য। তাতে রাসায়নিক মিশ্রণে রয়েছে বিশ্বসত্য এবং কবিমানসের অনুভূতি। সেই অনুভূতি কবিমানসের অনন্যপরতন্ত্র ধর্মের ফলে কবিতে কবিতে পৃথক হওয়াই স্বাভাবিক। রেখাচিত্রের মধ্যভাগে আমরা পাচ্ছি কাব্যলোক। তাতে আছে বিশ্বসত্য, কবিমানসের অনুভূতি এবং বাক্‌শিল্পের সৌন্দর্য, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যা মুখ্যত চিত্র ও সংগীত। এই বিশ্বসত্য, কবিমানসের উপলব্ধি এবং বাক্‌শিল্পের সৌন্দর্য একত্র মিলিত হয়ে আস্বাদ্যমান হচ্ছে রসিকমানসে। অর্থাৎ রসিকচিত্ত সাহিত্যে, বিশ্বলোককে সরাসরি পাচ্ছে না, পাচ্ছে কাব্যলোককে। রসিকচিত্তে এই কাব্যলোকের প্রতিবেদনের ফলেই জন্ম হচ্ছে আনন্দলোকের। রসিকচিত্তের এই আনন্দই কাব্যসাহিত্যের ফলশ্রুতি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বিশ্বসত্য, কবিমানসের উপলব্ধি এবং বাক্‌শিল্পের সৌন্দর্য—এই তিনটি উপকরণের মিশ্রণেই কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টি। এই তিনটি উপকরণ রাসায়নিক সমবায়ে যে অপূর্ব কাব্যলোক রচনা করছে তা যখন রসিকচিত্তে আস্বাদ্যমান হয় তখন উপকরণগুলি পৃথক পৃথক ভাবে বিদ্যমান থাকে না। তাই রসিকের আস্বাদন সামগ্রিক ও সংশ্লেষাত্মক। কিন্তু সাহিত্যসমালোচক যখন সাহিত্যের বিচার করেন তখন তাঁকে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতেই অগ্রসর হতে হয়। এবং সমালোচকের রুচি ও মনঃপ্রকর্ষ অনুসারে কেউ বিশ্বসত্যকে, কেউ কবিমানসের অনুভূতিকে, আবার কেউ শিল্পসৌন্দর্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। যাঁরা কবিমানসের অনুভূতিকে প্রাধান্য দেন স্বভাবতই তাঁরা কবিমানস-রহস্যের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হন।

উদাহরণ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই বলা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে

বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে ? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্তি—তাহা তো আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তিনি কি গুণে কি প্রকারে এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন তাহাই বলিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা, জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য প্রাঞ্জল হলেও একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যবিচার কবিমানসকেন্দ্রিক। অর্থাৎ কাব্যশিল্প থেকে কবিমানসের উপরই তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কবি (১) 'কি গুণে' এবং (২) 'কি প্রকারে' কীর্তিমান হয়েছেন সে-কথাই সমালোচককে বলতে হবে। তাকেই তিনি বলেছেন 'জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য'। এই উদ্দেশ্য সাধনের পথও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে কবিতা কবিমানসের দর্পণমাত্র। সেই দর্পণেই 'কবির অবিকল ছায়া আছে'। দর্পণের ভিতরকার সেই ছায়া দেখেই কবিকে চিনতে হবে। অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সৃষ্টি থেকেই স্রষ্টাকে জানা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। এই সাহিত্যতত্ত্বকে সৃষ্টি-স্রষ্টা-বাদ বলা যেতে পারে। সৃষ্টিই স্রষ্টার অভিজ্ঞান। দীনবন্ধু মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাহিত্য-সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র এই তত্ত্বকেই আশ্রয় করেছেন। অর্থাৎ শিল্পের উপকরণ, প্রকরণ ও কলাবিধিকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। বলেছেন, 'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।' তাই শিল্পজিজ্ঞাসার কে কি ও কেন—এই তিনের মধ্যে তিনি কবিমানসের স্বরূপসন্ধানকেই সাহিত্যসমালোচনায় অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এবং বলেছেন সেই স্বরূপের সন্ধান করতে হবে তার শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়েই।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাহিত্যসমালোচনায় প্রথমে তাঁদের জীবনীও আলোচনা করেছেন। যদি সৃষ্টির মধ্য দিয়েই স্রষ্টাকে জানতে পারা যায় তাহলে পৃথকভাবে স্রষ্টার ব্যক্তিজীবনের কথা বলার প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন এই জন্য যে, ব্যক্তিজীবনের মধ্যে তিনি কবিমানসের বিশিষ্ট লক্ষণগুলির উৎস সন্ধান করেছেন। এদিক দিয়ে বর্তমান শতাব্দীর বিশিষ্ট ইংরেজ কবি ও সমালোচক এলিঅটের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বাজাত্য লক্ষ্য করা যায়। সমালোচক হিসাবে এলিঅট শিল্পকৃতির উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁকে শিল্পকৃতিভিত্তিক অর্থাৎ 'ফর্ম্যালিস্টিক' সমালোচকগণের অগ্রণী বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু তিনিও ১৯৫৬ সালে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা 'দ্য ফ্রন্টিয়ার্স অব ক্রিটিসিজমে' বলেছেন, কবিদের জীবনচরিত লেখা উচিত নয় বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। তবে জীবনীকারের বাছাই

করার ক্ষমতা থাকা চাই, উপরন্তু তিনি হবেন সুরুচির অধিকারী এবং সুবিচারক। তিনি যে-লেখকের জীবনী-রচনায় প্রবৃত্ত হবেন তাঁর রচনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা থাকা চাই। শুধু তা-ই নয়, এলিঅট এ কথাও বলেছেন, যে-সমালোচক কোনো লেখকের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে আগ্রহী হবেন তাঁর কাছে প্রত্যাশা থাকবে যে, তিনি লেখকের জীবন সম্পর্কেও অল্পবিস্তর অবহিত থাকবেন।

বলাই বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র এসব গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহের যে-দুটি ভূমিকা লিখেছেন সে দুটিকে দুভাগে ভাগ করেছেন,—জীবনী ও কবিত্ব। জীবনী-অংশ সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুনির্বাচিত। কবিত্ব-অংশে শিল্পকৃতির আলোচনার চেয়ে কবিমানসের বিশ্লেষণই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। জীবনী আলোচনা কবিমানসের পরিচিতিলাভের সার্থক ভূমিকার কাজ করেছে। দীনবন্ধুর জীবনী আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "দীনবন্ধু নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ চরিত্রের মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তজ্জনিত শিক্ষার গুণে তিনি নানাবিধ রহস্যজনক চরিত্রসৃজনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত নাটক-সকলে যেরূপ চরিত্র-বৈচিত্র্য আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।" পুনশ্চ তিনি বলেছেন, "দীনবন্ধুর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকৃত-ঘটনা-মূলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাঁহার প্রণিত চরিত্রে অনুকৃত হইয়াছে।" কবিত্ব-অংশের আলোচনায় দীনবন্ধুর ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তাঁর বহুদর্শিতার দ্বারা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি যে-বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে সেই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই, অমনি তুলি ধরিয়া লেজ শুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "ঈশ্বরচন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল যে, তিনি খাঁটি জিনিস বড় ভাল বাসিতেন, মেকির বড় শত্রু।" "ঈশ্বর চন্দ্রের বয়ঃক্রম যৎকালে ১০ বর্ষ, সেই সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। স্ত্রীবিয়োগের কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন।... ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের উপযোগী বটে।...বিমাতার আগমনে কবির সঙ্গে মেকির প্রথম সম্মুখ সাক্ষাৎ। খাঁটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে একটা মেকি মা আসিয়া দাঁড়াইল। মেকির শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের আর সহ্য হইল না, এক গাছা রুল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। কবিপ্রযুক্ত রুল সৌভাগ্যক্রমে, বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল—বিমাতা ত্যাগ করিয়া একটা কলাগাছে বিঁধিয়া গেল।

"অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া কিরাতপরাজিত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু বরদানার্থ পিনাকহস্তে পশুপতি না

আসিয়া, প্রহারার্থ জুতা হস্তে জ্যেঠা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। জ্যেঠা মহাশয় দ্বার ভাঙ্গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে পাদুকা প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন।

"কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই।"

ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের এই ঘটনা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে যে-ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র একটি অবিস্মরণীয় বাক্য রচনা করেছেন—"জ্যেঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন।"

এলিঅট যে বলেছিলেন, কবির জীবনীকার হবেন 'সুরুচির অধিকারী এবং সুবিচারক', তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে পাওয়া যাবে। সাহিত্যতত্ত্ববিচারে রবীন্দ্রনাথকে বলা যেতে পারে 'নব-মানবতাবাদী', 'নিও-হিউম্যানিস্ট'। তিনি কিন্তু সাহিত্যবিচারে কবির ব্যক্তিজীবনের আলোচনা সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। টেনিসনের পুত্র তাঁর পরলোকগত পিতার চিঠিপত্র ও জীবনী বৃহৎ দুখণ্ড পুস্তকে প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৩০৮ সালের আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে 'কবিজীবনী' প্রবন্ধে তার সমালোচনা করে বলেছেন, "ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে। কবি কবিতা যেমন করিয়া করিয়াছেন, জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই। তাঁহার জীবন কাব্য নহে। প্রতিদিনের কথাবার্তা চিঠিপত্র দেখাসাক্ষাৎ কাজকর্ম শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে কবিত্বের মূল নাই।"

এই প্রবন্ধ লেখার এক মাস আগে, অর্থাৎ বঙ্গদর্শনের ১৩০৮ সালেরই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়, রবীন্দ্রনাথ 'কবিচরিত' বলে একটি কবিতা লেখেন। তার উপসংহারে তিনি বলেছেন,

মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি নিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

বলাই বাহুল্য, এখানে রবীন্দ্রনাথ কবির জীবনচরিত এবং কবিজীবন-চরিতের মধ্যে যে-পার্থক্য আছে তা-ই দেখাতে চেয়েছেন। কবিতাটির আরম্ভ হয়েছে, 'বাহির হইতে দেখো না এমন করে, / আমায় দেখো না বাহিরে।' এই দেখার ফলেই কবির জীবনচরিত হয়। কিন্তু কবি-জীবনচরিতের সন্ধান করতে হবে কবির নিজত্বে নয়, তাঁর মানবত্বে। বহির্লোকে নয়, অন্তর্লোকে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন,

যে আমি স্বপন মুরতি, গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে।

এ কথা সত্য যে কবির ব্যক্তিজীবন আর তাঁর কবিজীবন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই

অভিন্ন হয় না। বাংলা সাহিত্যে 'মাইকেল এম. এস. ডাট' আর 'কবি শ্রীমধুসূদন' স্বভাবধর্মে পৃথকসত্ত পুরুষ। মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের বিশ্লেষণ করলে তাঁর কবি-মানসের সন্ধান পাওয়া যাবে না। কিন্তু একথাও সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। রবীন্দ্রনাথই বলেছেন, "প্রকৃত সাহিত্যকারের অন্তঃকরণে যদি তাহার নিজত্ব ও মানবত্বের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে, তবে তাহা কল্পনার কাচের শার্সির স্বচ্ছ ব্যবধান। তাহার মধ্য দিয়া পরস্পরের চেনা-পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটে না।"

তাছাড়া যখন কবির নিজত্ব ও মানবত্বের মধ্যে ব্যবধান ঘুচে যায় তখন কবির জীবনচরিতই কবিজীবনচরিত হয়ে ওঠে। টেনিসনের জীবনচরিতের আলোচনা প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্মে, উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন—কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত এক করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে। দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়কে একত্রে পাঠ করিলে, জীবন এবং কাব্যের মর্যাদা বেশি করিয়া দেখা দেয়।"

রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পৌঁছে,—অর্থাৎ বঙ্গদর্শনের 'কবিচরিত' কবিতা এবং 'কবিজীবনী' প্রবন্ধ রচনার দশ বৎসর পরে, ১৩১৮ সালে আত্মজীবনী ['জীবনস্মৃতি'] রচনা করতে বসলেন তখন তাঁর মনে এই প্রশ্ন পুনরায় দেখা দিয়েছে। 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে তিনি বলছেন, "কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও-দুটা একই বৃহৎ রচনার অঙ্গ।" পুনশ্চ, "কবির জীবন যেমন কাব্যকে প্রকাশ করে কাব্যও তেমনি কবির জীবনকে রচনা করিয়া চলে।"

কাজেই কবিমানসের বিচারে অন্তরঙ্গ-দৃষ্টিতে দেখা কবিজীবনীর প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কবিরা স্বভাবধর্মে শৈব। জীবনসিন্ধু-মথিত হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে তাঁরা মানবসমাজে কাব্যের অমৃত পরিবেশন করেন। 'চৈতালি' কাব্যসংকলনে 'কাব্য' শীর্ষক কবিতায় কবি কালিদাসের উদ্দেশে বলেছেন,

> তবু কি ছিল না তব সুখ-দুঃখ যত
> আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মতো
> হে অমর কবি। ছিল না কি অনুক্ষণ
> রাজসভা ষড়চক্র, আঘাত গোপন।
> কখনো কি সহ নাই অপমানভার,
> অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
> অভাব কঠোর ক্রূর,—নিদ্রাহীন রাতি
> কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি।

তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য-কমল
আনন্দের সূর্যপানে ; তার কোনো ঠাঁই
দুঃখ-দৈন্য-দুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থন বিষ নিজে করি পান,
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

এ-কবিতা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, কবির জীবনমন্থনবিষই কবিমানসের রাসায়নিক শিল্পশালায় কাব্যের অমৃতে রূপান্তরিত হয়।

কবিমানসের স্বরূপ সন্ধানে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি উক্তির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "সাহিত্য বিচারের সময় দুটি জিনিস দেখিতে হয়, প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি, দ্বিতীয়, তা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।" এই উক্তির প্রথমাংশ হচ্ছে কবিমানসের সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি, তারই মাপকাঠিতে কবিমানসের মূল্যায়ন করতে হবে। এই সঙ্গে কবির আরেকটি সিদ্ধান্তও স্মরণ করা যেতে পারে।—"সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।" শেষোক্ত উক্তির 'প্রধান' কথাটি লক্ষ্য করার মতো। সাহিত্যের অবলম্বন প্রধানত ভাবের বিষয়, কিন্তু প্রধানত বলায় জ্ঞানের বিষয়ও যে সাহিত্যের অবলম্বন হতে পারে, এ কথা পরোক্ষে স্বীকৃত হল। কিন্তু প্রথম উক্তিতে কবি বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের জ্ঞানের অধিকারের কথা বলেন নি, বলেছেন 'হৃদয়ের অধিকারের' কথা। অর্থাৎ হৃদয়বান ব্যক্তিত্বই কবিব্যক্তিত্ব। মনস্তত্ত্বশাস্ত্রে মানুষের মনোজগৎকে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। চিন্তন, অনুভবন এবং ঈপ্সন। এই অনুভবনই হল হৃদয়ধর্ম। চিন্তন এবং ঈপ্সন কবির অনুভবনের রসে জারিত হয়েই 'ভাবের বিষয়' হয়ে ওঠে। যদি তাই হয় তাহলে কবিপ্রতিভাকে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা বলা কতদূর সমীচীন তা বিবেচনার যোগ্য। সংস্কৃতে প্রতিভার মুখ্যত দুটি সংজ্ঞা আছে, 'অঘটনঘটনপটীয়সী বুদ্ধি', আর 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'। বলাই বাহুল্য, যে-বুদ্ধি 'অঘটনঘটনপটীয়সী' এবং যে-প্রজ্ঞা 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা' সেই বুদ্ধি ও সেই প্রজ্ঞাকেই প্রতিভা বলা হয়েছে। এখানে 'প্রতিভা' যে-কোনো বিষয়েরই প্রতিভা হতে পারে। কিন্তু কাব্যসৃষ্টির প্রতিভাকে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা বলা সমীচীন হবে কিনা তা বিচারের অপেক্ষা রাখে। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃতের কয়েকটি শব্দের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। স্মৃতি, মতি, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও প্রতিভা। স্মৃতির সাহায্যে

আমরা অতীতকে জানি। মতির সাহায্যে ভবিষ্যৎকে, আর বুদ্ধির সাহায্যে বর্তমানকে। এই তিনটিকেই বলা হয়েছে লৌকিক জ্ঞানবৃত্তি। এই জ্ঞানবৃত্তির উপরের স্তরে আছে প্রজ্ঞা ও প্রতিভা। প্রজ্ঞা ত্রিকালপ্রসারিণী নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞানবৃত্তি। তা তত্ত্ববিৎ বা শাস্ত্রীয় মনীষার মৌল ধর্ম। প্রতিভাও ত্রিকালপ্রসারিণী, কিন্তু তার স্বরূপ-লক্ষণ হল নবনব-উন্মেষশালিতা। বুদ্ধি যদি লৌকিক জ্ঞানবৃত্তি হয় তাহলে অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত করেও তাকে কবিপ্রতিভা বলা যাবে না। তেমনি প্রজ্ঞা যদি ত্রিকালপ্রসারিণী নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞানবৃত্তি হয় তাহলে তাকে দর্শন বা বিজ্ঞানের প্রতিভা বলাই সমীচীন হবে। অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা হলেও জ্ঞানবৃত্তির দ্বারা কবিপ্রতিভার স্বরূপ নির্ণয় করা যাবে না। কবিপ্রতিভার মৌল কৃত্য হল আনন্দনিস্যন্দী বাগর্থসম্পৃক্তির দ্বারা জীবনের শিল্পরূপায়ণ। তাই কবিপ্রতিভাকে বলা যেতে পারে জীবনঘনিষ্ঠ অপূর্বসুন্দর বাণীসৃজনী-শক্তি।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম-পরিভাষিত ত্রিবিধ মানসবৃত্তির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের মানসবৃত্তিনিচয়কে তিন ভাগে বিন্যস্ত করেছেন,—জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, কার্যকারিণী বৃত্তি, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। কবিমানস জ্ঞানার্জনী বৃত্তিতে নয়, কার্যকারিণী বৃত্তিতেও নয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিতেই অনুরঞ্জিত। চিত্তরঞ্জকতা হৃদয়ধর্ম। কাজেই বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকারের মাপকাঠিতেই কবিপ্রতিভা বিচার্য। বুদ্ধির দ্বারাও নয়, প্রজ্ঞার দ্বারাও নয়।

আধুনিক বাংলা কাব্যের আদিমহাকবি মধুসূদন কবিপ্রতিভা সম্পর্কে একটি অপূর্ব সনেট রচনা করেছেন। প্রথমে কবিতাটি উদ্ধার করছি, তারপর এর অঙ্গসন্ধিগুলির বিশ্লেষণ করব।—

কে কবি—কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।

আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা বলে;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে;

মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে !

এই সনেটের প্রথম চতুষ্ক একটি নঙর্থক জিজ্ঞাসা দিয়ে শুরু। শব্দের সঙ্গে শব্দের মেলবন্ধনের ঘটক যিনি তিনিই কি মৃত্যুঞ্জয় কবি? এ জিজ্ঞাসার দুটি হেতু কল্পনা করা যেতে পারে। প্রথম, শব্দের সঙ্গে শব্দের ঘটকালিতেই যাঁর শিল্পকৃতি নিঃশেষিত, সেই বাক্‌চাতুরিসর্বস্ব শব্দকবিকে মধুসূদন কবি বলে স্বীকার করছেন না। ঘটকালিতে যে প্রযত্নের ইঙ্গিত আছে তা ভাবের সঙ্গে ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত অপৃথক্‌যত্ননির্বর্তন বলে তিনি মনে করেন না। দ্বিতীয়, ভারতচন্দ্রের পর থেকে, বাংলা কাব্যলোকে যে-কবিওয়ালাদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল তাঁদের শব্দালংকারবহুল কুকাব্যের কথাও তাঁর মনে উদিত হয়ে থাকতে পারে।

অষ্টকবন্ধের দ্বিতীয় চতুষ্কে আছে প্রকৃত কবির কথা। 'কল্পনা সুন্দরী / যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন,/অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি / ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ' অর্থাৎ কবিপ্রতিভায় মধুসূদন কল্পনাকেই মুখ্য স্থান দিয়েছেন। মেঘনাদ-বধ মহাকাব্যের প্রথমেই তিনি শ্বেতভুজা ভারতীর বন্দনার পরেই কল্পনাদেবীর বন্দনা করেছেন—

—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

এখানে কল্পনার বিশেষণ 'মধুকরী'। কবির চিত্তফুলবন-মধু নিয়ে তিনি এমন মধুচক্র রচনা করবেন যা থেকে গৌড়জন নিরবধি সুধা পান করবে। 'কবি' শব্দ এখানে দুভাবে ধরা যেতে পারে, উত্তমপুরুষ একবচন অথবা প্রথমপুরুষ বহুবচন। ব্যুৎপত্তি বিষয়ে আলোচনায় এই প্রসঙ্গে পুনরায় দৃষ্টিনিবদ্ধ করার সুযোগ হবে। কল্পনাকে অন্যত্র বলা হয়েছে, বাগ্‌দেবীর প্রিয়সখী। আলোচ্য সনেটে বাগ্‌দেবী নেই, আছেন কল্পনাসুন্দরী, তিনিই কবির মনঃকমলেতে আসন পেতেছেন। তারই ফলে কবির ভাবের সংসার অস্তগামিভানুপ্রভা-সদৃশ সুবর্ণ কিরণে সমুদ্ভাসিত হয়েছে। মধুসূদনের হয়তো অজানা ছিল না, মর্ত্যলোকের বৈভব সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমের মতো ক্ষণস্থায়ী! সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমনিভা বিভবা ভবেঽস্মিন্। কিন্তু কবির কল্পনাসমৃদ্ধ ভাবের সংসারে ভানুপ্রভাবসদৃশ সুবর্ণ কিরণ চিরস্থায়ী। মধুসূদনের এই অপূর্ব বাগ্‌বৈদগ্ধ্য তাঁর উত্তরসূরি রবীন্দ্রনাথকেও বিমুগ্ধ করেছিল। বিহারীলালের কাব্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মতো 'সারদামঙ্গলে'র সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়।"

কবিতার অষ্টকবন্ধ সমাপ্ত হয়েছে কবিপ্রতিভায় কল্পনার গুরুত্ব নিরূপণ করে। বাংলা সাহিত্যতত্ত্বে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার বদলে মধুসূদনই প্রথম কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এখানে ক্লাসিক ও রোমান্টিক সাহিত্যধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লাভ নেই। মধুসূদন ক্লাসিক সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হয়েও কবিধর্মে রোমান্টিক। তাছাড়া সাহিত্যে ক্লাসিক ও রোমান্টিক লক্ষণের বিভাজন তত্ত্বদর্শীর কাছে যতই উপাদেয় হোক্, সাহিত্যরসিকদের কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কবিতার ষট্‌কবন্ধে মধুসূদনের কবিদৃষ্টি ত্রিলোকপ্লাবী। প্রথমে মানবলোক,—'আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ যার আজ্ঞা মানে'; দ্বিতীয়ে নিসর্গলোক—'অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা বলে'; তৃতীয়ে দেবলোক—'নন্দন কানন হতে যে সুজন আনে পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে';—এই তিনটি ক্ষেত্রেই কবিকল্পনা শুধু ত্রিলোকপ্লাবীই নয়, কবিই স্রষ্টা প্রজাপতি। তাঁর আজ্ঞাবলেই মানুষের ভাবগুলি কাব্যে আবির্ভূত হয়। তাঁর ইচ্ছাতেই অরণ্যে কুসুম প্রস্ফুটিত হয়। এবং তিনিই নন্দন-কানন থেকে পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমল মর্ত্যালোকে আনয়ন করেন। শেষ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার কবিতাটির কথা মনে পড়বে :

> অতি দুর্গম সৃষ্টিশিখরে
> অসীমকালের মহাকন্দরে
> সতত বিশ্বনির্ঝর ঝরে
> ঝরঝর সংগীতে
> স্বরতরঙ্গ যত গ্রহতারা
> ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা,
> সেথা হতে টানি লব গীতধারা
> ছোট এই বাঁশরীতে।

মধুসূদন নন্দন-কাননের পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমল দিয়ে মর্ত্যজীবনকে সুরভিত করতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন তাঁর ছোট বাঁশরীতে বিশ্বসংগীতের গীতধারা টেনে আনতে।

মধুসূদনের কবিতাটির শেষ দুটি পংক্তিতে কবিকৃতি সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি চরমে উপনীত হয়েছে। 'মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে / বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে।' মরুভূমিতে তৃষার্ত পথিকের রূপকল্প মধুসূদনের কাব্যে বারবার এসেছে। 'আত্মবিলাপ' কবিতায় তিনি আক্ষেপের সুরে বলেছেন, 'মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে ;—'। অশোকবনে বন্দিনী সীতা বিভীষণপত্নী সরমাকে বলেছেন, 'মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি, / রক্ষোবধূ।' আমাদের প্রাচীনেরা বলেছেন, সংসারবিষবৃক্ষের দুটি অমৃতফল আছে—সজ্জনসংগম আর কাব্যামৃত-রসাস্বাদ। মধুসূদনের রূপকল্পে মানব-

জীবন মরুভূমিতে তৃষাক্লিষ্ট পথিকের উপমানে উপমিত। কাব্য সেখানে তার তৃষ্ণার পানীয়। এই রূপকল্প জীবনঘনতায় অনেক সার্থক ও সুন্দর।

বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যতত্ত্বের প্রথম সংহিতাকার রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কবি-প্রতিভার তিনটি উপাদান—বিস্ময়, প্রেম, কল্পনা। 'সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'সাহিত্যের তাৎপর্য'। তাতে তিনি বলছেন,

"এমন সৌভাগ্যবান লোকও আছেন, যাঁহাদের বিস্ময়, প্রেম এবং কল্পনা সর্বত্র সজাগ—প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ; লোকালয়ের নানা আন্দোলন তাঁহাদের চিত্তবীণাকে নানা রাগিণীতে স্পন্দিত করিয়া রাখে।

"বাহিরের বিশ্ব ইঁহাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে, নানা রঙে, নানা ছাঁচে নানারকম করিয়া তৈরি হইয়া উঠিতেছে।

"ভাবুকের মনের এই জগৎটি বাহিরের জগতের চেয়ে মানুষের বেশি আপনার। তাহা হৃদয়ের সাহায্যে মানুষের হৃদয়ের পক্ষে বেশি সুগম হইয়া উঠে। তাহা আমাদের চিত্তের প্রভাবে যে বিশেষত্ব লাভ করে, তাহাই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপাদেয়।"

রবীন্দ্রভাবিত বিস্ময় প্রেম ও কল্পনার বিশ্লেষণে আমরা পরে আসছি। উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে কয়েকটি তত্ত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মতে "সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।" তাই তিনি এখানে 'ভাবুক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বলাই বাহুল্য ভাবুকের ভাবয়িত্রী প্রতিভার সঙ্গে কারয়িত্রী প্রতিভার যোগেই কাব্যের সৃষ্টি। কেননা, রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রকাশই কবিত্ব। দ্বিতীয়, তিনি মনে করেন, কবিপ্রতিভা স্থানকালনিরপেক্ষ স্বয়ম্ভু নয়। কবিও সমাজের একজন, তিনিও সামাজিক। তাই প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাঁর নিমন্ত্রণ, লোকালয়ের নানা আন্দোলন তাঁর চিত্তবীণাকে নানা রাগিণীতে স্পন্দিত করে রাখে। তৃতীয়, কবিসৃষ্ট কাব্যলোক বস্তুলোক থেকে মানুষের বেশি আপনার, বেশি উপাদেয়। কেননা, বাহিরের বিশ্ব কবির মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে, নানা রঙে, নানা ছাঁচে নানা রকম করে তৈরি হয়ে উঠছে এবং তা হৃদয়ের সাহায্যে মানুষের হৃদয়ের পক্ষে বেশি সুগম হয়ে ওঠে। তা আমাদের চিত্তের প্রভাবে যে বিশেষত্ব লাভ করে, তাই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপাদেয়।

কবিপ্রতিভার কী গুণে এমনটি সম্ভব হয় তার কথা বলতে গিয়েই তিনি 'বিস্ময়', 'প্রেম' ও 'কল্পনা'র কথা বলেছেন। বিস্ময় সংস্কৃত রসশাস্ত্রে অদ্ভুতরসের স্থায়িভাব। সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন, বিবিধ বস্তুতে যা লোকসীমাতিবর্তী বিস্তারচেতনা ঘটায় তারই নাম বিস্ময়। বিস্ময় চিত্তচমৎকার। ধর্মদত্তের একটি শ্লোক

উদ্ধৃত করে বিশ্বনাথ একথাও বলেছেন, রসের সার চমৎকার, তা সর্বত্রই অনুভূত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য চিত্তবিস্ফার অর্থেই বিস্ময়কে সীমায়িত করে রাখেন নি। সাধারণত অপরিমেয় রহস্যবোধ অর্থেই রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বে বিস্ময়ের পরিকল্পনা। তাঁর মতে, যে অনুভবে চিরপরিচয়ের মাঝে নবপরিচয়ের উন্মেষ ঘটে, তারই নাম বিস্ময়। জীবনস্মৃতিতে বাল্যে শ্রুত 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে' গানটির প্রেরণায় রচিত 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী' গানটির প্রসঙ্গে কবি বলছেন, "আমাদের জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে—কোন্ রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি—তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবী-রাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই—হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি।" এই উদ্ধৃতির 'রহস্যসিন্ধুর পরপারে'ই বিস্ময় কবিকে নিয়ে যায়। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের অনুসরণে বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের অঙ্গিরস অদ্ভুত, তার স্থায়িভাব বিস্ময়। 'বলাকা' শীর্ষক ৩৬ সংখ্যক কবিতায় বিশ্বভুবনে "বিস্ময়ের জাগরণে"র কথা কবি বলেছেন—

> হে হংস-বলাকা,
> ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
> রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
> বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
> ঐ পক্ষধ্বনি,
> শব্দময়ী অপ্সররমণী,
> গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।
> উঠিল শিহরি
> গিরিশ্রেণী তিমির মগন,
> শিহরিল দেওদার বন।

এই শিহরণ শুধু সারি-সারি দেওদার তরুতেই নয়, বিস্ময়াবিষ্ট কবিদৃষ্টি দেখল:

> পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
> তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
> মাটির বন্ধন ফেলি
> ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
> আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

দেখল,

> তৃণদল
> মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা;

মাটির আঁধার-নিচে কে জানে ঠিকানা
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

দেখল,

নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

শুধু নিসর্গবিশ্বেই নয়, মানববিশ্বেও অস্পষ্ট অতীত থেকে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে মানবের কত বাণী দলে দলে অলক্ষিত পথে উড়ে চলেছে। মানববিশ্বের এই উড়ে-চলা কবি আপন অন্তরেও অনুভব করলেন :

অসংখ্য পাখির সাথে
দিনেরাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।

বিশ্বভুবনের প্রতি এই বিস্ময়ভরা কবিদৃষ্টিই উজ্জ্বল হয়েছে কবি যখন দেখলেন 'একটি ধানের শিষের ওপরে / একটি শিশিরবিন্দু।'

বিস্ময়দৃষ্টিতে বিশ্বের সঙ্গে কবির একাত্মতার প্রথম সূত্রপাত। তার বিস্তার প্রেমে। প্রেম হল জীবন ও জগতের প্রতি অনুরাগ। প্রেমেই ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের মিলন। লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে পত্রালাপের একস্থলে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানবপ্রকৃতি আছে, এবং লেখকের বাহিরে সমাজে একটি মানবপ্রকৃতি আছে, অভিজ্ঞতাসূত্রে প্রীতিসূত্রে এবং নিগূঢ় ক্ষমতাবলে এই উভয়ের সম্মিলন হয়, এই সম্মিলনের ফলেই সাহিত্যে নূতন নূতন প্রজা জন্মগ্রহণ করে। সেই সকল প্রজার মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি দুই সম্বদ্ধ হয়ে আছে, নইলে কখনোই জীবন্ত সৃষ্টি হতে পারে না।" কবির অন্তরের মানবপ্রকৃতি এবং সমাজের মানবপ্রকৃতির যে সম্মিলন, যে সম্বন্ধবন্ধন তারই নাম প্রেম। 'সোনার তরী'র বিশ্বনৃত্য কবিতায় কবি বলেছেন,

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানবহৃদয়ে মিশিতে—
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবসনিশীথে।

নিখিলের সঙ্গে মহা রাজপথে দিবসনিশীথে চলার জন্যে মানবহৃদয়ের সঙ্গে কবি-হৃদয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষাকেই বলা যেতে পারে প্রেম। রবীন্দ্রনাথ কবিপ্রতিভাকে বলেছেন, 'বিশ্বমানবমন'। প্রেমের সূত্রেই নিখিলের সঙ্গে এক হয়ে কবির ব্যক্তিমন 'বিশ্বমানব-মনে' রূপান্তরিত হয়।

রবীন্দ্রনাথকথিত কবিপ্রতিভার তৃতীয় গুণ হল 'কল্পনা'। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে 'কল্পনা' শব্দ বিশেষ অর্থবহ। সাহিত্যের 'তাৎপর্য' বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে শক্তি হচ্ছে কল্পনাশক্তি। এই কল্পনাশক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ করে তোলে, যা কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মভাবোধ সম্ভবপর হয়।" প্রেমে হৃৎশক্তির লীলা, কল্পনায় চিৎশক্তির প্রাধান্য। প্রেমে বিশ্বসত্তায় ব্যক্তিসত্তার বিগলন ; কল্পনায় অনেকের মধ্যে একের অনুপ্রবেশ। এই শক্তিবলেই কবিশিল্পী আপামর সর্বসাধারণের অন্তরে অনুবিষ্ট হতে পারেন। কল্পনাই কবিকে বিচিত্র মানবচরিত্র এবং মানবজীবনের সত্যদৃষ্টির অধিকারী করে। তার দ্বারা শুধু মানবলোকই নয়, মানবেতর লোকও আপন স্বরূপে ধরা দেয়। রবীন্দ্রকাব্য থেকেই একটি উদাহরণ সংগ্রহ করা যাক। 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি বলছেন :

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর—
আপন প্রচণ্ডবলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে ; দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের পরে
বিদ্যুতের বেগে ; অনায়াস সে মহিমা,
হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা,
ইচ্ছা করে, একবার লভি তার স্বাদ।

এখানে কবির কল্পনাশক্তি অতর্কিত শিকারের উপর 'অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন অনল বজ্রের মতন' অটবীর হিংস্র ব্যাঘ্রের বিদ্যুতের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ার হিংসাতীব্র আনন্দকে মানস-প্রত্যক্ষ করেছে।

রবীন্দ্রকথিত বিস্ময় প্রেম ও কল্পনা— কবিপ্রতিভার এই গুণত্রয়ের তারতম্যের ভেদ অনুসারেই শিল্পলোকে রূপ ও গুণগত তারতম্যের উদ্ভব হয়। তিনটি গুণই কবিমানসে বিদ্যমান। কিন্তু কারো মধ্যে বিস্ময়, কারো মধ্যে প্রেম, আবার কারো মধ্যে কল্পনার উপাদান বেশি থাকে বলেই কবিতে কবিতে, তথা সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, কবিও সামাজিক মানুষ। দেশকালের প্রভাব তাঁরা কদাচিৎ এড়াতে পারেন। তবে তাঁরা একই সঙ্গে কালানুগ ও কালাতিগ। কালানুগ বলেই তাঁদের মধ্যে বস্তুঘনতা সমধিক প্রাধান্য পায়, আবার কালাতিগ বলেই তাঁরা সর্বকালীন সর্বজনীন বিশ্বমানবমনের অধিকারী। শুধু ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন কালে ভিন্ন

ভিন্ন সমাজব্যবস্থার ফলেই যে বাণীশিল্পস্রষ্টার স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয় এমনও নয়। একই কালে, একই দেশে, একই সমাজব্যবস্থায়ও সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্য কবিস্বভাবের জন্যই ঘটে থাকে। আবার এই পার্থক্যের হেতু কবিপ্রতিভায় বিস্ময় প্রেম ও কল্পনার মিশ্রণ কিভাবে কি পরিমাণে ঘটেছে তার মধ্যেও অনুসন্ধান করা যেতে পারে। আবার, কে কতটা কালানুগ ও কালাতিগ তার ভিত্তিতেও এই পার্থক্য গড়ে ওঠে। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের তিনজন দিক্‌পাল কথাসাহিত্যিকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা একই কালের, একই দেশের, প্রায় একই সমাজব্যবস্থায় উদ্ভূত শিল্পী। কিন্তু সাহিত্যরসিক মাত্রেই বলবেন, তাঁরা তিনজনই ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের অনন্যপরতন্ত্র কথাকোবিদ।

এখানে ব্যুৎপত্তির প্রসঙ্গও বড়ো হয়ে দেখা দেয়। এককালে আমাদের দেশে প্রশ্ন উঠেছিল কবিত্বের হেতু প্রতিভা না ব্যুৎপত্তি। সথ্যাগুরু সমালোচকের মতে প্রতিভাই কাব্যরচনার মূল কারণ। অন্যদিকে কেউ কেউ বলেছিলেন, কাব্যরচনার আদি ও মুখ্যকারণ কবিত্বশক্তি। প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তি এই শক্তিকে পুষ্ট করে। তৃতীয় দলের মতে কবিত্বশক্তিরই অন্য নাম কবিপ্রতিভা।

শক্তিই বলি আর প্রতিভাই বলি, ব্যুৎপত্তির দ্বারা যে তা পরিস্ফুট হয় একথা অবশ্যস্বীকার্য। ব্যুৎপত্তির দুটি দিক—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, এবং বহুশ্রুতি। পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের তাৎপর্য' থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে কবি বলেছেন, প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাঁদের নিমন্ত্রণ। লোকালয়ের নানা আন্দোলন তাঁদের চিত্ত-বীণাকে নানা রাগিণীতে স্পন্দিত করে তোলে। অর্থাৎ, যে-দেশকালে কবি বাস করেন, যে-বিশেষ মানবগোষ্ঠীতে তাঁর জন্ম, তা থেকে তিনি দূরে সরে থাকতে পারেন না। কেননা দেশ-কাল-সমাজের তিনিও একজন। আবার দেশকালের ঐতিহ্য যেমন আছে তেমনি আছে সমকালীন পালাবদলের অসংখ্য ও বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সমস্যা, চিন্তা-ভাবনা।

অতীত ঐতিহ্য যে কবিমানসের গড়নে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল হয় তার কথা বিশ্বমনা বাক্‌পতিও স্বীকার করেছেন—

তব সঙ্কার শুনেছি আমার
মর্মের মাঝখানে।

•

তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া

পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।

সমকালীন জীবনজিজ্ঞাসাও কবিমানসে প্রতিস্পন্দিত হয়। তাছাড়া মানবজীবন ও মানবচরিত্র সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা জীবনঘন শিল্পসৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য। এই প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা শবলিত হয় বহুশ্রুতির দ্বারা। কবিকে অতীত ও বর্তমানের, স্বদেশের ও বিদেশের সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হতে হয়। এমার্সন শেক্‌স্‌পীয়র প্রসঙ্গে বলেছিলেন, সর্বোত্তম প্রতিভা সবচেয়ে বড়ো অধমর্ণ। আমাদের দেশেও একথা স্বীকৃত হয়েছে। একজন কবি অন্যের কাছ থেকে একটি পদ, একটি বাক্য, এমন কি সমগ্র ভাবে একটি শ্লোকও গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু স্বোন্মেষণশীলতা গুণে অন্যের কাছে সর্বঋণী হয়েও তিনি উত্তরকালের অবিসংবাদিত মহাজন। সংস্কৃত ভাষায় 'সকলোপজীবী' হয়েও 'ভুবনোপজীব্য'।

এই ব্যুৎপত্তির আরেকটি দিক হল সাহিত্যশাস্ত্রজ্ঞান। সার্থক কবি হতে হলে শব্দশাস্ত্র, ছন্দ-শাস্ত্র এবং অলংকারশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হতে হবে। সহজাত কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন অনেক রচয়িতা নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু তাঁদের অশিক্ষিতপটুত্ব স্বীকার করেও বলতে হবে, শাস্ত্রানুশীলনের দ্বারা পরিশীলিতমনা সাহিত্যিকই পরিশুদ্ধ বাকশিল্প রচনায় সমর্থ। শুধু শাস্ত্রানুশীলনই নয়। নিয়মিত রচনানুশীলন অর্থাৎ অভ্যাসও উৎকৃষ্ট সাহিত্যরচনার অপরিহার্য শর্ত। আমাদের দেশে সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রীরা তাই বলেছেন, প্রতিভা ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাসই সাহিত্যসৃষ্টির উৎকর্ষবিধায়ক ধর্ম। সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে তাই কবিশিক্ষা ও কবিচর্যা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। কবিচর্যায় চারুশীলনের সঙ্গে শুচিশীলনের প্রসঙ্গও বিবেচিত হয়েছে। অবশ্য শুদ্ধশীল জীবনচর্যা চারুশিল্পীর পক্ষে অত্যাবশ্যক কিনা, এ-সমস্যার মীমাংসা দেশে দেশে, যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কবির জীবনী এবং কবিজীবনী প্রসঙ্গে পূর্বেই এ-সমস্যার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কবিচর্যার আদর্শও দেশ-কাল-সমাজ ভেদে ভিন্ন ও বাস্তবসম্মত হতে বাধ্য। কিন্তু কবিমানসের উপাদান হিসাবে প্রতিভা ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাস,—এই গুণত্রয় যে সাহিত্যসৃষ্টির উৎকর্ষের হেতু, তা সর্বজনগ্রাহ্য না হলেও বিদগ্ধজনসম্মত।

৭

আমরা বাংলা সাহিত্যতত্ত্বে কবিমানসের স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। এই আলোচনার উপসংহার রচনা করব আমারই একটি কবিতার সংকেত দিয়ে :

জীর্ণবস্ত্র রঙিন সুতোয় রিপু করে
শিল্পিত গেরুয়া-পরা
ভোরের বাউল।

একতারা হাতে নিয়ে
ঘুঙুরের বোল তুলে পথের মাটিতে
বিস্ময়ে অবাক্‌।

নিশান্তের নির্জন প্রান্তর
শিশিরে কোমল হয়ে আছে।

সংহার-ত্রিশূলে মাথা রেখে
মহাকাল
একফালি চাঁদের দর্পণে
অর্ধনারীশ্বর॥

কবিকে বলা হয়েছে ভোরের বাউল। অতিশয়োক্তি অলংকারে জীবনের ছিন্নবস্ত্রকে কল্পনার রঙিন সুতোয় সুগ্রথিত করে শিল্পিত গৈরিকবাসে সে আচ্ছাদিত। মনের মানুষকে সে ভালবাসে। কিন্তু অন্তঃরক্ত হয়েও সে অনাসক্ত। তাই তার আচ্ছাদনের বর্ণ গৈরিক। তার হাতে আছে একতারা। নিশান্তের জাগরণী-গান গেয়ে পথিক-মানুষের চলার পথকে সে গীতছন্দে মধুময় করে তোলে। তার চোখে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি। নিশান্তের নির্জন প্রান্তর কল্পান্তিক প্রলয়ের প্রতীক। কিন্তু ওর মধ্যেই সে দেখছে শিশিরের কোমলতায় নবসৃষ্টির সম্ভাবনা। অন্তিম স্তবকে তার দৃষ্টি সংহত হয়েছে একটি রূপকল্পে :

সংহার ত্রিশূলে মাথা রেখে
মহাকাল
একফালি চাঁদের দর্পণে
অর্ধনারীশ্বর॥

বাউল একই সঙ্গে দেখছে মহাকালের ত্রিশূল আর একফালি চাঁদ। ত্রিশূল মহাকালের হাতে নেই। প্রলয়ক্লান্ত তাঁর মস্তক তাতে ন্যস্ত। তাঁর দিকে তাকিয়ে চাঁদের দর্পণে বাউলের দৃষ্টিতে ভেসে উঠেছে তাঁর অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। তা নবসৃষ্টির ব্যঞ্জনাবহ। কবিতাটির ভাবার্থ হল : প্রলয়ে-সৃজনে মানুষের অন্তহীন চলার পথে ভোরের জাগরণী-গান যার কণ্ঠে সেই বাউল-মানসই কবিমানস।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ওড়িয়া কবি মার্কণ্ড দাসের 'কেশব কোইলি' বা যশোদা বিলাপ

প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়

যে সকল করুণ কাহিনী যুগে যুগে বাঙ্গালী হৃদয়কে অশ্রুপ্লাবিত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে একটি—চিরদিনের জন্য বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন অল্প কয়েকদিনের পরেই ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু হায়, তিনি আর কখনও একটি দিনের জন্যও, বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন নাই। মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ পাইলেন তাঁহার আপন জনকজননী বসুদেব ও দেবকীকে, আর পাইলেন তাঁহার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র। এই কর্মক্ষেত্রের পরিধি ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতে হইতে একদিন সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার বিরাট কর্মক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বৃন্দাবনের জীবন আর তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। তাঁহার একান্ত আপনার জন, যাহাদিগকে তিনি বৃন্দাবনে ফেলিয়া গেলেন, তাঁহাদের কথা—সেই বিরহবিধুরা প্রেমময়ী রাধিকা এবং অন্যান্য গোপবধূগণ, যাহারা তাহাদের মান সম্ভ্রম, লজ্জা ভয় সব কিছু বিসর্জন দিয়া, লাঞ্ছনা গঞ্জনা লোকনিন্দা সব কিছু তুচ্ছ করিয়া তাঁহাকে তাহাদের দেহ ও মন সমর্পণ করিয়াছিলেন সেইসব বিমুগ্ধা প্রেমিকাদের কথা, তাঁহার আবাল্য সহচর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কথা আর সর্বোপরি মাতা যশোদা এবং পিতা নন্দ, যাঁহারা পুত্রাধিক স্নেহে তাহাকে লালন পালন করিয়াছিলেন এবং নিঃসন্তান হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ ভালবাসা তাঁহাকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা—তিনি যেন চিরদিনের জন্য তাঁহার মানসপট হইতে মুছিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিবেন এই আশা যেদিন নিশ্চিত নিরাশায় পরিণত হইল সেইদিন কৃষ্ণগতপ্রাণ এই সকল উপেক্ষিত, হতভাগ্য, শোকবিহ্বল নরনারীর হৃদয় হইতে আর্তক্রন্দন ও হাহাকার উত্থিত হইল তাহা শুধু যে বৃন্দাবনের আকাশ বাতাসকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত করিল তাহা নহে, তাহা আমাদের হৃদয়কেও চিরদিনের জন্য অশ্রুসিক্ত করিয়া দিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর এক বিখ্যাত ওড়িয়া কবি মার্কণ্ড দাস শোকার্তা জননী যশোদার বিলাপ বর্ণনা করিয়া একটি গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন; তাহার নাম 'কেশব কোইলি'। এই একটি কবিতা লিখিয়া তিনি ওড়িয়া সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছেন। 'কোইলি' ও 'চউতিশা' প্রাচীন ওড়িয়া কাব্যরীতির দুইটি বিশিষ্ট নিদর্শন। কোইলি (অর্থাৎ কোকিল) কে সম্বোধন করিয়া, হৃদয়ের কোন গভীর ভাব অন্যের অসাক্ষাতে প্রকাশ করিয়া, হয়ত বা কোকিলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া, যে কবিতা রচিত হইত উহাই 'কোইলি' কবিতা। আর ব্যঞ্জনবর্ণের 'ক' হইতে 'ক্ষ' পর্যন্ত ৩৪টি অক্ষরকে আদ্যঅক্ষররূপে গ্রহণ করিয়া যে কবিতা রচিত হইত তাহা 'চউতিশা' বা চৌত্রিশা। 'কেশব কোইলি' একাধারে কোইলি ও চউতিশা। নিম্নের উদাহরণ হইতে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে।

"কোইলি, কেশব যে মথুরাকু গলা,
কাহা বোলে গলাপুত্র বাহুড়ি নইলা।
লো কোইলি।
কোইলি, খণ্ডক্ষীর দেবি মুঁ কাহাকু
খাইবার পুত্র গলা মথুরা পুরকু।
লো কোইলি।
(কোইলিরে, কেশব আমার চলে গেছে মধুপুরে,
কার কথায় গেল পুত্র, আসিল না ফিরে।
লো কোইলি।
কোইলি, খণ্ডক্ষীর আমি আর দিব কাহারে,
খাইত যে সে ত গেছে মথুরাপুরে।
লো কোইলি)

প্রতি দুই লাইনের একটি পদের আগে 'কোইলি' এবং শেষে "লো কোইলি" এই কথাগুলি আছে। এবং প্রথম পদের দুই লাইনের প্রথম অক্ষর 'ক' দ্বিতীয় পদে 'খ', এবং তৃতীয় পদে 'গ' এইরূপ। প্রথম লাইনের প্রথম শব্দটি 'কেশব'। এই জন্য এই গীতিকবিতাটি "কেশব কোইলি" নামে পরিচিত।

সহজ, সরল, স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল ভাষায় রচিত এই সুমধুর সঙ্গীতময়ী কবিতাটি শত শত বৎসর ধরিয়া উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে পাঠশালায় কিশোর ছাত্রদিগের, বর্ণমালার শিক্ষার পরে, প্রথম পাঠ্যপুস্তকরূপে পঠিত হইত। তাহাদের মুখে ইহার সুমধুর আবৃত্তি শুনিয়া পিতামাতা আত্মীয়স্বজন সকলে পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন।

"কেশব কোইলির" কবি মার্কণ্ড দাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ওড়িয়া সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণের মতে এই কবিতাটি চতুর্দশ শতাব্দীতে, সারলা দাসের বিখ্যাত ওড়িয়া মহাভারত রচিত হইবার পূর্বে রচিত হইয়াছিল এবং ইহা ওড়িয়া সাহিত্যের একটি অতি প্রাচীন নিদর্শন।

কবিতাটির সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ নীচে দিতেছি :

কোইলিরে, কেশব আমার চলে গেছে মধুপুরে।
কার কথায় গেল পুত্র আসিল না ফিরে।
লো কোইলি।
কোইলি, খণ্ডক্ষীর আমি আর দিব কাহারে,
খাইত যে সে ত গেছে মথুরাপুরে।
লো কোইলি।
গেল চলে পুত্র মোর আসিল না আর,
গহন বৃন্দাবন হইল আঁধার।
ঘর দোর চাহি আর নাহি দেখে নন্দ,
গৃহ আজ শোভাহীন হারায়ে গোবিন্দ।
নন্দ হৃদয় বিধি পাষাণে গড়িল,
নয়নে কাজল দিয়ে রথে বসাইল।
চলিত যখন বাছা বাজিত মেখলা ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্।
চকিত হইত শুনি ব্রজবাসীযত আনন্দে মগন।
ছড়ি দিয়ে হয়ত বা মেরেছি কখনে,
ছেড়ে গেল বুঝি কৃষ্ণ সেই অভিমানে।

কোইলি, "যাত্রা দেখিবে চল" এই কথা বলি
নিয়ে গেল অক্রূর মিথ্যায় ছলি। লো কোইলি

„ কেঁদে কেঁদে অশ্রু মোর নয়নে শুকায়,
অভিমানে বুঝি কৃষ্ণ গেল মথুরায়। „

„ একদিন নিশাকালে হরি মাগে চান্দ,
আকাশে তুলিয়া মুখ দেখাইলা নন্দ। „

„ খল্‌খল্ করি হাসে বসি তার কোলে,
টল্‌মল্ করে হরি চলিবার কালে। „

„ কী সুন্দর দুইভাই ভুলাইয়া নিল,
পুনর্বার আর কৃষ্ণ ফিরি না আসিল। „

„ শিখাইলে শুকসারী বলে কত কথা,
সেইমত কৃষ্ণ বলে কথা মধুমাখা। „

„ হারালাম পুত্র আমি কেন হে বিধাতা,
এই কথা বলি কাঁদে জননী যশোদা। „

„ হিংসায় উন্মত্ত হোল নরপতি কংস,
পাপভার পূর্ণ হলে সেই হোল ধ্বংস। „

„ কৃষ্ণদেহে মাখিতাম কুঙ্কুমাদি যবে,
খেলায় ভুলাত তারে বলরাম তবে। „

„ স্তনদুগ্ধ দিয়া আমি পালিলাম যাকে,
স্থবির হইয়া না পাই দেখিতে তাহাকে। „

„ দড়ি দিয়ে বেঁধেছিনু একদিন তাকে,
সেই রাগে সে কি গেল ফেলিয়া আমাকে? „

„ ধন্য ভাগ্যবতী, দেবী দৈবকী, লভিলা ধর্মবলে,
কৃষ্ণ হেন পুত্র, অতি ভাগ্যবন্ত, তুলে নিল
তারে কোলে। „

„ যেই দিন কৃষ্ণ মোর গেল মথুরায়,
সেই দিন হতে ব্রজ শোভাহীন হায়। „

„ পবিত্র মাধব অঙ্গ দেখে পাই সুখ,
পবিত্র হৈতাম আমি দেখি তার মুখ। „

„ সন্তান লভিবার নাহি আর আশ,
পুত্র মোর চলে গেল বসুদেব পাশ। „

„ কত না সয়েছি আমি বায়না তাহার,
সব স্নেহ ভুলে গেল কৃষ্ণ আমার? „

„ আমাকে ভুলায়ে চলে গেল দুই ভাই,
কৃষ্ণ বলরাম হায় ফিরি না আসই। „

„ আমি কি যাইব ধেয়ে মথুরা নগরী,
আনিব কি মাধবকে দুই হাতে ধরি? „

„ "আসিব আবার ফিরে" বলে গেল মোরে,
কিন্তু হায় আর হেথা আসিল নাকি রে। „

কোইলি, রত্ন বস্ত্র অলঙ্কার পরিধান করি,
কত শোভা পাইত গো আমার শ্রীহরি ! লো কোইলি
" লক্ষ্মীবন্ত পুত্র মোর বটে নারায়ণ,
তাই কৃষ্ণ নাম রাখিলেন গর্গ ব্রাহ্মণ। "
" কৃষ্ণ বিনা বৃন্দাবন শোভা নাহি ধরে,
কে আর চরাবে গরু যমুনার তীরে ? "
" যেইদিন চলে গেল কৃষ্ণ মথুরায়,
সেইদিন হতে নন্দ পাগলের প্রায়। "
" দিনে দিন ক্ষীণ হয় যথা চন্দ্রকলা,
সেইমত ক্ষীণকান্তি নন্দরাজ হৈলা। "
" সাতদিন ধরি যবে ইন্দ্রবৃষ্টি কৈল,
সাত বছরের কৃষ্ণ মন্দর ধরিল। "
" হাই তুলেছিল কৃষ্ণ হাঁ করিয়া তুণ্ড,
মুখের ভিতরে দেখি সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড। "
" "মায়ার বন্ধনে বন্ধ মোর ভুজদণ্ড,
ক্ষমা কর দোষ মোর" ভণে মার্কণ্ড। "

(বাংলা অনুবাদে মূল কবিতার ভাব পুরোপুরি এবং ভাষা যতদূর সম্ভব বজায় রাখা হইয়াছে, কিন্তু অনুবাদিত কবিতা সঙ্গীত হয় নাই, এবং চউতিশার রীতি পুরোপুরি রক্ষিত হয় নাই।)

একটি সন্তানবৎসলা, স্নেহাতুরা, শোকবিহ্বলা মাতার এই বিলাপনকী করুণ, কী মর্মস্পর্শী! মা তাহার দুর্ভাগ্যের জন্য একবারও তাহার প্রাণাধিক পুত্রের উপর দোষারোপ করেন নাই। তিনি দোষী করিয়াছেন কংসকে, অক্রূরকে এবং তাহার নিজের স্বামী নন্দকে। "নন্দের কঠিন হৃদয় বুঝি বিধাতা পাষাণে গড়িয়াছেন, তা না হলে সে নিজে ছেলের চোখে কাজল পরিয়ে দিয়ে তাকে মথুরা পাঠিয়ে দেবার জন্য রথে বসিয়ে দিয়ে আস্‌তে পারত ?" শুধু একবার মাত্র অভিমান করিয়া বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণ কি মথুরায় গিয়ে আমার যত স্নেহ ভালবাসা সব ভুলে গেল ? কৃষ্ণ আর বলরাম জেনে শুনে কি আমাকে ধাপ্পা দিয়ে "ক দিন পরেই আবার ফিরে আস্‌ব" এই কথা বলে মথুরায় চলে গেল ?"

আমরা দেখিতে পাইতেছি জননী যশোদার মানসপটে তাঁহার অতি আদরের গোপালের শৈশব ও বাল্যকালের কয়েকটি সুখময় চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। হায়, এখন হইতে অতীত দিনের এই সব সুখস্মৃতিই হইবে তাঁহার নিরানন্দ জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

এক হিসাবে যশোদার এই বিলাপ চিরন্তন ও সার্বজনীন জগতের যে কোন স্থানে যে কোন জননীর সন্তান মাকে ফেলিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে এবং আর কখনও মায়ের কাছে ফিরিয়া আসে নাই, সেই সব মাতার অন্তরের আর্তক্রন্দন এই কবিতায় প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় যে সকল মনীষী নিজেদের প্রতিভার দীপ্তিতে বাংলার সারস্বত সমাজ উজ্জ্বল করেছিলেন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার[১] তাঁদের অন্যতম। বাণেশ্বরের বহু রচনা লুপ্ত বা অনাবিষ্কৃত। গবেষকদের[২] চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তাঁর যে ক'খানি গ্রন্থ ও রচনা আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, বাণেশ্বর তৎকালীন বাংলার সংস্কৃতি-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন।

বাণেশ্বরের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। কালীময় ঘটক তাঁর 'দ্বিতীয় চরিতাষ্টক' গ্রন্থে (২য় সং, পৃ. ১) লিখেছেন—"কলিকাতার যোড়-বাঙ্গালাস্থিত কোন দেবমন্দিরে সংযোজিত প্রস্তরফলকে একটি সংস্কৃত কবিতা খোদিত ছিল এবং ঐ কবিতার নিম্নে ১১৫৩ সাল লেখা ছিল। তাঁহার প্রপৌত্রের নিকট শুনা গিয়াছে যে ঐ কবিতাটি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের রচিত। যদি ইহা সত্য হয় এবং প্রস্তর-ফলকে লিখিত সাল কবিতা রচনার সময় মনে করা যায়, তাহা হইলে স্থূলতঃ তাঁহার জীবিতকালের একরূপ নির্ণয় হইতে পারে। ...১২৭০ সালের মহাঝড়ে প্রস্তর-ফলক বহুধা ভগ্ন হওয়ায় কবিতাটির মর্ম গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই।"

কালীময় ঘটক তাঁর উক্ত মন্তব্যে উল্লেখিত যোড়বাংলা মন্দিরের অবস্থান বিবৃত করেন নি, কিন্তু বাংলা ১১৫৩ সনে (খ্রীঃ ১৭৪৬) বাণেশ্বর যে জীবিত ছিলেন তার অন্য প্রমাণও আছে। বাণেশ্বরের বিবাদার্ণবসেতু ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি বাণেশ্বরের রচনা। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যও এই মত সমর্থন করেন। তিনি বলেন—"এই গ্রন্থের বিবরণে হালহেড পণ্ডিতগণের বয়ঃক্রম অনুসারে তাহাদের নামমালা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। বাণেশ্বরের নাম তালিকার চতুর্থ স্থানে আছে, তদনুসারে গ্রন্থ রচনা-কালে তাঁহার বয়স ৭০ হইতে ৮০ বৎসর মধ্যে ধরিয়া আঃ ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ তাঁহার জন্মকাল বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে, কারণ পণ্ডিতদের মধ্যে একজন মাত্র (নদীয়ার গোপাল বিদ্যালঙ্কার) অশীতি বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন।"[৩] 'বিবাদার্ণবসেতু' রচনা সমাপ্তির পরেও ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বাণেশ্বর, কৃষ্ণজীবন, কৃষ্ণগোপাল ও গৌরীকান্ত—এই চারজন পণ্ডিত একটি ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করেন। কারারুদ্ধ মহারাজ নন্দকুমার কারাগারে আহার করতে পারেন কিনা, সেই বিষয়ে এই ব্যবস্থাপত্র লেখা হয়।[৪] সুতরাং বাণেশ্বরের জন্মকাল আঃ ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ ধরাই সঙ্গত।

হুগলী জেলার বলাগড় থানার অধীন গুপ্তিপাড়া গ্রামের যে পল্লী আজ 'ছুতার-পাড়া' নামে খ্যাত, তার শেষ প্রান্তের তলদেশ দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে গঙ্গা প্রবহমানা ছিলেন। ঐখানে ভাগীরথীর একটি ঘাট ছিল, তার নাম 'কোঠাবাড়ীর ঘাট'। ঐ ঘাটের কাছে বাণেশ্বরের বসত ভিটা ও কোঠাবাড়ি থাকায় ঐ ঘাটের নাম হয়েছিল 'কোঠাবাড়ীর ঘাট'।[৫] ঐ ঘাটের এখন চিহ্ন নেই। শুধু একটা জঙ্গলাচ্ছাদিত ঢিবি কোঠাবাড়ির অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বাণেশ্বরের পিতার নাম রামদেব তর্কবাগীশ। রামদেব গুপ্তিপাড়ার চট্টশোভাকর বংশীয় কবি ও পণ্ডিত—কবিচন্দ্র বিষ্ণুচন্দ্র সিদ্ধান্ত বাগীশের (খ্রীঃ ১৭ শঃ) পুত্র। রামদেব তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও নৈয়ায়িকদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। কথিত আছে যে, তিনি সমগ্র সংস্কৃত মহাভারত নিজ হাতে নকল করে কণ্ঠস্থ করেছিলেন। রামদেবের দুই সংসার, প্রথমা স্ত্রী থেকে একটি মাত্র পুত্র—রামনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার, দ্বিতীয়া স্ত্রী থেকে দুই পুত্র—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও রামকান্ত তর্কালঙ্কার। রামদেব সুকবি ছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু এ যাবৎ তাঁর একটি মাত্র শ্লোক[৬] ছাড়া অন্য কোন রচনা সংগৃহীত হয়নি।

বাল্যে বাণেশ্বর পিতা রামদেবের কাছে বিদ্যারম্ভ করেন[৭] এবং অল্পকাল মধ্যে তিনি সুপণ্ডিত হন। জনশ্রুতি এই যে, তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে হুগলী জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগরের জনৈক বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণের নিকট ত্রিবেণীতে ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা নেন এবং এই ইষ্টমন্ত্র জপ করে তিনি কবিত্বের অধিকারী হ'ন।[৮] এর পরে তিনি কিছুদিন গুপ্তিপাড়া মঠের দণ্ডী পীতাম্বরানন্দ-আশ্রমের সভাসদ হ'ন, পরে নদীয়ারাজ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়[৯] তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুনে তাঁকে সাদরে নিজ রাজসভায় আশ্রয় দেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন না; কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর রাজ্যাধিকার কাল (খ্রীঃ ১৭২৮-৮২) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ' বা 'নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ' বলে অভিহিত।[১০] কৃষ্ণচন্দ্র নিজে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন; বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ, ('নদের শঙ্কর'—নবদ্বীপ), গোপাল (রামগোপাল) ন্যায়ালঙ্কার (নবদ্বীপ), কালিদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন (গুপ্তিপাড়া), রামকান্ত তর্কালঙ্কার (গুপ্তিপাড়া) প্রভৃতি বহু মনীষী ও পণ্ডিতের সমাবেশে তাঁর রাজসভা পূর্ণ থাকতো। এই সকল পণ্ডিতদের মধ্যে বাণেশ্বরকেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সমধিক সমাদর করতেন। বাণেশ্বর সভায় উপস্থিত হলেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উঠে দাঁড়াতেন। এর জন্য এক সময় রাজসভার নবদ্বীপবাসী কয়েকজন পণ্ডিত মন্তব্য করেন, গুরু ও পুরোহিত ছাড়া অন্য কাউকে দেখে রাজার

উঠে দাঁড়ান উচিত নয়। কৃষ্ণচন্দ্র উত্তর দেন, "বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে আমার গুরু বললেও হয়, পুরোহিত বললেও হয়।"

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের এত শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করেও বাণেশ্বরের পক্ষে নদীয়া রাজসভায় বেশীদিন থাকা সম্ভব হয় নি। কিছুকাল পরে তিনি নদীয়া রাজসভা ত্যাগ করে বর্ধমানরাজ চিত্রসেনের (খ্রীঃ ১৭৪০-৪৫)[১১] আশ্রয় নেন ও তাঁর রাজসভায় সভাসদ হ'ন। অবশ্য কি কারণে বাণেশ্বর নদীয়া রাজসভা ত্যাগ করেন, তা জানা যায় না। কালীময় ঘটক লিখেছেন, "রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহার [বাণেশ্বরের] যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিতেন। তিনি কলিকাতার শোভাবাজারে বিদ্যালঙ্কারের একটি বাড়ী নির্মাণ করিয়া দেন। ...ঐ বাড়ীর বাস সম্বন্ধেই কলিকাতার বিখ্যাত বসাকদের বাটিতে কোন শ্রাদ্ধীয় সভায় বিদ্যালঙ্কারের গমন হয়। এই শূদ্রসংসর্গপ্রযুক্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রতি কিছু অভক্তি প্রকাশ করেন। রাজার ঐ অভক্তি ভাব বাণেশ্বর যে মুহূর্তেই জানিতে পারিলেন, সেই মুহূর্তেই কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া বর্ধমান প্রস্থান করেন।"[১২]

কালীময় ঘটকের বিবৃত উক্ত কাহিনী গ্রহণযোগ্য নয়। রাজা নবকৃষ্ণদেব আঃ ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর পরলোকগত হ'ন। বাণেশ্বর ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া রাজসভা ত্যাগ করে বর্ধমান রাজসভায় যোগ দিয়ে থাকলে ঐ সময় নবকৃষ্ণের বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর। কাজেই ঐ সময় বাণেশ্বরকে ভূমিদান বা শোভাবাজারে বাসভবন নির্মাণ করে দেওয়া নবকৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ কাজ তিনি পরে করেছিলেন। বিপিনবিহারী মিত্র তাঁর 'নবকৃষ্ণ চরিত' গ্রন্থে লিখেছেন, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের সঙ্গে কোন সূত্রে বিবাদ হওয়ায় বাণেশ্বর নদীয়া রাজসভা ত্যাগ করেন।

অনুমান করা যায়, ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাণেশ্বর বর্ধমানরাজ চিত্রসেনের সভায় ছিলেন। এই সময় তিনি 'চিত্রচম্পূ' নামে সংস্কৃত গদ্য পদ্য মিশ্রিত চম্পূকাব্য এবং সংস্কৃত নাটক 'চন্দ্রাভিষেকম্' রচনা করেন।

সম্ভবতঃ ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষে মহারাজ চিত্রসেনের মৃত্যু হলে বাণেশ্বর বর্ধমান রাজসভা ত্যাগ করেন এবং ঐ সময় বা কিছু পরে মুর্শিদাবাদে নবাব আলিবর্দী খাঁর (খ্রীঃ ১৭৪০-৫৬) দরবারে সভাপণ্ডিত রূপে যোগদান করেন। সম্ভবতঃ আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর তিনি নবাব দরবার ত্যাগ করেন। জনশ্রুতি আছে যে, আলিবর্দী খাঁর পারলৌকিক কৃত্য উপলক্ষে নবাব সিরাজউদ্দৌলা (খ্রীঃ ১৭৫৬-৫৭) বাংলার প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের কাছে যাবনিক সংস্কৃতে লিখিত যে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান,[১৩] সেটি বাণেশ্বরের রচনা।

মুর্শিদাবাদ নবাব দরবার ত্যাগ করে বাণেশ্বর নদীয়া রাজসভায় ফিরে আসেন এবং

পরে আ: ১৭৭০/৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শোভাবাজাররাজ মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের (খ্রী: ১৭৩১-৯৭) রাজসভায় যোগ দেন।[১৫] মহারাজ নবকৃষ্ণ বিদ্বজ্জনপোষক ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের মত তিনি তাঁর রাজপ্রাসাদে 'নবরত্ন সভা' স্থাপন করেছিলেন। ন'জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নিয়ে এই নবরত্নসভা গঠিত ছিল। এই ন'জন পণ্ডিত হলেন—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (গুপ্তিপাড়া), জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (ত্রিবেণী),[১৬] শঙ্কর তর্কবাগীশ (নবদ্বীপ), বলরাম তর্কভূষণ (কামালপুর), কামদেব বিদ্যাবাচস্পতি (কামালপুর), গদাধর (অজ্ঞাত), শিবরাম তর্কপঞ্চানন (কামালপুর), কৃপারাম তর্কবাগীশ (পসপুর), ও রাধামোহন গোস্বামী বিদ্যালঙ্কার (শান্তিপুর)। নবকৃষ্ণ দেবের রাজবাড়ি আরও বহু পণ্ডিত ও সারস্বতে পূর্ণ থাকতো।[১৭] নবকৃষ্ণ বাণেশ্বরকে শোভাবাজারে ভূমিদান করেন এবং ঐ ভূমির উপর নিজব্যয়ে বাণেশ্বরের একটি বসতবাটী নির্মাণ করে দেন। এতে বোঝা যায়, তাঁর সভাস্থ পণ্ডিতদের মধ্যে বাণেশ্বরকেই মহারাজ নবকৃষ্ণ সর্বাধিক সমাদর করতেন।

সম্ভবতঃ শোভাবাজার রাজসভায় অবস্থানকালে বাণেশ্বর মহারাজ নবকৃষ্ণের আনুকুল্যে ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে পরিচিত হ'ন। এই পরিচয়ের পরিণতি বাণেশ্বরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বিবাদার্ণবসেতু'। 'বিবাদার্ণবসেতু' ভারতের প্রথম হিন্দু আইন-গ্রন্থ।

বাণেশ্বরের জন্মকালের মতো তাঁর মৃত্যুকালও অনুমান-নির্ভর। আগেই বলা হয়েছে, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বিবাদার্ণবসেতু' রচনাকালে তাঁর বয়স ছিল ৭০ বছর থেকে ৮০ বছরের মধ্যে। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপরাজ ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তরাধিকার ঘটিত বিবাদের মীমাংসার সময় যে তিনজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থা নেওয়া হয় বাণেশ্বরের পুত্র হরিনারায়ণ সার্বভৌম তাঁদের একজন। অপর দু'জন হলেন নবদ্বীপের কৃপারাম তর্কভূষণ ও ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।[১৮] সেজন্য সিদ্ধান্ত করা হয়, ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে কোন সময় বাণেশ্বরের মৃত্যু হয়। জনশ্রুতিমতে বাণেশ্বর কাশীতে স্বর্গীয় হ'ন।

বাণেশ্বরের রচনাবলী।

১। চিত্রচম্পূঃ

সম্ভবতঃ 'চিত্রচম্পূঃ'ই বাণেশ্বরের প্রথম রচনা। বাণেশ্বর বর্ধমান রাজসভায় অবস্থানকালে মহারাজ চিত্রসেনের আদেশে ১৬৬৬ শকাব্দের ১০ ই কার্তিক (খ্রী: ১৭৪৪) এই গ্রন্থ রচনা করেন।[১৯]

'চিত্রচম্পূ'র প্রথম উল্লেখ করেন মিশনারী ওয়ার্ড সাহেব। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে এই মিশনারী সাহেব তাঁর ইংরাজী গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বাংলাদেশের চতুষ্পাঠীগুলির

পাঠ্যগ্রন্থসমূহের একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করেন, ঐ তালিকায় 'চিত্রচম্পূ'র নাম পাওয়া যায়।[২০] কোলব্রুক সাহেব (Mr. H. T. Colebrooke) ভারতবর্ষ থেকে 'চিত্রচম্পূ'র একখানি প্রতিলিপি-পুঁথি লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীকে উপহার দেন। ঐ পুঁথি ঐ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।[২১] গুপ্তিপাড়ার কাশীপ্রবাসী পণ্ডিত, কাশীর জয়নারায়ণ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয় লণ্ডন থেকে ঐ পুঁথি আনিয়ে তার নকল করে ও ভ্রম ত্রুটি সংশোধন করে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের ইংরেজী মুখবন্ধ (Foreword) ও নিজ ইংরাজী ও সংস্কৃত ভূমিকা সহ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 'চিত্রচম্পূ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[২২]

সাহিত্যিক মূল্য ছাড়া 'চিত্রচম্পূ'-র একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। 'চিত্রচম্পূ'তে বর্গীর হাঙ্গামার নিখুঁত বিবরণ পাওয়া যায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য-হিসাবে 'চিত্রচম্পূ' সেজন্য মূল্যবান্ গ্রন্থ। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী একটি প্রবন্ধে 'চিত্রচম্পূ' থেকে সংস্কৃত সন্দর্ভ উদ্ধৃত করেছেন।[২৩] আচার্য যদুনাথ সরকারও তাঁর প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[২৪] মহামহোপাধ্যায় ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রবন্ধে 'চিত্রচম্পূ'-বর্ণিত বর্গীর হাঙ্গামার বিবরণ বাংলায় উদ্ধৃত করেছেন।[২৫]

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোকের পর বাণেশ্বর গ্রন্থের নায়ক মহারাজ চিত্রসেনের গুণকীর্তন করেছেন ও তাঁর দৈনন্দিন কাজের বিবরণ দিয়েছেন। তারপর তিনি তাঁর মন্ত্রী মাণিক্যচন্দ্রের (মাণিকচাঁদ) বর্ণনান্তে বর্গীর হাঙ্গামার একটি বাস্তব চিত্র এঁকেছেন। এর পরেই মূল কাহিনীর আরম্ভ।

কাহিনীটি রূপক-কাহিনী ও চিত্রসেনের স্বপ্নবৃত্তান্ত নিয়ে লেখা। মহারাজ চিত্রসেন দেওয়ান মাণিকচাঁদের উপর বর্ধমানরক্ষার ভার দিয়ে দক্ষিণপ্রয়াগ ও গঙ্গা-সাগরের মধ্যবর্তী বিশালানগরীতে স্কন্ধাবার স্থাপন করলেন। এইখানে একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন—তিনি মৃগয়ায় বাহির হয়ে একটি হরিণের পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে বহুদূরে চলে গেলেন। তারপর 'সৎসঙ্গ সরঃ' নামে একটি সরোবরের তীরে এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বরের নির্দেশে রাজা নিকটবর্তী এক সহরের একটি প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। প্রাসাদে প্রেমভক্তি দেবী রাজাকে আপ্যায়ণ করলেন। পরদিন সকালে রাজা দেবীর সঙ্গে রথারোহণে ভারতের বিভিন্নতীর্থ পরিভ্রমণ করে বৃন্দাবনে এসে দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে বৃন্দাবনলীলা ও রাধাকৃষ্ণকে দর্শন করে তাঁদের আশীর্বাদ লাভ করলেন, তারপর আবার রথারোহণে বিভিন্ন স্থান ঘুরে বিশালায় ফিরে এলেন।

২। চন্দ্রাভিষেকম্ :

'চিত্রচম্পূ'র পরবর্তী রচনা 'চন্দ্রাভিষেকম্' নাটক। এই নাটক মুদ্রিত হয়নি। ডঃ কৃষ্ণমাচারিয়র তাঁর 'History of the Classical Sanskrit Literature'

গ্রন্থে চন্দ্রাভিষেক নাটকের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ভুল করে রচয়িতার নাম বাণেশ্বরের বদলে 'রামেশ্বর' লিখেছেন। এ যাবৎ এই নাটকের একখানি মাত্র প্রতিলিপি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।[২৬] 'বিক্রমোর্বশী', 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' ও আরও ২/১ খানা গ্রন্থের সঙ্গে এই প্রতিলিপি পুঁথি একসঙ্গে বাঁধানো। প্রতিলিপি পুঁথিখানি বিলাতী কাগজে বড় বড় বাংলা অক্ষরে লেখা, প্রাকৃত অংশের সংস্কৃত নেই। রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয় ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে এই পুঁথি আনিয়ে নকল করে রাখেন এবং প্রাকৃত অংশের সংস্কৃত যোজনা করেন। ইণ্ডিয়া অফিসের পুঁথির শেষ পত্র নেই, পুঁথির শেষে ভরতবাক্যের একটি মাত্র শ্লোক আছে।[২৭] চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে 'চন্দ্রাভিষেকম্' নাটকের একটি প্রতিলিপি পুঁথির শেষ পত্র রক্ষিত ছিল। ঐ পত্রে ভরতবাক্যের আরও দুটি শ্লোক [২৮] ও পুষ্পিকা [২৯] আছে। পুষ্পিকা থেকে জানা যায় যে, এই নাটক ১৬৬৬ শকাব্দের ৯ই চৈত্র (মার্চ ১৭৪৫ খ্রী:) সমাপ্ত হয়। নাটকের সূত্রধার বচন থেকে জানা যায়, নাটকটি দেওয়ান মানিকচাঁদের নির্দেশে বসন্তোৎসবে অভিনীত হয়।

'চন্দ্রাভিষেকম্' বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের অনুকরণে লেখা। মগধের নন্দবংশ ধ্বংস এবং 'চন্দ্র' অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক এই নাটকের বিষয়বস্তু। সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরের' ৪র্থ ও ৫ম তরঙ্গে বর্ণিত কাহিনীই নাটকের বিষয়বস্তু তবে বাণেশ্বর এই কাহিনীর রূপান্তর ঘটিয়েছেন। নাটকে কোন স্ত্রীচরিত্র নেই।

কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মগধরাজ নন্দের মৃত্যু হলে চিত্রকূট আশ্রমের যোগী সম্পন্ন সমাধি নিজ দেহত্যাগ করে 'পুরপ্রবেশ বিদ্যা'র সাহায্যে নন্দের শরীর আশ্রয় করলে মৃত নন্দ বেঁচে উঠেন। নন্দের মন্ত্রী শাকটার নন্দের পুনর্জীবনলাভের রহস্য জানতে পেরে যোগীর দেহ ভস্মীভূত করার আদেশ দেন। আদেশমতে যোগীর দেহ রাজকর্মচারীরা ভস্মীভূত করে। নন্দদেহধারী যোগী ক্রুদ্ধ হয়ে শাকটারকে কারারুদ্ধ করেন ও রাক্ষসকে মন্ত্রীত্ব দেন এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে শাকটারকে মুক্তি দেন। রাজসূয় যজ্ঞের জন্য উপযুক্ত পুরোহিত আনার জন্য সম্রাটের আদেশ পেয়ে শাকটার অভিচার ক্রিয়া দক্ষ চাণক্যকে আমন্ত্রণ করে আনেন। সম্রাট যজ্ঞশালায় এসে চাণক্যকে তাঁর সিংহাসনে বসে থাকতে দেখে তাঁকে অপমানিত করে বিতাড়িত করেন। চাণক্য প্রতিশোধ নেবার জন্য অভিচার ক্রিয়ায় সম্রাট ও তাঁর পরিবারবর্গের দেহে দাহজ্বর সংক্রমণ করালেন। রাজপরিবারের অনেকের মৃত্যু হলো। চাণক্য এক কৃত্যার অনুষ্ঠান করে পূর্ণাহুতি দিলে এক বিপুল চতুরঙ্গবাহিনী উত্থিত হলো, চাণক্য এই বাহিনী নিয়ে কুসুমপুর আক্রমণ করলেন। নন্দের মৃত্যু হলো। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

৩। রহস্যামৃতম্ :

বাণেশ্বর এই গ্রন্থকে 'মহাকাব্য' বলেছেন। এই মহাকাব্য ২০টি সর্গে বিভক্ত।

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে এই গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি পুঁথি রক্ষিত আছে,[৩০] এতে ১ম থেকে ১২শ সর্গ আছে। পুঁথিতে গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ নেই। ৺রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয় লণ্ডন থেকে এই পুঁথি আনিয়ে নকল করে রাখেন। তাঁর নিজের কাছে এই গ্রন্থের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি পুঁথি ছিল। এই পুঁথির পত্রসংখ্যা ২৪ থেকে ২৬ এবং ৩৮ থেকে ৫৩। এতে ১৩ সর্গের মধ্য থেকে শেষাংশ সম্পূর্ণ আছে, শেষাংশের পুষ্পিকা থেকে জানা যায়। কৃপারাম ঘোষের (পাথুরিয়াঘাটার খেলাত ঘোষের পিতামহ) অনুরোধে এই গ্রন্থ রচিত হয়।[৩১] অনুমান করা হয়, বাণেশ্বর কৃপারামের সঙ্গে কাশী গিয়েছিলেন[৩২] এবং সেখানেই এই গ্রন্থ রচিত হয়। চক্রবর্তী মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত পুঁথির প্রতিলিপির তারিখ ১৬৯৫ শক। অর্থাৎ খ্রী: ১৭৭৩।

কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' কাব্য থেকে বিষয়বস্তুকে নিয়ে বাণেশ্বর এই কাব্য সম্প্রসারণ করেছেন ও উমার বিবাহশেষে হর পার্বতীর কাশীতে অধিষ্ঠান বর্ণনা করেছেন। কাব্যের ১ম সর্গে পার্বতীর জন্ম, ২য় সর্গে শিবাশ্রমদর্শন, ৩য় সর্গে শিবাশ্রমে মহাদেবের পরিচর্যায় পার্বতীর নিয়োগ, ৪র্থ সর্গে মদনভস্ম ও পার্বতীর তপস্যার সংকল্প। ৫ম সর্গে রতিবিলাপ, ৬ষ্ঠ থেকে ১২শ সর্গে পার্বতীর তপস্যা ও মহাদেবের আবির্ভাব। ১৩শ সর্গে হরপার্বতীর পরিণয়, ১৪শ সর্গে হরপার্বতীর রহস্য, ১৫শ সর্গে বারাণসী পরিচয়, ১৬শ সর্গে বারাণসী নির্মাণ, ১৭শ সর্গে শিবের পূজা, ১৮শ সর্গে সলক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের শিবের কাছে আগমন, ১৯শ সর্গে শিব-রাম সমাগম উপলক্ষে মহাভোজন ও ২০শ সর্গে ত্রৈলোক্যরাজ্যে অচ্যুতের অভিষেক বর্ণনা করা হয়েছে।

৪। বিবাদার্ণবসেতু :

হিন্দুদের কোন বিধিবদ্ধ দেওয়ানী আইন গ্রন্থ না থাকায় ওয়ারেন হেষ্টিংস (খ্রী: ১৭৭৩-৮৫) এই রকম একখানি আইন গ্রন্থ লিখানোর সঙ্কল্প করে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বাংলা দেশের এগারো জন পণ্ডিতকে এই রকম একখানি গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত করেন। এই এগারো জন পণ্ডিত হলেন,—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কৃপারাম তর্কবাগীশ, রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার, কৃষ্ণজীবন, বীরেশ্বর, কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরীকান্ত, কালীশঙ্কর, শ্যামসুন্দর, কৃষ্ণকেশব ও মারাঠীপণ্ডিত সীতারাম ভট্ট। বাণেশ্বর এই পণ্ডিত মণ্ডলীর মুখ্য ছিলেন।[৩৩] এই আইন গ্রন্থ রচনায় দু'বছর সময় লেগেছিল। ১১৮১ সালের ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৭৭৫ খ্রী:) এই গ্রন্থ রচনা শেষ হয়। গ্রন্থের নাম দেওয়া হয় 'বিবাদার্ণবসেতু।' 'বিবাদার্ণবসেতু' ২১টি তরঙ্গে বিভক্ত, মোট ১৬৩২টি শ্লোকে সম্পূর্ণ। হেষ্টিংস একজন সংস্কৃতে পারদর্শী মৌলবীকে দিয়ে এই গ্রন্থ ফার্সিভাষায় অনুবাদ করান। তারপর এই ফার্সি অনুবাদ গ্রন্থ ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করার জন্য তিনি ফার্সিভাষাভিজ্ঞ ইংরাজ ন্যাথানিয়েল ব্রেসি হ্যালহেডকে ভার দেন। হ্যালহেড অনুবাদ শেষ করে অনুবাদ গ্রন্থের নাম দেন—'A Code of Gentoo laws or Ordination of Pandits from a

Persian Translation.' ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থ ইংলণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।[৩৪] হেষ্টিংস এই গ্রন্থের এক খণ্ড লর্ড ম্যান্‌স্‌ফীলডকে উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দেন। গ্রন্থখানি যে মূল্যবান বলে ইংলণ্ডে আদৃত হয়েছিত, তার প্রমাণ—জন স্টুয়ার্ট মিলের 'History of British India' গ্রন্থের একটি অধ্যায় ('The Laws of the Hindus') এই গ্রন্থকে অবলম্বন করে লেখা। পরবর্তী কালে বাংলা দেশে যে সকল দেওয়ানী আইন বিধিবদ্ধ হয়, 'বিবাদার্ণবসেতু'তেই তার সূচনা হয়। ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন,—স্মার্ত রঘুনন্দনের পর এরকম গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিগ্রন্থ আর লেখা হয়নি।[৩৫] বাণেশ্বরের সহকর্মীরা যতদিন এই গ্রন্থরচনায় নিযুক্ত ছিলেন, ততদিন তাঁরা চতুষ্পাঠীর ব্যয়ের জন্য দৈনিক এক টাকা করে বৃত্তি পেতেন। গ্রন্থ রচনা শেষ হবার পরও যতদিন তাঁরা বেঁচে ছিলেন, ততদিন তাঁরা এই বৃত্তি পেয়েছিলেন।

৫। দেবিস্তোত্রম্ :

পণ্ডিত ৺শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি সর্বপ্রথম এই স্তোত্রটি আবিষ্কার করেন। তিনি তাঁর পঠদ্দশায় ১১০৬ সালের (খ্রী: ১৬৯৯) একখানি হাতের লেখা 'সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণের পুঁথির একটি পত্রে এই স্তোত্রটি লেখা আছে দেখেন। ঐ পত্রে 'দেবীস্তোত্রের ২০টি শ্লোক ছিল। ৺রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে রক্ষিত পুঁথিতে 'দেবীস্তোত্রে'র ৪৬টি শ্লোক ছিল। চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে শ্লোকটি খণ্ডিত। চক্রবর্তী মহাশয় ঐ ৪৬টি শ্লোক মূল, বাংলা অনুবাদ প্রয়োজনমত লুপ্ত অংশের সংযোজন সহ বর্ণাশুদ্ধি ও বিকৃত পাঠ সংশোধনান্তে 'শ্রীভারতী' পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৮ ও ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা চৈত্র ১৩৪৮) প্রকাশিত করেন।

৬। তারাস্তোত্রম্ :

এই খণ্ড কাব্যের পুথি ৺রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের কাশীস্থ গৃহে রক্ষিত ছিল। পুথিতে ৪২টি শ্লোক আছে। চক্রবর্তী মহাশয় পুঁথিতে লিখিত শ্লোকগুলির বর্ণাশুদ্ধি ও বিকৃতপাঠ সংশোধন এবং লুপ্ত অংশের সংযোজন করে সেগুলি বাংলা অনুবাদ ও পাদটীকা সহ 'শ্রীভারতী' পত্রিকায় (১ম বর্ষ ১৩৪৫, পৃ. ৪১৩-১৬, পৃ. ৪৬৩—৬৮) প্রকাশিত করেন। খণ্ড কাব্যটি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের মত গীতিচ্ছন্দে রচিত।

৭। শিবশতকম্ :

এই খণ্ড কাব্যের একখানি খণ্ডিত প্রতিলিপি পুঁথি ৺রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট রক্ষিত ছিল। এতে ৬০টি শ্লোক আছে। চক্রবর্তী মহাশয় পুঁথির বর্ণাশুদ্ধি ও বিকৃত পাঠ সংশোধন ও লুপ্ত অংশের সংযোজন করে শ্লোকগুলি বাংলা অনুবাদসহ 'শ্রীভারতী' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৫০, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৫০) প্রকাশিত করেন।

৮। হনুমৎস্তোত্রম্ঃ

এই খণ্ড কাব্যের একটি প্রতিলিপি পুঁথি ৺রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট রক্ষিত ছিল। পুঁথিতে ৫৫টি শ্লোক আছে। সম্ভবত: পুঁথিটি খণ্ডিত। চক্রবর্তী মহাশয় পুঁথির বর্ণাশুদ্ধি ও বিকৃত পাঠ সংশোধন করে এবং লুপ্ত অংশের সংযোজন করে শ্লোকগুলির বাংলা অনুবাদ ও পাদটীকা সহ মাসিক 'দেবযান' পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৭৪) প্রকাশিত করেন।

৯। কাশীশতকম্ঃ

১০০টি শ্লোকে সম্পূর্ণ এই খণ্ড কাব্যের একখানি প্রতিলিপি-পুঁথি ৺রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট রক্ষিত ছিল। চক্রবর্তী মহাশয় পুঁথির বর্ণাশুদ্ধি ও বিকৃত পাঠ সংশোধন এবং লুপ্ত অংশের সংযোজন করে বাংলা অনুবাদ ও পাদটীকা সহ শ্লোক-গুলি ধারাবাহিকভাবে মাসিক 'দেবযান' পত্রিকায় (মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৭৫, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৬) প্রকাশিত করেন। কাব্যের সমাপ্তি শ্লোক থেকে জানা যায়, ১৬৭৭ শকের (খ্রী: ১৭৫৫) ১৯ অগ্রহায়ণ, বুধবার এই খণ্ড কাব্য রচিত হয়।[৩৬]

চক্রবর্তী মহাশয় বাণেশ্বরের 'গঙ্গাস্তোত্রম্' নামে একটি খণ্ডকাব্যের উল্লেখ পান। কিন্তু এই কাব্যের পুঁথি অনাবিষ্কৃত। ননীগোপাল মজুমদার লিখেছেন—বর্ধমানরাজ চিত্রসেনের সভায় অবস্থানকালে বাণেশ্বর 'জগন্নাথমঙ্গল' নামে একখানি নাটক রচনা করেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থের পুঁথি দুর্লভ।[৩৭] ড: সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একখানি গ্রন্থে 'কালিদাস স্তোত্রম্' নামে বাণেশ্বরের একটি খণ্ড কাব্যের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার কোন পরিচয় দেন নি।[৩৮]

বাণেশ্বরের নামে বহু উদ্ভটশ্লোক আছে। এই সকল শ্লোকের অনেকগুলি পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগরের উদ্ভট সাগর[৩৯] এবং চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তর্করত্নের 'উদ্ভটচন্দ্রিকা'—এই দু'খানি কোষগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এছাড়া কালীময় ঘটকের 'দ্বিতীয় চরিতাষ্টকে' (২য় সং), ৩টি, রামচরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'চিত্রচম্পূ:'তে ২টি এবং ননীগোপাল মজুমদারের প্রবন্ধে[৪০] ২টি উদ্ভটশ্লোক মুদ্রিত হয়েছে।

পাদটীকাঃ

(১) ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় 'The Nadia Raj'-শীর্ষক প্রবন্ধে বাণেশ্বরের নাম ভুল করে "Bhumeswar Vidyalankar, an eminent poet" বলে লেখা হয়। মি: হাণ্টারও তাঁর 'Statistical Account of Bengal' (Vol. II) গ্রন্থে একই ভুল করেছেন।

(২) এই গবেষকদের মুখ্য হলেন গুপ্তিপাড়ার কাশীপ্রবাসী পণ্ডিত—জয়নারায়ণ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রামচরণ চক্রবর্তী (অধুনা স্বর্গত) মহাশয়। বস্তুত: এ যাবৎ

আবিষ্কৃত বাণেশ্বরের রচনাবলীর মধ্যে 'চিত্রচম্পূঃ' ছাড়া অন্যান্য সকল রচনার পুঁথিই তাঁহার আবিষ্কার।

(৩) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৯ : দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-কৃত 'বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও চট্ট শোভাকর বংশ' শীর্ষক প্রবন্ধ।

(৪) 'Selections from State Papers', Vol. II, p. 376 (উপরের ৩ নং পাদটীকায় উল্লেখিত প্রবন্ধ)। [ব্রাহ্মণ হলেও নন্দকুমারের ফাঁসি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নয় বলে বাণেশ্বর একটি ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন, এইরকম জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। এই জনশ্রুতি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সম্ভবতঃ, কারাগারে নন্দকুমারের আহার বিষয়ক এই ব্যবস্থা পত্রের কথাই বিকৃত হয়ে ঐ জনশ্রুতিতে পরিণত হয়।

(৫) কালীময় ঘটক, 'দ্বিতীয় চরিতাষ্টক' ২য় সং (১২৮০) পৃ. ৪।

(৬) "কচিন্নটতি ফেরুভির্হসতি ঘোর মুণ্ডাবলীং/জলন্তি কুলপা ভৃশং ভনন্তি ভাংকৃতিং ভৈরবী। সুরাসুর নতিং স্বয়ং নয়তি রৌতি সম্ভয়তাং/প্রসীদ গিরিবালিকে নিখিলপালিকে কালিকে।"

(৭) ননীগোপাল মজুমদার লিখেছেন (মাসিক 'বিজয়া' ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২১, 'কবি বাণেশ্বর'-শীর্ষক প্রবন্ধ)-গুপ্তিপাড়ার শৌণক বংশীয় রামগোপাল তর্কবাগীশের কাছে বাণেশ্বর পাঠ নেন, কিন্তু এ তথ্য ভুল, কারণ তিনি অন্যত্র (মাসিক 'ভারতবর্ষ', জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, 'গুপ্তপল্লীর পণ্ডিত সমাজ'-শীর্ষক প্রবন্ধ) লিখেছেন—রামগোপাল ১১২২ সনে (খ্রীঃ ১৭১৫) আকবর খাঁর কাছে ভূমিদান পান। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতানুসরণে বাণেশ্বরের জন্মকাল ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ (আঃ) ধরলে ১১২২ সনে তাঁর বয়স হয় ১৫ বছর। বাণেশ্বরের 'চন্দ্রাভিষেক' নাটকের (পুঁথি) একটি শ্লোক থেকে জানা যায়, বাণেশ্বর তাঁর পিতার কাছে অধ্যয়ন করেন।

[ক] "কিং তন্ন্যায়নয়াদিসূক্ষ্মসরণী দীক্ষ্যাতিদাক্ষ্যাদিভিঃ/সংপ্রোক্তো বৈরপরৈশ্চ সদ্গুণগণৈর্জাতস্তু তস্মিন্ কুলে। যত্রাশেষকলাবিলাসজলধির্বৈ দক্ষবারাংনিধি/বীর শ্রীযুক্ত চিত্রসেন বসুধাধীশোঽপ্যতি প্রেমবান্॥"—'চন্দ্রাভিষেক' (পুঁথি), প্রস্তাবনা ৪১ শ্লোক।

(৮) কালীময় ঘটক : 'দ্বিতীয় চরিতাষ্টক', ২য় সং (১২৮০)।

(৯) 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত'-মতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১৬৩২ শকাব্দের (খ্রীঃ ১৭১০) আষাঢ়ী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৫০ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৭২৮) দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের (খ্রীঃ ১৭১৯-৪৮) নিকট হ'তে রাজ্যাধিকার পান। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে কৃষ্ণচন্দ্রের অভিষেক কাল থেকে 'রাজেন্দ্রাব্দ'ও প্রবর্তিত হয়—"রাজপেয়ি—শ্রীমন্মহারাজ-রাজেন্দ্রাব্দাঃ পঞ্চাশৎ সংখ্যকাঃ ('ছন্দোদীপ' গ্রন্থের রচনাকাল— H.P.Sastri : Notices of Sans.MSS. III, 96). ১৭০০ শকাব্দ হইতে ৫০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৬৫০ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৭২৮) কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালের আরম্ভ।

[খ] কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাদশাহের নিকট থেকে 'রাজেন্দ্র' উপাধি পান। 'চাঁদরাণী' প্রণেতা বিপিনমোহন সেন বলেন ('চাঁদরাণী', ২য় সং, ১৩১৮, পৃ. ২০৯, পাদটীকা)। তিনি দিল্লীশ্বরের মোহরাঙ্কিত, 'রাজেন্দ্র'-উপাধিসূচক একখানি পুরাতন দলিল শোভাবাজার রাজবাড়ীতে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুরের কাছে দেখেছিলেন।

(১০) দীনেশচন্দ্র সেন : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ৮ম সং।

(১১) 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় (Vol. L IV) 'The Burdwan Raj' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল, চিত্রসেন ২ বছর রাজত্ব করেন। এটি ভুল, কারণ 'চন্দ্রাভিষেক' নাটকের লণ্ডনে রক্ষিত পুঁথির ভরতবাক্য এবং চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট রক্ষিত পুঁথির শেষপত্রের পুষ্পিকা থেকে জানা যায়, ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে চিত্রসেন জীবিত ছিলেন।

[গ] ২৭ নং পাদটীকা। [ঘ] ২৯ নং পাদটীকা।

(১২) কালীময় ঘটক : 'দ্বিতীয় চরিতাষ্টক, ২য় সং (১২৮০)।

(১৩) ননীগোপাল মজুমদার বলেন, (মাসিক ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 'গুপ্তপল্লীর পণ্ডিত-সমাজ'-শীর্ষক প্রবন্ধ), সম্ভবতঃ এই কারণেই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা বর্ণনায় বাণেশ্বরের নামোল্লেখ নেই। এই অনুমান ঠিক নয়, কারণ 'অন্নদামঙ্গলে'র রচনাকালে (খ্রী: ১৭৫২) বাণেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ছিলেন না, আলিবর্দীর সভায় ছিলেন।

(১৪) নিমন্ত্রণ পত্রটি উদ্ভটসাগরে বাণেশ্বর রচিত উদ্ভটশ্লোক হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে। পত্রটি এই—"খোদাপাদারবিন্দদ্বয়ভজনপরো মাতৃতাতো মদীয়/আলিবর্দী নবাবো বিবিধগুণযুতোহল্লামুখঃ পশ্চিমাস্যঃ। মর্ত্যং দেহং জহৌ স্বং মুনসরমুলকঃ সীরাজউদ্দৌলানামা/যাচেহহং মাং ভবন্তো গলধৃতবসনঃ শুদ্ধতাং সংনীয়স্তাম॥"

(১৫) "আলীবর্দী নবাবমপাস্য নবদ্বীপেশ্বরশ্রাশ্রিতং/তৎপশ্চান্নবকৃষ্ণভূপতিমমুং রে চিত্ত! বিত্তাশয়া। সর্বৈত্রেব নবেতিশব্দঘটিতং ত্বঞ্চেৎ কমালম্বসে/তদ্দেবং পরমার্থদং নবঘনশ্যামং কথং মুঞ্চসি॥"—বাণেশ্বর কৃত উদ্ভটশ্লোক ('উদ্ভটসাগর', ৩য় প্রবাহ, ১৪০ শ্লোক)।

(১৬) Nabakrishna's council of the learned was splendid as the names of two of the distinguished ornaments, Jagannath Tarka-Panchanon and Vaneswar Vidyalankar will indicate, and discussions in it were always encouarged by large presents to the wranglers."—Mookerji's Magazine, April 1851.

Also—See Ward's 'History of the Hindoos', vol. IV. p. 485

(১৭) His house was the favourite resort of men learning, his

Sabha of Pandit was pre-eminently the first in the land......It included men like Jagannath Tarka Panchanon, Vaneswar Vidyalankar, Radhakanta Tarkavagish, Sreekanta, Kamalakanta, Balaram and Sankar."—'Memoirs of Maharaj Nubkissen Bahadur, p.184.

(১৮) দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় : 'ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত', পৃ: ২৩০-৩২

(১৯) "শাকে কালাঙ্গতর্কৌষধিপতিগণিতে কার্তিকীয়ে দশাংশো। পূর্ণং শ্রীচিত্রচম্পূং ব্যতনুত দিবসে শ্রীল বাণেশ্বরাখ্যঃ।৬"—'চিত্রচম্পূঃ', (রামচরণ চক্রবর্তী স°), P. 89, sl. 267.

[৬] "Just Below this verse 'শকাব্দাঃ ১৬৬৬" has been put by the scribe".—p. 33 *ibid*

(২০) Ward's 'History of the Hindoos,' vol. II. p. 378

(২১) "Eggeling : I.O., p. 1543. [The No. of the MS. is 939 a. There are 6I foll. and its size is 12″×4″. The paper used is the yellow Country made variety. The handwriting resembles good modern Bengali handwriting. The MS. gives neither the date of the copy nor the name of the scribe". —CitraCampu (1940), edtd. by R. C. Chakraburtty. p. 32, 'Introduction."]

(২২) কলিকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ 'চিত্রচম্পূঃ'র একখানি প্রতিলিপি পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই পুঁথি দৃষ্টান্তে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য যদুনাথ সরকার, ড: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রবন্ধ লেখেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট 'চিত্রচম্পূঃ'র একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি পুঁথি ছিল। বর্তমানে উহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

(২৩) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩৫ ভাগ : চিন্তাহরণ চক্রবর্তী-কৃত 'বাংলার বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ'-শীর্ষক প্রবন্ধ।

(২৪) 'প্রবাসী' ১৩৩৮, ১ম খণ্ড, যদুনাথ সরকার কৃত "বর্গীর হাঙ্গামা" প্রবন্ধ।

(২৫) হরপ্রসাদ রচনাবলী (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স°), ১ম সম্ভার : "বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার"-শীর্ষক প্রবন্ধ।

(২৬) Tawney and Thomas : 'Catalogue of 2 collections of Sans. MSS. preserved in the I. O. Library', 1903, p. 38 (উপরের ৩নং পাদটীকায় উদ্ধৃত প্রবন্ধ।)

(২৭) শ্লোক যথা—"আস্তাং শস্যবতী সদা বসুমতী নীতিশ্চসংবর্ধতা/মীতি যাতু লয়ং বিপক্ষনিবহা যাতু ক্ষয়ং সর্বতঃ। দীর্ঘায়ুর্গুণ সাগরো জিত ধরাধীশাস্ত্র-জন্মনা কৃতং/ভূয়াদস্য সুদীর্ঘমায়ুরপি চ শ্রীচিত্রভূমিপতেঃ ॥"—লণ্ডনে রক্ষিত পুঁথির ভরতবাক্য।

(২৮) শ্লোক দুটি যথা—

"অপি চ

"নাস্মস্মান্তরণং কদাপি শরণং নান্যো বদান্যোঽস্তমে/নান্যেষাং পুরতোঽস্তু কাব্য কণিকোদ্গারোঽপি মে লিপ্সয়া। বৈদগ্ধ্যামৃতসারসিন্ধুলহরীসঞ্চারবর্যোত্তম—/স্ফূর্জৎ শীকরসূক্ষ্মতত্ত্ববিদুষঃ শ্রীচিত্রসেনান্নৃপাৎ॥"

"অপি চ

"ধীরঃ শ্রীচিত্রসেনঃ ক্ষিতিপতি তিলকঃ শ্রীলমাণিক্যচন্দ্রো/মন্ত্রিস্তোমাগ্রগণ্য-স্তদুভয়মিলনং রত্নহেমাভিষঙ্গঃ। আস্তাংভূভূষণায় প্রকটিত মহাপুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রৈঃ/স্ফূর্জদ্দীপ্তিশ্চিরায় প্রথয়তু পরমং কীর্তিকর্পূরপূরম্॥ (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

ইতি চন্দ্রাভিষেকো-নাম সপ্তমোঽঙ্কঃ। সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।"—রামচরণ চক্রবর্তীর গৃহে রক্ষিত পুঁথির শেষ পত্র।

(২৯) "ধ্যাত্বা শ্রীরামচন্দ্রং সহ জানকীসুত লক্ষণাভ্যাং প্রযত্না—/দাজ্ঞামাজ্ঞায় রাজ্ঞামপি মুকুটমণেশ্চিত্রসেনাহ্বয়স্য। শাকে কালাঙ্গতর্কৌষধিপতিগণিতে চৈত্রিকীয়ে দশাংশে/পূর্ণং চন্দ্রাভিষেকং বাতনুত দিবসে শ্রীলবাণেশ্বরাখ্যঃ॥ শ্রীরামনিধি শর্মণা লিখিত মিদং চতুর্হস্তায়।"—ঐ

(৩০) Eggeling : I. O. Library Catalogue. pp. 1446-48 (উপরের ৩নং পাদটীকায় উদ্ধৃত প্রবন্ধ।)

(৩১) "শ্রীগুপ্তপল্লীনগরী নিকেতঃ/কৃপাকণার্থী পরদেবতায়াঃ। শ্রীমৎ কৃপারাম সমাহ্বয়ৎ/ঘোষান্বয়েন্দোর্বচনেন সাধোঃ॥ তেনে রহস্যামৃতনামধেয়ং দিব্যং মহাকাব্য-মিদং মহার্থম্। মহানুভাবাঃ পরিশোধয়ন্তু/মহানুকম্পাম্বুধয়ো বুধেন্দ্রাঃ॥৩০॥ ইতি রহস্যামৃতমহাকাব্যে ত্রৈলোক্যরাজ্যে অচ্যুতোভিষেকো নাম বিংশতিতমঃ সর্গঃ।" —রামচরণ চক্রবর্তীর গৃহে রক্ষিত পুথির পুষ্পিকা।

(৩২) "ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায় শ্রীলশ্রীযুত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য বিরচিতং রহস্যামৃতং নাম মহাকাব্যং সমাপ্তম্॥ ০॥ লিখিতং শ্রীরামশঙ্কর শর্মণা শ্রীরামং শ্রীদুর্গাশহায়ী শকাব্দাঃ ১(৬)২৫"—ঐ পুঁথির ৫৩ পত্র।

(৩৩) Ward's 'History of the Hindoos,' vol. 1. IV, p. 485

(৩৪) Dr. H. P. Sastri : 'Notices of Sans. MSS.' vol. I, No. 335. Also—The first impulse to the study of Sanskrit was given by the practical administrative needs of our Indian possessions. Warren Hastings at that time Governor[৮] clearly seeing the advantage of ruling the Hindus as far as possible according to their own laws and customs caused a number of Brahmans to prepare a digest based on the best ancient legal authorities. An

English version of this Sanskrit compilation, made through the medium of a Persian translation, was published in 1776." —Macdonell: 'History of Sanskrit Literature', (London), p. 2. Also—See 'Bibliographical Notes.'

[চ] হেষ্টিংস যখন ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিবাদার্ণবসেতু রচনার জন্ম ১১জন পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন, তখন তিনি গভর্ণর জেনারেল ছিলেন না, বাংলার গবর্ণর ছিলেন। গ্রন্থ রচনা সমাপ্তিকালে (খ্রী: ১৭৭৫) এবং উহার ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশকালে (খ্রী: ১৭৭৬) অবশ্য তিনি গভর্ণর জেনারেল ছিলেন।

(৩৫) "Of the Sanskrit works subsequent to Raghunandan, the most important is Vivadarnava-Setu by eleven Pandits from various parts of Bengal under order of Warren Hastings when he was Governor of Bengal and not yet Governor-General."—Dr. H. P. Sastri: 'Notices of Sans. MSS. Bengal, vol. I, preface xiii.

(৩৬) "শাকে দ্বীপর্ষিরাগক্ষিতিপতিগণিতে মার্গশীর্ষস্থ মাসঃ/সৌরস্যৈ কোন বিংশহহনি বুধদিবসে সার্ধযামান্তরালে। সম্পূর্ণং শ্রীকাশীশতকমতিতরাং কাতরত্বাদ্ বিয়োগাদ্/ভক্ত্যাযত্নেন তেনে দ্বিজবরতনয়ঃ শ্রীলবাণেশ্বরাখ্যঃ ॥ ১০১ ॥"—মাসিক 'দেবযান' আষাঢ় ১৩৭৬, পৃ. ১০৩ : রামচরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'কাশীশতকম্'।

(৩৭) মাসিক বিজয়া ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা কাতিক ১৩২১ : ননীগোপাল মজুমদার-কৃত 'কবি বাণেশ্বর'-শীর্ষক প্রবন্ধ।

(৩৮) ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: 'সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান' (১৩৬২) পৃ. ১০৯।

(৩৯) 'উদ্ভটসাগরে'র ৩য় প্রবাহে ৩৫ শ্লোকের পর ৩৬ সংখ্যক শ্লোকটি ("যেষাং শ্রীমদ্‌যশোদাসুত পদকমলে" ইত্যাদি) বাণেশ্বরের রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুতঃ ইহা বাণেশ্বরের রচনা নয়। শ্লোকটি রাধানাথ কাবাসীর 'শ্রীশ্রীবৃহৎভক্তিতত্ত্বসার' নামের সংকলনগ্রন্থে (১ম খণ্ড, চৈতন্যাব্দ ৪৪৯, পৃ. ৫৯২) মুদ্রিত হয়েছে এবং শ্লোকটি কিছু ভিন্নরূপে শ্রীধর স্বামীর 'ব্রজবিহার স্তোত্রে'র অংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে—"যথা হি শ্রীধর স্বামীকৃত ব্রজবিহার স্তোত্রে—'যেষাং' ইত্যাদি।"

(৪০) মাসিক 'বিজয়া', কার্ত্তিক ১৩২১ : 'কবি বাণেশ্বর'-শীর্ষক প্রবন্ধ।

কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলে কৃষ্ণকথা

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

কবি কৃষ্ণরাম দাস (১৭শ শতক) তাঁর 'কালিকামঙ্গলে'র অষ্টমঙ্গলায় লিখেছেন—

গোকুল ছাড়িয়া কৃষ্ণ মথুরায় বাস।
কংসবধ করি বাপ মায়ের খালাস॥ (কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী পৃ. ১৪১)

কালিকামঙ্গলে কৃষ্ণকথার উল্লেখ স্বভাবতই আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সম্প্রতি ২৪ পরগণার মগরাহাট অঞ্চল থেকে কৃষ্ণরাম দাসের একটি 'কৃষ্ণমঙ্গল' বা কংসবধ পালার পুঁথি পাওয়া গেছে। ছোট পুঁথি ১-১০ পত্র, আকার ১৩×৪½ ইঞ্চি, তুলট কাগজে লেখা, ১২টি পদে পুঁথি সম্পূর্ণ। পুঁষ্পিকা—'ইতি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পালা সমাপ্ত। সকাব্দা ১৬৭৫। সন ১১৬১ রোজ বৃহস্পতিবার। তারিখ ৭ শ্রাবণ। শ্রীমুক্তারাম গুঞি তাহার এ পুস্তক।' পুঁথির শেষভাগে বিদ্যার উল্লেখ দেখে পুঁথিখানি কবির কালিকামঙ্গলেরই অংশ বলে আমাদের সন্দেহ জন্মেছে। হয়তো কালিকামঙ্গল রচনার পর বৈষ্ণবদের মনস্তুষ্টির জন্য কবি সেখানে কৃষ্ণকথা সংযুক্ত করেন। কেননা গ্রন্থের আরম্ভে গ্রন্থ পরিচয়ে কৃষ্ণকথার কোন উল্লেখ নেই।

আলোচ্য পুঁথিতে কবির ভণিতা—

কলিতে কালের ভয়   কাতর কায়েতে কয়
কৃপা কর কৃষ্ণরাম দাসে॥ ৭ক পত্র।

অথবা,   নিমিতা গ্রামেতে বাস   ভণে কৃষ্ণরাম দাস
মনে অই দুখানি চরণ॥ ৯খ পত্র।

এখন পুঁথিটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই। কংস দৈববাণী শুনলেন যে, গোকুলবিহারী কৃষ্ণ তাঁর প্রাণনাশ করবেন। নারদ মুনির পরামর্শে কংস ধনুর্যজ্ঞ সুরু করলেন। কৃষ্ণ-বলরামকে আনবার জন্য গোকুলে অক্রূরকে পাঠান হল এবং নন্দকেও কর নিয়ে মথুরায় হাজির হবার নির্দেশ গেল। কৃষ্ণ মনে করলেন—

পুত্রবর লোকে লয়   পরিণামে ভাল হয়
তাহাতে বন্ধন বিপরীত।
অপত্য যতেক আগে   মারিল আমার পাকে
অপযশ অখিল বিদিত॥
মারিয়া প্রবল পাপ   ঘুচাব সকল তাপ
বাপ মার পরম পীরিতি।
পালিব সুজনগণ   দহিয়া দুর্জন বন
পণ এই পুরাই সম্প্রতি॥ ৩খ

মথুরাগমনের জন্য নন্দ প্রস্তুত হলেন, কিন্তু কৃষ্ণের মথুরাযাত্রার সংবাদে গোপীগণের মাথায় বাজ পড়ল।

শিরে যেন বাজ পড়ে মহানন্দে ভরা বুড়ে
উচ্চ গাছে পিছলিল পা। ৪ক

যশোদাও ব্যাকুল হলেন।

আর না আসিবে হেথা ভাবে দড়াইল।
অতি বেগে গতি যেন হাতী বড়াইল॥ ৪খ

আক্ষেপ প্রকাশ করে বললেন—

বন্ধ্যা হয়্যা থাকে যদি ভাল বলি তায়।
হয়্যা যে দারুণ পীড়া একি সহা যায়॥ ৫ক

মাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ নন্দগোপাদিসহ রথে আরোহণ করলেন। গোকুলের চাঁদ গোকুল ছেড়ে চলে যায় দেখে গোপীকুলে হাহাকার পড়ল। তাদের মধ্যে কেউ বললে—

কাল জল যমুনার নিকট না যাব আর
না চাইব কালা মেঘ পানে।
কালিয়া কানুর কথা দারুণ প্রসঙ্গ যথা
হাত দিয়া রব দুই কানে॥ ৭ক

কিন্তু রাধা কি করলেন?

সর্ব্ব পাছে ঠাকুরাণী ঠাকুরের মুখখানি
নিরখি আছয়ে এক দৃষ্টি॥ ঐ

মথুরার পথে রথ নিষ্ক্রান্ত হল। সেখানে সন্ধ্যায় কৃষ্ণ-বলরাম নগর ভ্রমণে বের হলেন। এক রজককে মেরে 'চিকন বাস' কেড়ে নিয়ে দু'ভাই বেশভূষা করে নিলেন অন্যদিকে—

অসীম সুষমাশালী ভক্ত-মনোরথ পালি
বনমালী মালীর ভবন।
কুবজা হইল প্রজা পুণ্যে করে পাদপূজা
পথে পায়্যা পতিতপাবন॥ ৮ক

রাত্রি প্রভাত হল। কৃষ্ণ-বলরাম মথুরার গড়ে প্রবেশ করলেন। এখানেই যজ্ঞ-শালা এবং মহাধনু অবস্থিত। কৃষ্ণ ধনুটি আকর্ষণ করলেন।

তুলি বাম করে ধরি ইক্ষুদণ্ড যেন করি
মাঝে ভাঙ্গি পরম কৌতুক॥ ৮ক

সমগ্র মথুরাপুরী কেঁপে উঠল। কৃষ্ণ ধীরে ধীরে পুরী প্রবেশ করলেন। দ্বারে কুবলয় হাতীকে বিনাশ করলেন। চাণুর ও মুষ্টিকও নিহত হল।

নাচে হরি নটবর　　　সঙ্গে সখা সহোদর
শঙ্খ বাজে দুন্দুভি খতেক।
হুলাহুলি জয় জয়　　　পুষ্প বরিষণ হয়
সুরধুনী ধারা অভিষেক ॥ ৯ক

ক্রোধান্ধ কংস আদেশ দিলেন, নন্দঘোষের সর্বস্ব লুট কর, গোকুল পুড়িয়ে দাও।

দন্ত কড়মড়ি আট　　　বসুদেবা আদি কাট
পশু যেন বলিদান করে।
আগে উগ্রসেন বুঢ়া　　　পর্বতপ্রমাণ চূড়া
প্রহারে পাঠাও যমঘরে ॥ ৯ক-খ

কৃষ্ণের আর সহ্য হল না। তরবারি হাতে মঞ্চের উপর লাফিয়ে পড়লেন।

মঞ্চে উঠি মথুরেশ　　　ধরিয়া কুটিল কেশ
পাড়িয়া পড়িলা চাপ দিয়া।
মরে মুখে রক্ত উঠি　　　বেগে ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
তেজালয় পায় তায় গিয়া ॥ ৯খ

কৃষ্ণ কংসবধ করলেন। তারপর দুভাই কারাগারে গিয়ে দেবকী বসুদেবের বন্ধন-মোচন করলেন। নন্দ তো হতবাক। কৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়ে গোপগণের সঙ্গে গোকুলে পাঠিয়ে দিলেন।

এই কাহিনীটিই বিদ্যার সখী বিদ্যাকে বলে তার মনে সাহস সঞ্চার করেছিল।

বিদ্যার সখীর স্বর　　　পাপ দুঃখ দূরতর
শুনিয়া মনের ঘুচে দ্বন্দ্ব ॥ ১০খ

কংসবধ পালার কোন কোন অংশ আমাদের আকর্ষণ করে। যেমন কৃষ্ণের বর্ণনা—

তরুণ তমাল তনু তিমির উজ্জ্বল।
অরুণ নয়ন দুটি ভ্রূকুটি কজ্জল ॥
মালতী মোহন মালা বেড়ল চূড়ায়।
ময়ূরের পাখ মন্দ পবনে উড়ায় ॥
দেখিতে আঁখির সুখ সে মুখ ঝলক।
অহঙ্কার চূর্ণ পূর্ণ চাঁদের চমক ॥
সুধাবৃন্দ নিন্দি মন্দ মকুন্দের হাসি।
কহ দেখি কার চিত্ত না লয় গরাসি ॥ ৫খ

কবির অনায়াস অনুপ্রাস আমাদের চিত্তে রসের সঞ্চার করে।

গোঠেতে গোধন সঙ্গ গোধূলিভূষিত অঙ্গ
রঙ্গরসে নীল পীতাম্বর।
চিকন মুখের আগে চাঁদের চমক লাগে
চাহনি চঞ্চল চিত্তহর॥ ৩খ

দু'একটি উপমাও মন্দ নয়। যথা—

পথে যেন সূত্রছিঁড়া মুকুতার মাল। ৬ক

কিংবা, উদয় কালের চাঁদ মেঘে গিলে আধা। ৭খ

দুঃখের বিষয়, কৃষ্ণরামের কোন কাব্যই আমরা অখণ্ডিত আকারে পাইনি। তাঁর কাব্যের ব্যাপক অনুসন্ধান প্রয়োজন।

'মদন পালা'

সম্পাদনা—অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী

['মদনপালা' একটি দুষ্প্রাপ্য পুঁথি। তুলোট কাগজে হাতে লেখা এই পুঁথিটি আছে কলিকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র পুঁথি সংগ্রহশালায়। নং ৯৩৪। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১ থেকে ১৭ পর্যন্ত। মাপ আনুমানিক ১´ ফুট × ৪´´ ইঞ্চি। প্রথম ও শেষ দিকের অনেক পৃষ্ঠাই একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন। সমগ্র পুঁথিটির অবস্থা অতিশয় জীর্ণ। অনুমিত হয়, এর আয়ু আর বেশী দিন নেই। পাঠোদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন; ততোধিক কঠিন অক্ষরগুলিকে চেনা। একেকটি শব্দকে নিয়ে বহুক্ষণ ধৈর্য ধরে ভাবতে হয়। তথাপি সমগ্র শব্দের অর্থ উদ্ধার করা যায় নি। সেই অনুদ্ধারিত শব্দের পাশে "?" এই প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেওয়া হইল। যে স্থানগুলি কীট-দষ্ট বা ছিন্ন, সেখানে '× ×' এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হইল। উল্লেখ্য যে, সেকালে 'ল' অক্ষর লেখা হতো দন্ত্য ন-এর মতো করে এবং তলায় একটা ফুটকি দেওয়া হতো; যথা—'.ন'। অনেক শব্দের সঙ্গে ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণাঞ্চলের উপভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়; যেমন আউলে (আউলিয়া), তিন মুনি (তিন মনের), ছকিয়ে (শুকিয়ে), ইংশেল (ইরশাল), বেটে চোত (অশ্লীলগালি বিশেষ) প্রভৃতি। পুঁথির মধ্যে 'বলি তোমার তরে' বা 'বলি তোমার কাছে'—বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলি এই জেলার দক্ষিণাঞ্চলে গীত পীর-গাজী সম্পর্কিত পালাগানে (লোকসঙ্গীতে)ও শোনা যায়। অনেক স্থানে পঙ্‌ক্তি-গুলি পারম্পর্যহীন। সেজন্য [ ] এইরূপ বন্ধনীর মধ্যে অর্থবোধাত্মক নির্দেশিকা দেওয়া রইল। পুঁথিতে তিন ব্যক্তির হস্তাক্ষর স্পষ্ট বোঝা যায়। বানানে অশুদ্ধি বিস্তর এবং পুনরুক্তি দোষও আছে। যা লেখা আছে, হুবহু তাই মুদ্রিত হলো। কেবল অর্থবোধের জন্য পাদটীকায় দুর্বোধ্য শব্দগুলির অর্থ দেওয়া রইলো। অধিকাংশ অর্থ রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' (১৩৮০) থেকে নেওয়া হয়েছে।

পুঁথি-রচয়িতার নাম ও রচনাকাল জানা যায়নি। তবে পুঁথির মধ্যে এক স্থানে লেখা আছে—'সন্তষ রায়চৌধুরির লোক তোমরা জান নাই।' এই সন্তোষ রায় চৌধুরী যদি বঁড়িশার বিখ্যাত জমিদার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের হন (যার অপর নাম ছিল শিবদেব), তা'হলে বলতে হয়, এই পুঁথি অবশ্যই খ্রীঃ ১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে রচিত হয় নি। কারণ তাঁর (সন্তোষ রায়চৌধুরী) জন্ম খ্রীঃ ১৭১০ অব্দে ও মৃত্যু ১৭৯০। (এই সন্তোষ রায়চৌধুরীই শেষ জীবনে রাজা বসন্ত রায় প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার বিখ্যাত পীঠস্থান কালীঘাটের মন্দির ভেঙে বর্তমান মন্দিরের নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন ও তাঁর মৃত্যুর পর ১৮০৯ সালে এই মন্দির সম্পূর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত হয়)।

এই পুঁথির কেন্দ্রীয় পুরুষ রাজা মদনমোহন দত্ত। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। 'রায়' উপাধি সম্ভবতঃ ঢাকার নবাব শায়েস্তা খাঁ (খ্রীঃ ১৬৬৪-৮৬) কর্তৃক প্রদত্ত। পরবর্তীকালে এঁর বংশধরেরা 'রায়চৌধুরী' উপাধি লাভ করেন। মদন রায়ের বাসস্থান ছিল, বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত সোনারপুর থানার মধ্যে মেদনমল্ল পরগণার রাজপুর গ্রামে। এই রাজার নামানুসারেই এই গ্রামের ঐ নাম হয়। রাজপুর গ্রামের ঈশান কোণে গড়খাত ঘেরা তাঁর প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, নাটমন্দিরের ভিত্তিভূমি ও বংশধর দুর্গাচরণ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত দেবী আনন্দময়ীর (কালিকা) জীর্ণ মন্দির অদ্যাপি বর্তমান। মদন রায়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রাজা রাজবল্লভ রায় পূর্বোক্ত দেবীকে রাজপুর গ্রাম থেকে নিয়ে গিয়ে এই জেলার বারুইপুরে ১৮শ শতকের শেষার্ধে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে তাঁর বংশধরগণ 'বারুইপুরের জমিদার' নামে আখ্যাত হন।

কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, মদন রায়ের নামানুসারেই এই পরগণার নাম 'মেদন মল্ল' হয়েছে। তিনি ছিলেন যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের (১৫৫৮-১৬০৮/১০) বন্ধু ও সেনানায়ক এবং তাঁর কাছ থেকে 'মল্ল' উপাধি পান। কিন্তু এই তথ্যটি সর্বৈব ভ্রান্ত। কারণ, 'মল্ল' উপাধি প্রাপ্ত মদন মোহন ছিলেন মিত্র বংশীয় আর ইনি হলেন দত্ত বংশীয়। আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে যথা ;—নবাব শায়েস্তা খাঁর (ঢাকার নবাব ছিলেন ১৬৬৪-৮৬) সমসাময়িক আমাদের আলোচ্য মদন রায়ের নামানুসারে যদি এই পরগণার নাম মেদন মল্ল হয়, তাহলে প্রায় ৯০ বৎসর পূর্বে খ্রীঃ ১৫৯৬ অব্দে রচিত আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরীতে' এই পরগণার নাম (মেদিনামল) থাকে কেমন ক'রে এবং তারও পূর্বে কবিকংকণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর (খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে) সুবিখ্যাত 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে', জগন্নাথ দর্শন ও ধনপতির স্বদেশ যাত্রা প্রসঙ্গে এই পরগণার নামোল্লেখ ('দক্ষিণে মদনমল্ল বামে বিরখানা') থাকে কেমন করে ? আসলে এই পরগণার নামোৎপত্তির ইতিহাস আজও অনুদ্‌ঘাটিত।

পুঁথির মধ্যে কোন কোন শব্দের পাশে সংখ্যায় ২ লেখা আছে। তার অর্থ শব্দটি দু'বার উচ্চারিত হয়েছে ; যথা—জোড়া ২ = জোড়া জোড়া। পুঁথির প্রারম্ভে "শ্রীশ্রীকালী সহায়" লেখা থাকায় অনুমিত হয়, লেখক হিন্দু ছিলেন।

এই মদন রায়ের নামোল্লেখ আছে, সন ১৩৩৫ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১ম সংখ্যার ৩১ পৃষ্ঠায় প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সংকলিত 'গাজী সাহেবের গানে', এই জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত হরিণাভী গ্রাম নিবাসী কবি কেশরী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের—'হরপার্বতী মঙ্গলকাব্যে' (মুদ্রিত) ও কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল কাব্যে' (১৬৮৬) ; এই কাব্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ও সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত। কেবল এই পুঁথিটি অদ্যাপি অপ্রকাশিত। এটি মুদ্রিত হলে ইতিহাসের কয়েকটি অন্ধকার দিক আলোকিত হবে।

পুঁথিটির উপজীব্য বিষয় হলো,—ঢাকার নবাব-সরকারে রাজা মদন রায়ের তিন বৎসরের দেয় রাজস্ব বাকী পড়লে, রাজা নবাব সৈন্যদের দ্বারা রাজপুর গ্রামের নিজ বাটীতে ধৃত হন। তখন মন্ত্রী ফরিদ নস্করের কাছে পরিজ্ঞাত হয়ে পরিত্রাণের আশায় বর্তমান ক্যানিং থানার অন্তর্গত 'ঘুটিয়ারী শরিফ' নামক রেলওয়ে স্টেশনের কাছে বাঁশড়ার পীর মোবারক গাজীর কাছে যান এবং গাজী সাহেব রাজার আকুল প্রার্থনায় কৃপাবিষ্ট হয়ে রাজাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর রাজাকে ঢাকায় নবাব সকাশে যাবার পরামর্শ দিয়ে স্বয়ং একদিন উপস্থিত হ'য়ে নবাব শায়েস্তা খাঁকে রাজাকে ঋণ মুক্ত করার আদেশ দেন। রাজা কেবল ঋণমুক্তি নয়, কিছু জমিদারীও লাভ করেন। রাজা কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ ঘুটিয়ারীতে তাঁর জন্য বিরাট মসজিদ নির্মাণ করে দেন (সে মসজিদ অদ্যাপি বর্তমান)। এই হলো ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার। রাজা মদন রায়ের ঘুটিয়ারী শরীফে বা ঢাকায় যাওয়া আসার পথের বর্ণনায় তৎকালীন কিছু রাজপথ ও গ্রামের নাম পাওয়া যায়, যাহা ইতিহাস রচনার কাজে লাগতে পারে। আর আছে পীর মোবারক গাজীর জীবনের কিছু পরিচয়। মোবারককে কখনও 'মামারা' কখনও 'মামারক' নামে পুঁথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে রাজা মদন রায়ই এখানে মুখ্য পুরুষ। 'মদন পালা' বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান্ দলীলরূপে গণ্য হবে ব'লে বিশ্বাস করি। এঁদের সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মৎপ্রণীত 'ঘুটিয়ারী শরীফের পীর মোবারক গাজী।' 'আত্মীয় সভা' পত্রিকা মে-আগষ্ট, ১৯৭৬ ও শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭৭ দ্রষ্টব্য।

মূল পুঁথি।

"শ্রীশ্রীকালী সহায়"।

"ঘুটুরেতে বসে গাজাতল আকাটায় (?)
নবাব সারিস্তে খা[১] এসেচে ঢাকায়;
ঢাকার কোটেতে[২] এসে নবাব বসিল;
বারোভূমে জমিদার সব মজাইএ নিল[৩];
ঢাকা কোটে নবাব বসে নাম সারিস্তে খা[১]
ইনসাব আদালত নবাব কিছু করে না;
জমিদার মাজি এ[৪] নবাব অনেকেই খতি[৫]
তজবিজ তক্ষ নাই (?)
নাই তার পায় নাগায়[৬] বেড়ী;
বারোভূমে জমিদার কে বন্ধ খেনা দিল (?)

মেদন মল্যের[৭] কাগচ[৮] নবাব দেখিতে নাগেল[৯] ;
দপ্তর কুলে রোকতুলে[১০] নবাব করে লেখা জোখা ;
মদন রায়[১১] বাকী দেখে তিন খুনী[১২] টাকা।

[এরপর অন্য হাতের লেখা]

রাজা বলে এমত কালে এখানে আছে কে ;
উকিলকে আনি এ দরবারে হাজির করে দে ॥
এচাই[১৩] হুকুম জখন[১৪] নবাব আউলে[১৫] করিলো ; ।
লান খাঁ[১৬] নামেতে পেএদা[১৭] তখন উটে[১৮] খাড়া হইল ; ।
জামা জোড়া পেদে মঙ্গ (?) পিট[১৯] পরে চাল[২০] : ।
দেখিতে অদভুত অস্তি[২১] দোম আকে নাম ; : ॥ (?)
নবাবি দস্ত মঞ্জবা দিলো (?) মাথায় : ।
উকিলকে আনিতে শেই[২২] ধাউড়ে[২৩] চলে জায়[২৪] ।
মদন রায়ের উকিল দেখে বাশাবাড়ি[২৫] ছিলো ; ।
নবাবে ধাউড়ে এশে[২৬] তথা পৈছিলো : ॥ কিশোর[২৭] ;
ধাউড়ে বলিছে মেরা ; খুন[২৮] মেরা রায় ; ॥
মোর তলব হয়েছে তোরা হাজির এশে হয় ; ।
প্রাণ উতে [২৯] গেলো উকিলের করে হায় ২ ; ॥
এতদিনে পরে হলো বুঝি নাবাব আনার[৩০] দায় ; ॥
প্রাণ হাতে করি উকিল দরবারেতে জায়[৩১] ; ।
নবাবের সামেনে[৩২] এনে খাড়া[৩৩] করে দেয় ; ॥
নবাব বলে কিশের উকিলে করো নাম তোমার কি ।
তিনখুনি খাজনা কেন হুজুরে এনো নি[৩৪] ; ॥
উকিল বলে নবাব সাএব[৩৫] ধরি তোমার পা ; ।
তিন শেনে[৩৬] মেদনমল্য ধান্যা হয় না ; ॥
দানা[৩৭] বিনে মেদনমল্য প্রজা ছকি এ[৩৮] মনো: ॥
তেকারোনে খাজনা তোমার হুজুরে না এনো: ॥
নবাব বলে এমত কালে এখানে আছে কে ; ।
ওশিরা করিএ খজেনা মায়াইয়ে দে[৩৯] ; ॥

[এরপর বলা হচ্ছে, ঢাকার নবাবের আদেশে তাঁর সৈন্যরা আসছে এই জেলার অধুনা সোনারপুর থানার অন্তর্গত পূর্বোক্ত রাজপুর গ্রামে রাজা মদন রায়ের বাড়ীতে। এই গ্রামের পথে কিছু পথিকের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। সৈন্যরা যখন পথিকদের মুখ থেকে শুনলো যে, মদন রায়ের তারা কেউ নয়, সন্তোষ রায় চৌধুরীর কাছারীতে

খাজনা আদায় দিয়ে যে যার ঘরে ফিরছে, তখন সৈন্যরা তাদের আর কিছু বললো না……… ইত্যাদি]

চালিয়াত[40] বলে মেরা[41] খুন ফরমাণী[42]।
কোনৌ[43] জমিদারের লোক তেরা[44] কও দেখি শুনি[45];।
মন্তন[46] পরে বলিছে বাবা শুন মেরা × ×
সন্তষ রায় চৌধুরির[47] লোক তোমরা জান নাই;।
খাজনা করিয়া মোরা জাইতেছি[48] ঘরে;
ইরশেল[49] মারিয়া নেমে কি রাহার[50] উপরে।
ওব[51] খবর পাঠাইয়া দিবো নবাবের দরবারে।

[ঢাকার কারাগারে বন্দী জমিদারদের শাস্তিদানের বাস্তব চিত্র]

কারু[52] ২ কেলে[53] রেখেছ সিংহমাছের গাড়ি[54];
পিষ্ঠ ডলে মোরে[55] বেতের বাড়ি;
অই রায় বেত্র আছে দুটি দন্ত করে জোড়া[57];
যেদন মল্যের কাগচ[58] × × তো করে নাড়া চাড়া।
× × ×
মদন রায়ের বাকী দেখে তিন শোনে[59] টাকা;
বাকী দেখে আগুন জলে[60] নাবাব[61] আউলের[62] গায়।
× × ×
মদন রায়চৌধুরী বাড়ি মোকাম রাজপুরে।
শুন শুন নবাব শএেব[62] শুন মোর বাণি[63]।
মদন রায়ের বাসাবাড়ি[64] উকিল[64] আছে হুকুম হ'তো আনি
× × ×
ধাউড়ে[23] বলিছে মেরা × × ন মেরা বায়।
জোর তলব হয়েছো তোরা হাজির এশে[65] হয়।
× × ×
রাজা মদন রায়ের × × ×

[নবাব সৈন্যরা রাজপুর গ্রামে মদন রায়ের প্রাসাদের অতি নিকটে এসেছে]

রাজপুর নিজবাটী আছে[66] এ পৌউছিল।
× × ×
ফরিদ নস্কর[67] মহেশ ঘোষ[68] রহিলেন আর রাজা মদন রায়।
এখানে কালে কালে[69] হাকে ডাকে ঘোড়া নাহি পায় বাট।
ধুলা ওড়াইয়া আসে রাস্তার মাটি।
বরুকে[70] আগুন দিলে ধঞে[71] অন্দকার[72]।
হাতে ছিল বাজ—বৈরি[73] করে তো শিকার।
বরুকে[70] আগুন দিলে ঘোড়ার চেচানি[74]।

[মদন রায়ের প্রাসাদে]

সিংদরজায়[৭৫] হলো জেন[৭৬] কম্পিত মেদিনী ॥
আসিয়া মদন রায়ে × × মারে হুড়ো।
ঘরহে থাকি বেরো বেটে চোত[৭৭] মদন রায় বুড়ো
হুড়াহুড়ি গালাগালি দরজা পরে দেয়।
ফরিদ নস্কর মহেশ ঘোষ[৭৮] তুইজনে এসে হাজির হয়।
বাকি এত টাকা এে (?) তোয়ে দারাকের উপরে (?)।
জোড়া ২ মারে বেত পিঠের উপরে ॥
ফরিদ নস্কর কেঁদে বলে 'চলিয়াত' বা২[৭৮] ধরি তোমার পায়।
মিনি[৭৯] অপরাধে আমাদের খুন করো নাই।
চালিয়াতগণ[৪০] বলিচে বেটা পণ ফরমালি[৮০]।
জমিদার কাহাশে[৮১] তেরা জলদি হাজির কর আনি।
ফরিদ নস্কর বলিছে চলিয়াত[৪০] বলি তোমার তরে।
জমিদার গিয়াছে মোদের দক্ষিণ হেথে গড়ে[৮২]।
চালিয়াত[৪০] বলিচেন বিটিচোত[৭৭] যুন ফরমান[৪২]।
তরায়[৮৩] করে পাঁচশ টাকা কোমর থশহি আন[৮৪] ;।
ফরিদ নস্কর বলে দুই জোনা[৮৫] বান্দা রহিলেম তোমার কাছে।

× × ×

যুন ২[২৮] ওরে কাবিলে[৮৬] আপন ভালাই জদি চায়[৮৭]।
তরায়[৮৩] করে দরবারে তারে হাজির করে দেয় ॥

[মদন রায়ের প্রতি মন্ত্রী ফরিদ নস্করের উক্তি]

কি কারণে করো পূজন সেই আনন্দমঠ[৮৮]।
কেদো না কেদো না[৮৯] মহারাজ মন করো স্থির।
তোমার ঘুটুরির জঙ্গলে[৯০] এসেছেন মামারক পীর[৯১] ॥

[মদন রায় বলছেন]

নতুম নবাব এসেছে তার নাম সারিস্তে খা[১]।
জমিদার বলে তোমার সঙ্গে মোরা যাব।
গাজি মিয়ার রাঙ্গাচরণ দেখিয়া আসিব।

[পীর মোবারক গাজির উদ্দেশে মদন রায়ের ঘুটিয়ারী শরীফে যাত্রা]

রাজপুর নিজ বাটি পশ্চাতো করি এ।
পেতক্ষীর[৯২] মহারাজ উত্তরিলো গিএ।
মথুরা ভবানীপুর ছাড়াইয়ে জায়[৯৩]।
মেনে ঘটকপুর গেলেন রাজা মদন রায়

বেনে বউ শীষ-বেড়ে পশ্চাত করিএ।
কালিকে পুরে মহাশয়·উত্তরিলো গিএ॥
নবাশেনে[৯৩] যান রাজা নায়[৯৪] পার হএ;
গউদয়[২৫] মহাসএ পউছিলে গীএ॥
গউদয়[২৫] এ বাসাবাড়ি চৌপালা থেন থুএ (?)
পড়ি প্যোদায় (?) চলেন সভে[৯৫] গলায় কাপড় দিএ॥
হাত কাটা খাল রাজা ঝাপে পার হলো॥
মকামে বসিএ গাজি জানিতে পাইল[৯৬]॥

[মদন রায়ের প্রতি মোবারকের উক্তি]

বলে রাখ মেটি না কেটো[৯৭] অরে·মদন রায় চৌধুরী।
তিন পুরুষ তাগাদি বাবা তোমার জমিদারি[৯৮]॥
দরবারেতে[৯৯] জাত্রা[১০০] করো দিন বুদবার[১০১]॥
মঙ্গলে উস্সু[১০২] বুদ্বারে[১০৩] দিবে পা[১০৪]॥

[ঘুটিয়ারী থেকে মদন রায় রাজপুরে নিজের বাড়ীতে ফিরে আসছেন]

বিদায় হএ মদন রায় করিল গমন।
হাত কাটার খালের কাচে[১০৫] দেলেন দরশন॥
হাত কাটার খাল চৌধুরী ঝাপে পার হএ।
কুমার ডে বেনে বৌয়॥ পচাত[১০৬] করিএ মেনে ঘটকপুর
এলেন ডাবায় ছাড়াইএ। ভবানীপুর মথুরাপুর ভাবিএ
ছাড়াই। পেতবরম্বরি[১০৭] এলেন আমার রাজা মহাশয়।
রখ্যে কর রখ্যে করো॥ গাজী দয়াময়॥ চাকমন্দে খপর নএ × ×
মধ্যে জায়(?)। পাস টাকা[১০৮] প্যেএচি[১০৯] মোরা চাকর মান্দের।

[মদন রায় ঢাকা থেকে ফিরে ঘুটিয়ারীতে মোবারকের কাছে যাচ্ছেন]

বিদায় করে মদন রায় আপনার লোকজন নিএ;
দেখিতে দেখিতে গঙ্গা এলো পার হএ।
এইরূপ রহে রহে মনজিল[১১০] করি এ।
কালীঘাটে মদন রায় পোঁছিয়া আসি এ।
কালীঘাটে পার হয়ে রাজা কুমড়ো খালি এলো॥
কালীঘাটে কালিকাপূজা দিএ মোশ বলি[১১১]।
প্রণাম হইএ চলে গড়ে পার হয়ে রাজা কুমড়ো খালি এলো॥
ফরিদ নস্করের তরে রাজা ডাকিয়া কহিলো।
দারির জাঙ্গাল ধরে জাই[১১২] গাজির হুজুরে।
সাত্ত খাসি সাত মন চাউল নে জেও[১১৩] ভরায়[৮৩] করে॥

বারসনর সত[১১৪] জমী পিরতোর[১১৫] গাজির নামে লিখে দিল।
মদন রায়কে খালাষ করেছিল পির মমেরাক গাজী।

[এরপর এখানে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি শব্দ প'ড়ে মনে হয় বলা হচ্ছে যে, নবাব নিজের পাশে মদন রায়কে আদর কোরে বসিয়েছিলেন]

মহামায়া[১১৬] গড়িয়া জায়[২৪] তুরিত[১১৭] ছাড়াই এ ॥

[মদন রায়ের প্রতি নবাবের উক্তি ও নবাব দরবারের দৃশ্য]

যুণ ২[২৮] মদন রায় হে বলি তোমার তরে।
তুমি × × হলে অন্ন্যা[১১৮] দিবরে উদরে।
এই বলে নবাব আউলে[১৫] কোন কাম করিল।
বেসরি আজ্ঞা মেদনমল্য পাট্টারি লিখিলো[১১৯]।
একঘটি তংকা নবাব পাট্টার সামেত নিল।
মদন রায় দাস্তা (বা দাস্তা[১২০]) ধরে পাট্টা শুণে দিল।
× × ×
ঘুটুরি বসিএ গাজী জেনেছেন তক্ষণ।
× × ×
মহেশ ঘোষকে ডেকে রাজা কহেন এই বচন।
প্রজা আদি × × আমার করিও পালন।
দৌরাস্ত[১২১] করো না তুমি বলি তোমার তরে।
ৰক্ষ্‌ গেএ (?) গাল না দেও আমারে।

[ঢাকায় নবাবের কারাগারে বন্দীদের কথা ও অন্যান্য কাহিনী]

বার ভূমের জমিদারকে[১২২] তখন কহিতে লাগিল ॥
ফকির নষ্কর বলিছে মহাশয় বলি তোমার কাছে।
তোমার মহেষ ঘোষ সিকিদের[১২৩] আছে কিনা আছে।
সিকিদের[১২৩] বাঁচাবে জদি[১২৪] শুন মোর বানি[১২৫]।
তরায়[৮৩] করে পাঁচ সোয়া টাকা এনে দেয় তুমি।
× × ×
মহেষ ঘোষ সকিদেরের[১২৩] হাতে বাদন[১২৬] তখন খাশাই এ দিলো

[ঘুটিয়ারীতে মদন রায়ের প্রতি গাজীর উক্তি]

তিন পুরুষ তগাদি[১২৭] বাবা তোমার জমিদারি।

[বেলের জঙ্গলের দক্ষিণে খোলায় কাছারীতে শিকদার মন্দিরায় এসেছেন। তাঁর উক্তি]

চন্দনসর[১২৮] জমীদারে বলো আছে কে ॥
কাবীলে[৮৩] যুণ[২৮] বলি রাজা সই।
চন্যশর[১২৮] জমিদারে আরো কেউ নাই ॥

ঠগ[১২৯] ছিল দরবারে হেবে কি বলি কাবীলে[৮৬]
দুই ব্যেটা বাগ[১৩০] চন্দশার[১২৮] ॥
আছে এক ছেলে। রাজা বলে করি তালুক মল্যক
ছুনি[১৩১] যা মাজারে[১৩২] ॥
মিস্তে[১৩৩] কথা কইনি বেটা আমার হুজুরে।
কাবিলে[৮৬] বলে বোঝানে না বোঝাই[১৩৪]।
মামারা গাজী[৯১] আল্লা রাজি চন্নন সার[১২৮] ব্যেটা
জমীদারি ছিল বাপে গাজির হন[১৩৫] ॥
নেটা[১৩৬] চন্নসর[১২৮] জমীদার ছিল।
কেলের বাজারে কিছু বাকী ছিল টাকা ॥
হিসাবের দরবারে ॥ চননস[১২৮] মরি যায়ে লো ॥
গাজী হন একা ॥ বেলে যা বাজারে[১৩৭]
গাজী কেউ না কো সকা[১৩৮] ॥
চৌতারা কাছারী আসি মইদি রায়[১৩৯] বসিল ॥
ব্যেলে কাগচ জত দেখিতে নাগিল[১৪০] ॥
দপ্তর খুলে বোরক ওলে[১০] নিগায় (?) করে চায় ॥
চন্নসর[১২৮] বাকী টাকা দেখিবারে পায় ॥
টিক দিএ[১৪১] মইদি রায়[১৩৯] করে লেখা জোকা।
× × বাকি হন[১৪২] এক সয় পঁচিশ টাকা।"

[এরপর লেখা আরও অস্পষ্ট ও পত্রগুলি শতছিন্ন। বিক্ষিপ্তভাবে কতকগুলি শব্দ যোজনা করলে বোঝা যায়—এই কথা বলা হয়েছে যে, 'চন্দন শাহ্ মৃত ব'লে তার বাকী খাজনার দায়ে তৎপুত্র মোবারককে সিকদার মন্দিরায়ের কাছে ধরে নিয়ে গেল।' এরপর পুঁথিটির আর পৃষ্ঠা নেই এবং ছিন্ন ভিন্ন যে পাতাগুলি অবশিষ্ট আছে, তার পাঠোদ্ধার করা কোন ক্রমেই আর সম্ভব নয়।]

পাদটীকা

১। নবাব সায়েস্তা খাঁ।

২। কোর্টেতে—আদালতে।

৩। মজায়ে নিলো।

৪। মজিয়ে।

৫। ক্ষতি।

৬। পায়ে লাগায়।

৭। ২৪ পরগণা জেলার মেদন মল্ল বা মেদন মল্য পরগণা। ইহা সমগ্র সোনারপুর, বারুইপুর এবং ক্যানিং থানার উত্তরাঞ্চল নিয়ে গঠিত। রাজা মদন রায় (দত্ত) এই পরগণারও জমিদার ছিলেন।

৮। কাগজ।

৯। লাগিল।

১০। দপ্তর খুলে কুতুহলে।

১১। পূর্বোক্ত জমিদার মদন রায়।

১২। সন—সনী—বার্ষিক।

১৩। এই ছাই—এই রকম। আঞ্চলিক ভাষা।

১৪। যখন।

১৫। আউলিয়া—এক প্রকার গুহ্য সাধনার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক, সহজিয়া কর্তাভজা। 'আউলী' শব্দের অর্থ—বিশৃংখল, অস্থির, ব্যাকুল।

১৬। লাল খাঁ।

১৭। পেয়াদা।

১৮। উঠে।

১৯। পিঠ—পৃষ্ঠ।

২০। চাল।

২১। অতি।

২২। সেই।

২৩। ধাউড়—দ্রুতগামী বার্তাবহ। প্রাচীন সাহিত্যে ধৃষ্ট বা শঠরূপে ব্যবহৃত।

২৪। যায়।

২৫। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনে 'ঘুটিয়ারী শরীফ' নামে যে-রেলওয়ে স্টেশন আছে, তার প্রায় ২ কি: মি: উত্তরে গৌড়দহ নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের এক স্থানে রাজা মদন রায়ের কাছারী বাড়ী ছিলো। লোকে বলতো—বাসা বাড়ী। বর্তমানে সে-স্থান ধান ক্ষেতে পরিণত।

২৬। এসে।

২৭। অতঃপর 'কিশোর' নামে এক উকিলের কাহিনী আরম্ভ হ'চ্ছে। এটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম। কিশোরকে উকিল বলা হয়েছে। উকিল অর্থে আইন ব্যবসায়ী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। এখানে শেষোক্ত অর্থটিই প্রযোজ্য। বলা হ'চ্ছে—উক্ত বাসাবাড়ীতে বার্তাবহ এসে মদন রায়কে না পেয়ে তাঁর উকিল কিশোরকে ধরে নিয়ে গেল। কিশোর নবাবের কাছে গিয়ে তাঁর বাকী পড়া খাজনার কাহিনী বর্ণনা করছে।

২৮। শোনো।

২৯। উড়ে।

৩০। নবাবীয়ানা করার দায় অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত যে-বিলাসিতা করা হয়েছে, তার প্রতিফল এখন পেতে হ'চ্ছে।

৩১। যায়।

৩২। সামনে—সম্মুখে।

৩৩। খাড়া।

৩৪। আনো নি। এনো নি—দক্ষিণ ২৪ পরগণার আঞ্চলিক রূপ।

৩৫। নবাব সাহেব।

৩৬। তিন সনে।

৩৭। দানা—শস্য।

৩৮। শুকিয়ে। ছকিএ বা ছকিয়ে—ঐ আঞ্চলিক রূপ।

৩৯। তশিরা করিয়া—শীঘ্র করিয়া, খজেনা—খাজনা, মায়াইয়ে দে—মাফ্‌ বা ভিক্ষা করেও দে।

৪০। চালিয়াত—যে অপদার্থ মিথ্যা ভাষণের দ্বারা নিজের কৃতিত্ব প্রচারে তৎপর। এখানে নবাবের সিপাই।

৪১। মেরা—আমার।

৪২। শোনো ফরমান। ফরমান—নবাব-বাদশার আদেশ পত্র।

৪৩। কোন্‌।

৪৪। তোরা।

৪৫। শুনি।

৪৬। গ্রামের মাতব্বর।

৪৭। সম্ভবতঃ বঁড়িশার বিখ্যাত জমিদার সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায় চৌধুরী (১৭১০-১৭৯০)। ভূমিকা দ্রঃ।

৪৮। যাইতেছি।

৪৯। ইরশাল—খাজনা দাখিল।

৫০। পথের।

৫১। 'ওর' হবে।

৫২। কাক।

৫৩। কোলে।

৫৪। বৃহদাকার শিং মাছের মেরুদণ্ড দিয়ে তৈরী কাঁটাযুক্ত একপ্রকার যষ্ঠী। এককালে প্রহারার্থে ব্যবহার করা হতো।

৫৫। মেরে মেরে পিঠ ভলে।

৫৬/৫৭। বলছে,—ঐ রায় অর্থাৎ মদন রায় বেঁচে আছে দুটি দন্ত করে জোড়া। অর্থাৎ ভয়ে দাঁতে দাঁত প'ড়ে গেছে।

৫৮। কাগজ।

৫৯। 'সনে'র হবে।

৬০। জলে।

৬১। নবাব।

৬২। সাহেব।

৬৩। বাণী।

৬৪। এখানে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি (পুঁথির সর্বত্র এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।

৬৫। এসে।

৬৬। আসিয়া।

৬৭। ফরিদ নস্কর ছিলো রাজার মন্ত্রী।

৬৮। মহেশ ঘোষ ছিলো রাজার দেহরক্ষী।

৬৯। অর্থাৎ মাঝে মধ্যে হাঁকে।

৭০। বন্দুকে।

৭১। ধোঁয়ায়

৭২। অন্ধকার।

৭৩। পাঠান্তর—বাজ বৈরী, বাজব-হরি, বাজবহরী—বৃহদাকার বাজ (বজ্র) বিশেষ। যা দূরে নিক্ষেপ কোরে শিকার করা যায়, এমন অস্ত্র। ছেলে ভুলোনো ছড়ায় আছে,—'লোটন লোটন পায়রাগুলি ঝুঁটি বেঁধেছে। ওপারেতে ছেলেমেয়ে নাইতে নেমেছে। কে দেখেছে কে দেখেছে, দাদা দেখেছে। দাদার হাতে বাজবৌরী ছুঁড়ে মেরেছে। উহু, দাদা বড্ড লেগেছে।'

৭৪। চেঁচানি।

৭৫। রাজপ্রাসাদের সিংহ-তোরণ।

৭৬। যেন।

৭৭। এক প্রকার গ্রাম্য অশ্লীল গালাগালি।

৭৮। 'চালিয়াত বাবা'—হবে।

৭৯। বিনা—বিনি—মিনি। উচ্চারণে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য।

৮০। শুন ফরমান।

৮১। কোথা থেকে। এখানে কোথায়।

৮২। হাতিয়া গড় রাজ্য—২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ড হারবার (হাজীপুর) থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এর মধ্যে পেঁচাকুলী পরগণাও (প্রাচীন নাম—পেকাকুলী) এই মদন রায়ের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৮৩। ত্বরা।

৮৪। কোমর খসিয়ে আন্ অর্থাৎ গাঁট কেটে আন্।

৮৫। দু'জনা।

৮৬। যোগ্য বা লায়েক।

৮৭। আপন ভালো যদি চাও।

৮৮। মদন রায়ের প্রাসাদ সংলগ্ন 'আনন্দময়ী' নাম্নী দেবী কালিকার মঠ বা মন্দির। এই বর্ণনার দ্বারা বোঝায় যে, মন্দিরটি মদন রায়েরই প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু 'হর পার্বতী মঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত আছে যে, মদন রায়ের পৌত্র দুর্গাচরণ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

৮৯। 'কেঁদো না কেঁদো না' হবে।

৯০। অর্থাৎ বর্তমান 'ঘুটিয়ারী শরীফ' পর্যন্ত জঙ্গল ছিলো এবং তার অধিপতি মদন রায়।

৯১। পীর মোবারক। কথিত আছে, মন্ত্রী ফরিদ নস্করই মদন রায়কে প্রথম মোবারকের সন্ধান দেন।

৯২। পাতক্ষীর গ্রাম।

৯৩। ভাঙড় থানার অন্তর্গত নবাসন গ্রাম।

৯৪। নৌকায়।

৯৫। সবাই।

৯৬। এখানে গাজীর অন্তর্যামিতার কথা বলা হ'চ্ছে। তিনি নিজ আস্তানায় বসেই মদন রায়ের আগমন বার্তা জানতে পারলেন।

৯৭। মাটি কেটো না। কথিত আছে, মদন রায়ের আবেদন শোনার পর গাজী সাহেব পরীক্ষা করবার জন্য কোদাল হাতে নিয়ে রাজাকে মাটি কাটতে বললে, রাজা তিন কোদাল মাটি কাটার পর আর কাটতে অপারগ হলেন। তাই নিষেধ করছেন যে, থাক আর মাটি কেটো না। পরে সেই স্থানেই একটি

পুষ্করিণী হয়, নাম হয় 'ফুল পুকুর।' এখানে সির্নি ভাসানো হয়।

৯৮। অর্থাৎ এই তিন কোদাল মাটি কেটেছ বলেই তোমার জমিদারীও থাকবে তিন পুরুষ পর্যন্ত, তারপর তামাদী হ'য়ে যাবে (তা অবশ্য হয় নি—লেখক)।

৯৯। নবাব দরবার।

১০০। যাত্রা।

১০১। বুধবার।

১০২। মঙ্গলে ঊষা।

১০৩/৪। 'মঙ্গলের ঊষা বুধে পা। যথা ইচ্ছা তথা যা॥'—খনার বচন

১০৫। কাছে।

১০৬। পশ্চাৎ।

১০৭। পীতাম্বরী। এই গ্রামটি হ'চ্ছে, সোনারপুর থানার অন্তর্গত 'সুভাষ গ্রাম' নামক রেলওয়ে স্টেশনের নিকট 'হাড়ি-ঝি' দেবীর মন্দির-সংলগ্ন।

১০৮। পাঁচ টাকা।

১০৯। পে'য়েছি।

১১০। রঙ্গকালয় (আরবিতে) প্রাসাদ।

১১১। মহিষ বলি।

১১২। ঝারীর জাঙ্গাল ধ'রে যাই।

১১৩। নিয়া যাও।

১১৪। বার শ' শত।

১১৫। পীরোত্তর।

১১৬। গড়িয়ার দক্ষিণে। দুর্গারাম কর—প্রতিষ্ঠিত 'মহামায়ার' মন্দির আছে। 'মহামায়ী তলা' নামে খ্যাত।

১১৭। তুরন্ত—শীঘ্র।

১১৮। অন্ন।

১১৯। যেদন মল্য পরগণা বেসরিকত পাট্টা লিখে দিতে আজ্ঞা দিল।

১২০। শব্দটি ঠিকমত বোঝা যায় না। তবে দস্ত—হাত, দস্তক—পরওয়ানা, সমন; দস্তা—যশদ, ধাতুবিশেষ zinc.

১২১। দৌরাত্ম্য।

১২২। বার ভূঞা জমিদারকে।

১২৩। সিকদার—জমিদারের বিশিষ্ট কর্মচারী।

১২৪। যদি।

১২৫। বাণী।

১২৬। বাঁধন।

১২৭। শব্দটি সম্ভবতঃ 'তামাদি' হবে—অর্থ দাবী করবার নির্ধারিত সময় অতিক্রম। অর্থাৎ তিন পুরুষ পর্যন্ত এই জমিদারী থাকবে।

১২৮। মোবারক গাজীর পিতা চন্দন শাহ্।

১২৯। দস্যু সম্প্রদায়। যারা গলায় ফাঁস লাগিয়ে যাত্রীদের হত্যা করত।

১৩০। বাঘ।

১৩১। শুনি।

১৩২। মসজিদ।

১৩৩। মিথ্যে।

১৩৪। বোঝালে না বোঝে।

১৩৫। অর্থাৎ বাপের (চন্দন শা'র) জমিদারী ছিল, এখন মোবারকের হলো।

১৩৬। স্যাংটা। এখানে নিঃস্ব অর্থে ব্যবহৃত।

১৩৭। বেলেগাছির বাজার। প্রাচীন কিতাবে 'বেলের জঙ্গলের' উল্লেখ আছে। স্থানটি খুব সম্ভব দক্ষিণ ২৪

পরগণার বারুইপুর থানার পূর্ব সীমান্ত গ্রাম—বেলেগাছি। সম্ভবতঃ এই গ্রামেই মোবারকের জন্ম হয়।

১৩৮। অর্থাৎ বেলেগাছির বাজারে মোবারকের কোন সখা (সকা) নেই।

১৩৯। নবাব-নিযুক্ত পদস্থ কর্মচারী মন্দি রায়।

১৪০। বেলেগাছি মৌজার যত কাগজ দেখতে লাগল।

১৪১। টিক্ দিয়ে—চিহ্নিত করে।

১৪২। বাকী হয়॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

(ছিয়াশীতম বর্ষের কার্যবিবরণ)

(১লা বৈশাখ ১৩৮৪ হইতে ৩১শে চৈত্র ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছিয়াশীতম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আপনাদের সকলকে আমার যথোচিত শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া পরিষদের ৮৬তম বার্ষিক কার্যবিবরণ সদস্যগণের অনুমোদনের জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপিত করিতেছি।

প্রথমেই শোকার্তচিত্তে বর্তমান কালসীমার মধ্যে প্রয়াত বাণীসাধকগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বিগত ২৬শে মাঘ, ১৩৮৫ (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯) প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক, পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি, মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরিষদের সহকারী সভাপতি ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) পরলোক গমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরিষদের এক দুর্দিনে তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দৃঢ় নেতৃত্ব সেদিন পরিষৎকে অনেক দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার তিরোধানে শুধু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নয়, বাংলার সাহিত্যজগৎ এক অমূল্য রত্ন হারাইল।

বিখ্যাত যোগী ও দার্শনিক শ্রীমৎ অনির্বাণ, সাহিত্যিক শ্রীকমলকুমার মজুমদার ও শ্রীদীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৎসরে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিও বর্তমান বৎসরে পরলোকগত ও অন্যান্য বিশিষ্ট বঙ্গসন্তানগণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বিভিন্ন সভার অধিবেশন

(ক) প্রতিবাদ সভা :

৭ই আষাঢ়, ১৩৮৫ (জুন ২২, ১৯৭৮) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা ভাষাকে ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করায় প্রতিবাদে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রমেশ-ভবনে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। পরিষৎ সভাপতি ডঃ সুকুমার সেন উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উক্ত সভায় ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র তাঁহাদের বক্তব্য উপস্থিত করেন।

(খ) প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব :

৮ই শ্রাবণ, ১৩৮৫ (জুলাই ২৫, ১৯৭৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছিয়াশীতম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

পরিষৎ সভাপতি ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত থাকায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক স্বাগত ভাষণ দেন এবং সভাপতির নির্দেশে পরিষৎ সভাপতির প্রেরিত পত্র পাঠ করিয়া শোনান। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেন ও সময়োপযোগী ভাষণ দেন। এতদুপলক্ষে পরিষৎ প্রকাশন সমূহের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনী ১৫ (পনর) দিন চলিবে বলিয়া ঘোষিত হয় এবং এই উপলক্ষে পরিষৎ প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ ৫০% হইতে ২০% মূল্যে পনর দিন ধরিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করার কথা ঘোষিত হয়।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সভাপতির অনুমতি লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আনীত বিশ্ব-ভারতী বিলের প্রতিবাদে একটি প্রস্তাব আনেন। ডঃ স্বপন বসু এই প্রস্তাব আনার যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রশ্ন তুলিলেও শেষ পর্যন্ত সদস্যগণের সমর্থনে প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম দেশীয় সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(গ) বার্ষিক অধিবেশন :

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৮৫ (জুলাই ৩০, ১৯৭৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পঁচাশীতম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতির শারীরিক অসুস্থতাহেতু তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পরিষৎ সদস্য শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় পরিষৎকে একশত টাকা দান করেন। পরিষদের পক্ষে ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য উক্ত টাকা গ্রহণ করেন। এতদুপলক্ষে স্বর্গত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি প্রতিকৃতি (তাঁহার দৌহিত্র দীপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উপহারস্বরূপ প্রদত্ত) পরিষৎ ভবনে উন্মোচিত হয়।

(ঘ) আলোচনা সভা :

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পরিষৎ মন্দিরে 'শরৎচন্দ্র' বিষয়ে আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। পরিষৎ সভাপতি ডঃ সুকুমার সেন সভাপতিত্ব করেন। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র শরৎচন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভা বিশ্লেষণপূর্বক ভাষণ দেন।

(ঙ) কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্মশতবার্ষিকী পালন :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, সাহিত্য একাডেমী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পরিষদ মন্দিরে স্বর্গত কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্মশতবর্ষ পালিত হয়। এই উপলক্ষে কবিবর যতীন্দ্রমোহনের একখানি তৈলচিত্র পরিষৎ ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। কবির আত্মীয়বর্গ এই চিত্রখানি পরিষদে অনুগ্রহপূর্বক উপহার দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষৎ সভাপতি ডঃ সুকুমার সেন। সভায় যতীন্দ্রমোহন সম্বন্ধে আলোচনা করেন ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীঅলোক রায়, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, সাহিত্য একাডেমীর পূর্বাঞ্চলের সচিব ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সভায় স্বাগত ভাষণ দান করেন। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন প্রেরিত দুইখানি পত্র সভায় পাঠ করা হয়। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপসচিব ডঃ নীতীশ সেনগুপ্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শোকসভা

(ক) শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্যের শোকসভা :

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ (১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮) পরিষৎ কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবদ্বীপ শাখার প্রতিনিধি শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে পরিষদের ছিয়াশীতম বর্ষের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে শোক প্রদর্শন করা হয়।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। ডঃ প্রভাতকুমার গোস্বামী, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত প্রয়াত কবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সভাপতি প্রয়াত কবির বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনকথা ও সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ অবদানের কথা ব্যাখ্যা করেন।

(খ) বনফুল (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)-এর স্মরণসভা :

৫ই ফাল্গুন, ১৩৮৫ (১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯) পরিষৎ মন্দিরে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান সহ-সভাপতি বনফুল (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) -এর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষৎ সভাপতি ডঃ সুকুমার সেন সভাপতিত্ব করেন। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, ডঃ সরোজমোহন মিত্র, ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ শীল এবং শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রয়াত সাহিত্যিকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

(গ) চিত্র প্রতিষ্ঠা :

৮৬তম বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে ২৩শে ভাদ্র, ১৩৮৫ (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯) তারিখে পরিষৎ মন্দিরে কথাসাহিত্যিক স্বর্গত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে

এক সভা হয়। এই চিত্রখানি পরলোকগত কথা সাহিত্যিকের আত্মীয়বর্গ অনুগ্রহপূর্বক পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। ড: পঞ্চানন চক্রবর্তী, ড: রবীন্দ্র গুপ্ত, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীসুধাজিৎ মিত্র, শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী প্রখ্যাত সাহিত্যিকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

(ঘ) নির্মলকুমার বসু স্মারকবক্তৃতা :

এই বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৮৫ (৪ মার্চ, ১৯৭৯)। ড. সরসীকুমার সরস্বতী চিত্র সহযোগে "বাঙ্‌লার তান্ত্রিক বৌদ্ধ স্থাপত্য" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ড: সুকুমার সেন।

১৩৮৫ বঙ্গাব্দে কার্যনির্বাহক সমিতির মোট বারোটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সম্পাদকের অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে বর্তমান বর্ষে মোট তিনটি মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। একই কারণে কোনো শাখাসমিতির অধিবেশন আহ্বান করা সম্ভব হয় নাই। আয়-ব্যয় উপসমিতির অধিবেশন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পুস্তক-প্রকাশ উপসমিতির তিনটি, গ্রন্থাগার উপসমিতির দুইটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ছাপাখানা উপসমিতির একটি অধিবেশন আহূত হইয়াছিল কিন্তু সভার আহ্বায়ক ব্যতীত সকলেই অনুপস্থিত থাকায় উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই। চিত্রশালা উপসমিতির দুইটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নিয়মাবলী সংশোধন সমিতি তাঁহাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্নীতি তদন্ত সমিতির কাজ দফায় দফায় অগ্রসর হইতেছে।

১৩৮৫ বঙ্গাব্দের উল্লেখযোগ্য কৃত্য :

চিত্রশালা খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সম্পূর্ণ ব্যয় করা হইয়াছে। উক্ত অনুদান হইতে চিত্রশালার সংস্কার ও বৈদ্যুতীকরণের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে, চিত্রশালার মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখার জন্য একটি সিন্দুক খরিদ করা হইয়াছে, পুঁথিশালার জন্য নূতন 'শেলফ্' তৈয়ারী করা হইয়াছে। চিত্রশালা ও রমেশ ভবনের চিত্রগুলিকে একজন বিশেষজ্ঞ দিয়া পরীক্ষা করাইয়া যেগুলির আশু সংস্কার করা প্রয়োজন, সেগুলির তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। পরিষদ কর্মিগণের বেতনক্রমের পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে। পত্রিকাকক্ষে প্ল্যাটফর্ম তৈয়ারী করা হইয়াছে। রমেশ ভবনের অডিটোরিয়াম রং করার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বর্তমান বর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ড: প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র পরিষৎ মন্দির পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আনুকূল্যে পরিষৎ মন্দির সংরক্ষণ ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে দুই লক্ষ টাকা পরিষৎ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অনুদান হিসাবে পাইয়াছে। আগামী বৎসরে উক্ত টাকা নির্ধারিত কার্যে ব্যয়িত হইবে।

পরিষদের স্থায়ী উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য আর. সি. দত্ত কমিশনের সুপারিশ দ্রুত কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনরায় অনুরোধ জানানো হইয়াছে এবং তাঁহার নিকট একটি পরিকল্পনা নূতনভাবে দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী মাননীয় শ্রীপার্থ দে বর্তমান বর্ষে পরিষৎ পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। পরিষৎ বিষয়ে যাবতীয় তথ্য তাঁহাকে জানাইয়া একটি পরিকল্পনার খসড়া তাঁহার নিকট দেওয়া হইয়াছে। মাননীয় মন্ত্রী এই বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। রামমোহন ফাউণ্ডেশনের নিকট পরিষৎ গ্রন্থাগারের জন্য আর্থিক সাহায্য চাহিয়া একটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে।

বর্তমান বর্ষে মাত্র একখানি পত্রিকা (১ম-২য় সংখ্যা) প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে।

১৩৮৫ বঙ্গাব্দে নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে :

সাহিত্য সাধক চরিতমালা :—১৭—গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার ; ২০—রাধাকান্ত দেব ; ২১—দীনবন্ধু মিত্র ; ৭১—রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, নিখিলনাথ রায়, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

অভূতপূর্ব বন্যায় এই বৎসর পরিষদের গ্রন্থসংগ্রহাগারে জল ঢুকিয়াছিল। ঐ সময় পূজাবকাশের জন্য পরিষৎ বন্ধ ছিল। ফলে ১৭ খণ্ড পত্রিকা আপাত ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। ঐ গুলিকে পুনরায় বাঁধাইবার পূর্বে পাঠকক্ষে এইগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

আর্থিক সহায়তা :

আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দান :

কর্মচারী নিয়োগখাতে—১৯,৩৩৯·৩৮ টাকা ; পুস্তক প্রকাশ খাতে—১,২০০·০০ টাকা ; পত্রিকাপ্রকাশ খাতে— ৪,০০০·০০ টাকা ; পৌনঃপুনিক অনুদান—১১,০০০·০০ টাকা (ঘাটতি বাজেট খাতে)। (মোট পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশত উনচল্লিশ টাকা আটত্রিশ পয়সা)। বলা বাহুল্য ক্রমবর্ধমান ব্যয়বৃদ্ধির তুলনায় এই আর্থিক সহায়তা পর্যাপ্ত নহে। সেইজন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আবেদন করিতেছি যে পরিষৎ কর্মিগণের বেতনের সমগ্র ব্যয়ভার তাঁহারা বহন করুন ও পৌনঃপুনিক অনুদান (ঘাটতি বাজেট খাতে) আরও বৃদ্ধি করা হউক।

চুঁচুড়া নিবাসী ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহার পিতৃদেব "সাহিত্যিক হরনাথ ঘোষবক্তৃতা মালা"র জন্য পরিষদে আট হাজার টাকার একটি স্থায়ী তহবিল স্থাপন করিয়াছেন। এই কার্যের দ্বারা তিনি পরিষদের সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

পরিশেষে উল্লেখ করি যে পরিষদের গ্রন্থাদি, পত্র-পত্রিকা, চিত্র ও অন্যান্য মূল্যবান্ সম্পত্তিগুলি সংরক্ষণের আশুব্যবস্থা না হইলে বহু প্রাচীন পুস্তক, পত্র-পত্রিকা

চিরতরে নষ্ট হইয়া যাইবে। সেইজন্য পরিষৎ মন্দিরের প্রসার ও প্রাচীন গ্রন্থাদি ও পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি পুনরায় আকর্ষণ করিতেছি।

বাঙ্গালীর নিজস্ব প্রাচীনতম সারস্বত প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাহার পূর্ব গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে এই প্রার্থনা করিয়া ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের কার্যবিবরণ আপনাদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিলাম। ইতি—২৬শে শ্রাবণ, ১৩৮৬

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস
সম্পাদক

বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী

২৬শে শ্রাবণ, ১৩৮৬

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ডঃ সুকুমার সেনের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছিয়াশীতম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতি পরিষদের ঐতিহ্যের কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন এবং বলেন যে পরিষৎ এখন আমাদের নিকট দায় স্বরূপ। তিনি পরিষদের উন্নয়ন কার্যে সকলকে সমবেতভাবে কার্য করিতে আহ্বান জানান।

অতঃপর সম্পাদক বার্ষিক কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপিত করেন। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন ইহা সমর্থন করেন। ডঃ কুমুদকুমার ভট্টাচার্য সভাপতির অনুমোদন ক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি আনেন। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছিয়াশীতম বার্ষিক অধিবেশনে সম্পাদক কর্তৃক উত্থাপিত অমুদ্রিত গত বৎসরের কার্যবিবরণ এই অধিবেশন বাতিল করিল।" তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করেন শ্রীপরিতোষ পাল। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সভাপতির অনুমতি লইয়া বলেন যে "পরিষৎ নিয়মাবলীর ৩০ (ঝ) ধারায় উল্লিখিত আছে যে সম্পাদক 'কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত কার্যবিবরণ বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিয়া তাহা বার্ষিক অধিবেশনে অনুমোদিত হইলে প্রকাশ করিবেন।' সুতরাং সম্পাদক যাহা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ বৈধ। ডঃ সরোজমোহন মিত্র সভাপতির অনুমোদন ক্রমে বলেন যে যদিও এই কার্যবিবরণী কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় অনুমোদিত তবুও তিনি মনে করেন যে বন্যায় যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার বর্ণনা, স্টক টেকিং বিবরণ প্রভৃতি এই কার্যবিবরণীতে সংযোজিত হউক। তাঁহার এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ডঃ মিত্র আরও বলেন যে শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত বিশেষ অধিবেশনে শ্রীপুলকেশ দে সরকার একজন বক্তা ছিলেন। তাঁহার নামটি ভুলক্রমে লিখিত হয় নাই। সম্পাদক এই ত্রুটি স্বীকার করিয়া লন। শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী বলেন যে আগামী বৎসরের কার্যক্রমের কিছু আভাস কার্যবিবরণীতে থাকা উচিত। অতঃপর সম্পাদকের বার্ষিক কার্যবিবরণ গৃহীত হয়। শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপুলকেশ দে সরকার, শ্রীমনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী, শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র পরিষদের নানা সমস্যা ও উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

অতঃপর সম্পাদক ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের পরীক্ষিত আয়ব্যয় বিবরণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন। তাঁহাকে সমর্থন করেন শ্রীতরুণ মল্লিক। সভায় ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় বিবরণ অনুমোদিত হয়।

তারপর সম্পাদক ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ সভায় অনুমোদনের

জন্য উপস্থাপিত করেন। তাঁহাকে সমর্থন করেন শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণ রত্ন। উক্ত আয়-ব্যয় বিবরণ সভায় অনুমোদিত হয়।

সভায় ১৭ জন কর্মাধ্যক্ষ, ২০ জন নির্বাচিত সদস্য ও চারিজন শাখা পরিষৎ প্রতিনিধির নাম সভাপতি পাঠ করিয়া শোনান। সভায় তাহা অনুমোদিত হয়।

সম্পাদক ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের জন্য আয়-ব্যয় পরীক্ষক রূপে শ্রীবিশ্বজিৎ রায় চৌধুরী বি. কম, এ. সি. এ (পার্টনার বি. সি. কুণ্ডু এ্যাণ্ড কোং চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট) ও শ্রীমলয়কুমার দেব, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টের নাম প্রস্তাব করেন। শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী তাহা সমর্থন করেন। অতঃপর উক্ত দুইজন ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের জন্য আয়ব্যয় পরীক্ষক নির্বাচিত হন।

সভাপতির অনুমতি লইয়া শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী নিম্নলিখিত প্রস্তাব সভায় উত্থাপন করেন।

"অদ্যকার এই বার্ষিক অধিবেশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয় সম্পর্কে যাঁহারা গবেষণামূলক গ্রন্থ কিংবা প্রবন্ধ রচনা করেন তাঁহাদের প্রায় সকলকেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু পরিষদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ সাম্প্রতিক কালের সৃজনশীল প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হইতেছে না। অদ্যকার এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে যে, The Press & Registration of Books Act, 1867 অনুসারে এই রাজ্যে প্রকাশিত প্রতিটি পুস্তকের যে তিনটি করিয়া কপি Registrar of Publications, Govt. of West Bengal, Calcutta অফিসে জমা পড়িয়া থাকে তাহার অন্তত একটি করিয়া কপি যেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ করা হয়।" এই প্রস্তাব সমর্থন করেন শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস। এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এই প্রস্তাবের অনুলিপি পঃ বঃ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও গ্রন্থাগার বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নিকট পাঠাইবার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

পরিশেষে সম্পাদক সভাপতি ও উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিষৎ সংবাদ

শোক সংবাদ ঃ

শ্রাবণ, ১৩৮৬ হইতে পৌষ ১৩৮৬ এই ছয় মাসের মধ্যে বহু শিল্পী সাহিত্যিক ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজীবন সদস্যের প্রয়াণে অন্যান্য দেশবাসীর সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণও শোকসন্তপ্তচিত্তে তাঁদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। কার্যনির্বাহক সমিতি বিভিন্ন অধিবেশনে বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী দিলীপকুমার রায়, শিল্পী সুনীলমাধব সেন, সাহিত্যিক সুধাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক, অজিত দত্ত, তরুণ কবি সুব্রত চক্রবর্তী, সাংবাদিক ও সাহিত্যসাধক যোগানন্দ দাস, অরুণচন্দ্র দত্ত, আজীবন সদস্য রামকমল ভূয়ালকা ও ইন্দ্রভূষণ বিদ এবং বিখ্যাত হকি খেলার যাদুকর ধ্যানচাঁদের মৃত্যুতে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

জন্মবার্ষিকী উৎসব ঃ

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে গত ৩০শে ভাদ্র, ১৩৮৬ ইং ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ তারিখে পরিষদ ভবনে কৃষিবিজ্ঞানী রাজেশ্বর দাশগুপ্তের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালন করা হয়।

রাজেশ্বর কৃষি উন্নয়নের এবং বৈজ্ঞানিক কৃষিবিপ্লবের পথিকৃৎ। কৃষিবিজ্ঞানে তাঁহার দান অপরিসীম। কৃষির উন্নতি ব্যতীত পল্লীপ্রধান ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নতি যে আদৌ সম্ভব নয়—এই সত্য তিনি মনে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কৃষিবিভাগ হইতে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৯০৪ সালে কৃষিবিভাগে প্রবেশ করেন এবং তারপর ক্রমে নিজের ঐকান্তিক কর্মনিষ্ঠা ও কৃতিত্বের দ্বারা তিনি কৃষিবিভাগে উচ্চতম পদ লাভ করেন। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াও তিনি বাংলার কৃষকদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতায় নিজেকে বিচলিত বোধ করেন। সেজন্য তিনি হিতৈষী বান্ধবের ন্যায় তাহাদের দুঃখ দূরীকরণের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন কৃষিকে আধুনিকোপযোগী শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন—প্রথম, কৃষকদের সঙ্গে সত্যিকারের যোগাযোগের ব্যবস্থা। দ্বিতীয়, নূতন যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক আয়োজনের ব্যবস্থা। তৃতীয়, বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য মাতৃভাষায় পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা। রাজেশ্বর নিজের জীবন সাধনায় এই তিনটি ব্যবস্থারই স্থায়ী ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। বাঙলার

সারস্বত ভাণ্ডারে এই গ্রন্থগুলি অমূল্য সম্পদ। তাঁহার কৃষিবিজ্ঞান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কৃষির মূল নীতি, দ্বিতীয় খণ্ডে ফসল সব্জী ও ফল সম্বন্ধে আলোচনা, তৃতীয় খণ্ডে গোপালন, গোপ্রজনন ও গোধনের শ্রীবৃদ্ধির সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

জনসাধারণকে কৃষিমনা করিবার জন্য তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রতিটি জেলায় কৃষিপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের পত্তন করিয়াছিলেন। চুঁচুড়া ও ঢাকা কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির মূলেও তাঁহার প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিল। কৃষকদের কৃষি সম্পর্কীয় অতি আধুনিক তত্ত্ব ও তথ্য শিক্ষা দিতে তিনিই ছিলেন প্রথম কৃষি সম্মেলনের উদ্যোক্তা। কৃষির উন্নতির জন্য তিনি সেচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন।

মেণ্ডেলের সূত্র অনুসরণ করিয়া তিনি রংপুর কৃষিক্ষেত্রে বাংলার একটি নিজস্ব জাতের গোবংশের সৃষ্টির জন্য গবেষণা করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত হস্তচালিত তাঁতযন্ত্র কুটীর শিল্প ও কৃষিকর্মের উন্নতি বিধানে সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহারই প্রচেষ্টায় কৃষি সম্বন্ধীয় পত্রিকা 'কৃষি কথা' প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁহার চেষ্টায় হুগলী জেলার অমরপুরে কৃষিশিক্ষার প্রথম প্রবর্তন করা হয়। উন্নত ধরনের পাটের বীজ প্রবর্তন করা, মরিশাস হইতে আখের কলম আনাইয়া উন্নত ধরনের আখ চাষ প্রবর্তন করার উদ্যমের জন্য কৃতিত্ব তাঁহারই প্রাপ্য। তিনি এদেশের উপযোগী হাল্কা দু-ফলা লাঙ্গল আবিষ্কার করিয়াছিলেন যাহা "রাজেশ্বর লাঙ্গল" নামে প্রসিদ্ধ। ইহার দ্বারা কৃষকরা অল্প পরিশ্রমে অধিক ফসল উৎপাদন করিতে পারে।

তাঁহার মত মানবিক গুণ, কর্মদক্ষতা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও প্রকৃত দেশে-প্রেমের সমন্বয় বর্তমানে বিরল। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের অধীনে কাজ করিয়াও তিনি নীরবে দেশ গঠনের বিশেষ করিয়া কৃষিবিজ্ঞানের জন্য যে প্রেরণা ও কর্মোদ্যোগের সূচনা করিয়াছেন সেই জাতীয় নিষ্ঠা ও প্রেরণা বর্তমানে দুর্লভ।

১৮৭৮ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারে রাজেশ্বর দাশগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কালীশ্বর দাশগুপ্ত ছিলেন পূর্ববঙ্গের একজন কৃতী আইন ব্যবসায়ী। ১৯২৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এত স্বল্পায়ু জীবনে কৃষিবিজ্ঞানের উন্নয়ন কল্পে বহুমুখী প্রচেষ্টায় তাঁহার অনন্যতুল্য উদ্যম, সদাজাগ্রত কর্তব্যবুদ্ধি, অভাবনীয় সাফল্য জাতির ইতিহাসে অনপনেয় অক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়া থাকিবার যোগ্য।

এই দিনের সভায় ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, ডঃ তারক-মোহন দাস রাজেশ্বর দাশগুপ্তের নানা কীর্তি ও কৃতিত্বের কথা স্মরণ করেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু রাজেশ্বর দাশগুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া এক পত্র প্রেরণ করেন। সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও ডঃ সুকুমার সেনের প্রেরিত পত্র পাঠ করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর ডঃ শশাঙ্ক ভট্টাচার্য।

ভগিনী নিবেদিতার জন্মবার্ষিকী পালন :

গত ১০ই কার্তিক, ১৩৮৬ (ইং ২৬ অক্টোবর ১৯৭৯) রবিবার পরিষৎ ভবনে ভগিনী নিবেদিতার ১১৩ তম জন্মবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। পরিষৎ সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস বঙ্গসংস্কৃতিতে নিবেদিতার দান বিষয়ে আলোচনা করেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয়া বিচারপতি শ্রীপদ্মা খাস্তগীর, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী নিবেদিতার জীবনদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সভায় পরিষৎ সভাপতি ডঃ সুকুমার সেন এবং ডঃ রমা চৌধুরী প্রেরিত দুইটি পত্র পাঠ করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী কল্যাণী কাজী ভক্তি গীতি পরিবেশন করেন এবং শ্রীসবিতা-ব্রত দত্ত ও সম্প্রদায় স্বদেশী সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বৈষ্ণবাচার্য ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা :

৮ই অগ্রহায়ণ, '৮৬ (ইং ২৫শে নভেম্বর, '৭৯) বৈষ্ণবাচার্য ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ স্মৃতি সংরক্ষণ কমিটির উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে স্বনামখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয় বৈষ্ণবাচার্য ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের তৈলচিত্র স্থাপন ও উন্মোচন উপলক্ষে একটি সভা হয়। এই সভায় পরিষৎ সভাপতি ডঃ সুকুমার সেনের সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় উক্ত সভায় শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী।

পরিষৎ সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন এবং ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ রমা চৌধুরী প্রেরিত দুইখানি পত্র পাঠ করেন। ডঃ সেন তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন, "মহাত্মা রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় বিচিত্রধর্মী মহৎকর্মা মহাপুরুষ। তিনি অধ্যাপক ছিলেন, কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যাপনা করেছেন, কলেজের অধ্যক্ষও হয়েছিলেন, সুষ্ঠুভাবে সে কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। তদুপরি তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রে নিষ্ণাত ছিলেন। এ শাস্ত্রে এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁর সম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য। সর্বশেষে তিনি অধ্যাত্মরসস্নাত পুরুষ ছিলেন—পরম বৈষ্ণব। আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম।"

ডঃ রমা চৌধুরী তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন, "ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ ছিলেন সুপবিত্র বৈষ্ণবধর্মের মূর্ত প্রতীক, জীবন্ত উদাহরণ, জলন্ত প্রতিচ্ছবি। বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা প্রীতি ও সেবা—অন্তরে প্রীতি ও বাইরে সেবা। ডঃ নাথের সুধন্য জীবনে এই দুটি শ্রেষ্ঠ গুণের, দিব্যগুণের যেরূপ বিকাশ আমরা আজীবন দেখেছি

তা সত্যই বিস্ময়কর। বৈষ্ণবধর্মে আরেকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গুণেরও বারংবার উল্লেখ আছে। সেটি হল বিনয়—"বিদ্যা বিনয়ং দদাতি"—এই সুমিষ্ট সত্যটি ত আজ প্রায় তিরোহিত হয়ে গেছে চতুর্দিকের আত্মম্ভরিতার ঢক্কানিনাদে। কিন্তু ডঃ নাথ আজীবন ধনজন মান পদ প্রভৃতির সুউচ্চ শিখরাসীন হয়েও সত্যই ছিলেন "তৃণাদপি সুনীচ"—একেবারে মাটির মানুষ—অহঙ্কারের লেশমাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না কোনদিন।"

শ্রীবিশ্বাস ডঃ নাথকে এই যুগের কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়া আখ্যাত করেন। বৈষ্ণবাচার্য ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ স্মৃতি সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী মনীষী ডঃ নাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী ডঃ নাথের বিচিত্রমুখী প্রতিভার কথা ব্যাখ্যা করেন। শ্রীক্ষিতীশ দেবনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ দাস শাস্ত্রী, শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী, শ্রীকামিনীকুমার নাথ, শ্রীমনোরঞ্জন রায়, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ স্বর্গত ডঃ নাথের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সম্প্রদায় কীর্তন পরিবেশন করেন।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ জন্মশতবর্ষ পালন ঃ

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ (ইং ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৯) পরিষৎ ভবনে পণ্ডিতপ্রবর অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভাষায় অমূল্যচরণ ছিলেন "ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত"। তাঁহার জন্মতারিখ লইয়া মতভেদ থাকিলেও অনেকেই তাঁহার জন্মতারিখ ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ২৪ অগ্রহায়ণ বলিয়া মনে করেন। অমূল্যচরণ ছিলেন বহু ভাষাবিদ্। জার্মান, পালি, ফরাসী, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার তিনি অধ্যাপক ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ৪ খানি গ্রন্থের তিনি সম্পাদনা করেন—কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস, বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ৩য় খণ্ড ১ম ও ২য় সংখ্যা, দীনবন্ধু দাসের "শ্রীশ্রীসংকীর্তনামৃত"। ইহা ছাড়াও বহু বিচিত্র গবেষণামূলক প্রবন্ধ পরিষদের নানা অধিবেশনে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। অমূল্যচরণের গবেষণা কেবল ইতিহাসের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে রচিত তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি জ্ঞানের গভীরতা ও যুক্তির স্বচ্ছতায় বিস্ময়কর ভাবে সমৃদ্ধ। 'বঙ্গীয় মহাকোষ'-এ প্রবন্ধগুলি তাহারই নিদর্শন।

অমূল্যচরণের স্মরণ সভায় ডঃ সুকুমার সেন শারীরিক কারণে অনুপস্থিত থাকায় পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন। সভার সূচনায় শ্রীবিধুভূষণ ন্যায় তর্কতীর্থ মঙ্গলাচরণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন অমূল্যচরণের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন। পরিষৎ সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস সমবেত সকলকে স্বাগত জানান। অমূল্যচরণের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের যোগাযোগের কথা

তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি সভাপতির অনুমতি লইয়া ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন এবং স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রেরিত তিনখানি পত্র (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) সভায় পাঠ করিয়া শোনান।

ডঃ রমা চৌধুরী, সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথচন্দ্র সর্বাধিকারী, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, ডঃ কেশব চক্রবর্তী অমূল্যচরণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ও তাঁহার পাণ্ডিত্যের বহুমুখিনতার কথা আলোচনা করেন।

সভায় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশ এবং শ্যামপুকুর থানার অন্তর্গত তেলিপাড়া লেনের নাম পরিবর্তন করিয়া অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সরণী রাখিবার জন্য দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অধ্যাপক রঙ্গীন হালদারের স্মৃতিসভা :

ভারতীয় মনস্তত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রখ্যাত মনীষী রঙীন হালদার মহাশয় গত ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ পাটনায় মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। প্রয়াত এই মানবদরদী বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য গত ৭ই পৌষ, ১৩৮৬ (ইং ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও ইণ্ডিয়ান একাডেমী অফ সাইকো অ্যানালিসিসের যৌথ উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভবনে এক স্মৃতিসভার আয়োজন করা হয়।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ সুকুমার সেন। পরিষৎ সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস বলেন, জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাঁহার পদচারণা ছিল অনায়াস। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল। সভায় শ্রীগোপাল হালদার এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বর্তমান স্পীকার মনসুর হবিবুল্লাহ ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা করেন। শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ রমেশচন্দ্র দাস প্রয়াত হালদারের পাণ্ডিত্য ও মানবিকতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ১১৮ তম জন্মবার্ষিকী পালন :

গত ২৭শে পৌষ '৮৬ (ইং ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭৯) বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১১৮ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র। প্রধান অতিথি ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার প্রধান সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার। সভায় ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, বিচারপতি শ্রীপদ্মা খাস্তগীর, ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রমা চৌধুরী প্রমুখ স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন অবদানের প্রসঙ্গে ভাষণ দান করেন।

সাহিত্য পরিষদে দান :

ক) অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য ১৩৮৪ ও ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের রামলাল হরিপ্রিয়া

স্মৃতি বক্তৃতামালার জন্য যে পাঁচশত টাকা সম্মান দক্ষিণা পাইয়াছিলেন তাহা তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে' দান করিয়াছেন।

খ) ৩৫, উপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলি-৫৪-এর আবাসিক শ্রীদিলীপকুমার দাস তাঁহার মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে পরিষদ গ্রন্থাগারে গত শ্রাবণ মাস হইতে প্রতি মাসে একশত টাকা মূল্যের পুস্তক দান করিতেছেন। এই পুস্তকগুলি রাধারাণী দাস স্মৃতিসংগ্রহ নামে চিহ্নিত হইতেছে।

গ) ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি 'রাধাগোবিন্দ নাথ স্মৃতি তহবিল' নামে দশ হাজার টাকার একটি 'গচ্ছিত তহবিল' পরিষদে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই তহবিলের প্রাপ্য সুদ হইতে প্রতি বৎসর 'রাধাগোবিন্দ নাথ স্মৃতি বক্তৃতা'র আয়োজন করিতে হইবে। তাহাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বর্তমান বৎসরে উক্ত বক্তৃতা দিবেন অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী এবং বর্তমান বৎসরের সম্মান দক্ষিণার ব্যয় উক্ত সমিতি বহন করিবেন।

ঘ) রবিবাসর 'বনফুল স্মারক বক্তৃতা'র জন্য পরিষদে এককালীন ছয় হাজার টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত টাকা গচ্ছিত তহবিল রাখা হইয়াছে। তাহার সুদ হইতে প্রতি বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ দুইটি 'বনফুল স্মারক বক্তৃতার' আয়োজন করিবেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান বর্তমান বৎসরের দুইটি বক্তৃতার জন্য ছয়শত টাকা পৃথকভাবে দান করিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী বর্তমান বৎসরের উক্ত দুইটি বক্তৃতা দিবেন ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য।

গোবিন্দ গৌরী স্মৃতি পদক দান :

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত মণিলাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার মাতার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে চারশ' টাকার একটি তহবিল গঠন করিয়াছিলেন। উক্ত টাকার সুদ হইতে পরিষদের কোন সেবককে 'গোবিন্দ গৌরী স্মৃতি পদক' নামে একটি রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে। ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের উক্ত পদক পরিষদের দীর্ঘকালের সদস্য বহুদিনের সেবক অশীতিপর বৃদ্ধ অনাথবন্ধু দত্তকে দেওয়া হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠা দিবস :

গত ৮ই শ্রাবণ, ১৩৮৬ (ইং ২৫শে জুলাই, ১৯৭৯) বুধবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি ডঃ সুকুমার সেন। এই অনুষ্ঠানে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য এবং শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। ডঃ ভট্টাচার্য "বঙ্কিমচন্দ্র ও সাংখ্যদর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত 'পরিষৎ স্থাপনের গোড়ার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সভার প্রথমে সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। পরিষৎ-গ্রন্থাগারে প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রকাশক যে সমস্ত গ্রন্থ, ও পত্র-পত্রিকা উপহার দিয়াছেন তাহাদের তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই উপলক্ষ্যে উপহার প্রাপ্ত পুস্তকগুলির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এই অনুষ্ঠানে পরিষদের সঙ্গে তাহার দীর্ঘকালীন সম্পর্কের একটি বিবরণ দিয়া মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

সভাপতি তাঁহার স্বল্প ভাষণে পরিষদের ঐতিহ্য ও সুনাম বজায় রাখিবার জন্য সকলের নিকট আবেদন জানান।

সাংগঠনিক সংবাদ :

ক) ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশনেই গ্রন্থশালাধ্যক্ষ শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়। উক্ত শূন্যপদে কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহগ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী পরিষদের গ্রন্থশালাধ্যক্ষ পদে সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত হইয়াছেন।

খ) পরিষদের অন্যতম সহ সভাপতি ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হওয়ায় কার্যনির্বাহক সমিতি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

গ) দীর্ঘকাল যাবৎ 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় কোন নূতন গ্রন্থ সংযোজিত হয় নাই। বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি বহু সাহিত্য সাধকের চরিত গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কালিদাস মল্লিক ট্রাস্টের মাসিক পাঁচশত টাকা অনুদানে গঠিত 'আরতি মল্লিক গবেষণা' তহবিল হইতে গবেষণামূলক এই চরিতমালা প্রকাশিত হইবে।

ঘ) ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি বক্তৃতা' দেওয়ার জন্য ডঃ ভবতোষ দত্ত, 'রামকমল সিংহ স্মৃতি বক্তৃতা'র জন্য শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত, 'নির্মলকুমার বসু স্মৃতি বক্তৃতা'র জন্য ডঃ সুরজিৎ সিংহ এবং 'রামলাল হালদার ও হরিপ্রিয়া দেবী স্মৃতি বক্তৃতা'র জন্য শ্রীজগদীশনারায়ণ সরকার মহাশয়গণকে নির্বাচিত করিয়াছেন।

ঙ) 'ভারতী তামিল সঙ্গম' পরিষৎ ভবনে কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর জন্মোৎসব পালন করিতে চাহিয়া যে পত্র দিয়াছেন তাহা সানন্দে গৃহীত হইয়াছে।

চ) কেন্দ্রীয় তথ্য ও চিত্র বিভাগ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপর তথ্য চিত্র নির্মাণ-কল্পে পরিষদের 'বিদ্যাসাগর সংগ্রহ'-এর চিত্র গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

পরিষৎ ভবন সংস্কার ও উন্নয়ন :

পরিষৎ ভবনের সংস্কার ও উন্নয়নের যে প্রকল্প কার্যনির্বাহক সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে সি এম ডি এ-র সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার শ্রীসলিল লাহিড়ী বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরামর্শদাতা-রূপে স্বেচ্ছায় যুক্ত হইয়াছেন। উক্ত কার্যের জন্য আনন্দবাজার এবং স্টেটসম্যান পত্রিকায় দরপত্র গ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছিল। প্রাপ্ত দরপত্রগুলি

পরীক্ষা করিয়া সর্বনিম্ন দরপত্র দানকারী মেসার্স সুমীর এণ্ড কোং-কে কাজ আরম্ভ করিবার নির্দেশও কার্যনির্বাহক সমিতি যথাসময়ে দিয়াছেন। সেই অনুযায়ী বর্তমানে পরিষৎ ভবনের সংস্কার ও উন্নয়নের কার্য চলিতেছে।

শাখা সংবাদ :

ক) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কৃষ্ণনগর শাখার উদ্যোগে কৃষ্ণনগরে 'শিবালয়ে' বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে শাখা-সভাপতি শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন এবং ডঃ সুধীর চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন এবং শাখা সম্পাদক শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায় সকলকে স্বাগতও বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

খ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কৃষ্ণনগর শাখা ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতির যৌথ উদ্যোগে গত ৩রা জানুয়ারী নাকাশীপাড়া থানার বিল্বগ্রামে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্মভিটার স্মৃতিস্তম্ভপাদমূলে মদনমোহনের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। সভায় শ্রীহরেকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীচারুচন্দ্র হোম রায় কবির জীবনী আলোচনা করেন এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়।

পরিশিষ্ট

আজ অপরাহ্ণ সাড়ে চারটেয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভবনে জ্ঞানতপস্বী বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের যে জন্মশতবার্ষিক উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ কারণে আমি সে উৎসবে উপস্থিত হতে পারছি না বলে আপনাদের ও দেশবাসীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

আমি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলুম। আমাদের তরুণ দিনে যে কজন বাঙালী মনীষীকে আমি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতুম তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, সরোবরের মতো গভীর কিন্তু অচঞ্চল। তিনি মিতবাক ছিলেন স্থিরবুদ্ধিতার জন্য। তিনি নানাবিষয়ে তাঁর প্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন। তার মধ্যে এমন অনেক বস্তু আছে যা দীর্ঘস্থায়ী। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এমন একটা বিশিষ্টতা ছিল যা সমসাময়িক পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে আর কারো আমি দেখিনি। তিনি যে জ্ঞানভাণ্ডার নিজের অন্তরে সঞ্চয় করেছিলেন তা নিজেরই চেষ্টায়। তাঁর যেমন প্রবল অনুসন্ধিৎসা ছিল এমন খুব কম ব্যক্তির মধ্যেই লক্ষ্য করেছিলুম।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ ছিল। বস্তুত, যে কজন অঙ্গুলিগণ্য পুরুষের প্রতিভায় ও উদ্যমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়।

স্বর্গীয় মনীষী জাতীয় শিক্ষক মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে আমি আমার সভক্তি প্রণাম নিবেদন করছি। আর আশা করছি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই অনুষ্ঠান সফল ও জয়যুক্ত হোক।

২২ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬ — শ্রীসুকুমার সেন

৯ ডিসেম্বর ১৯৭৯ — সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

SANTINIKETAN

সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ — ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬

মাননীয়েষু— — (ইং ৫. ১২. ১৯৭৯)

দেশবরেণ্য পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের জন্মশতবার্ষিক উৎসব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত হবে জেনে আনন্দিত হলাম। এই বহু ভাষাবিৎ জ্ঞান তপস্বীর মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব সমগ্র জাতির। সে দায়িত্ব পালনে সাহিত্য পরিষৎ সর্বাগ্রে উদ্‌যোগী হয়েছে, এটাই প্রত্যাশিত। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার

সীমা নেই। এক সময়ে আমি সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। নিত্য যাতায়াত করতাম সেখানে। এই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে হয় আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। তা ছাড়া প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত আমার ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ পড়েও আমার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ছিল তাঁর মনে। তাই তিনি অনায়াসেই আমাকে টেনে নিলেন তাঁর কাছে। তাঁর বাড়িতেও আমি নিয়মিত যাতায়াত করতাম। তাঁর বিশাল গ্রন্থাগার ব্যবহারেও আমার অধিকার ছিল অবারিত। এমন কি, তাঁর বই বাড়িতে নিয়ে যাবার অধিকারও আমাকে দিয়েছিলেন। শুধু বলে দিতেন—'পুনরাগমনায়'। একদিন সহাস্যে ব্যাখ্যা করে বললেন, পুনরাগমনটা বই-এর প্রতি যতটা প্রযোজ্য তার চেয়ে বেশি প্রযোজ্য বইএর পাঠকের প্রতি, বই-পড়ুয়া বারবার আসুন তাই আমি চাই। একবার Indian Pandits in the Land of Snow বইটার প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ দেখে বললেন, ওটা আর ফেরত দিতে হবে না। বোধ হয় এ বইএর একাধিক কপি ছিল তাঁর কাছে। বইটা আমি পড়ে ফেরত দিয়েছিলাম কিনা এখন আমার মনে নেই। তাঁর সঙ্গে আমার চিঠিপত্রের যোগাযোগও ছিল। চিঠিতে তিনি আমাকে লিখতেন 'প্রেমাস্পদেষু'। আমি একদিন বলেছিলাম আমি আপনার অনেক ছোট, আমাকে কল্যাণীয়েষু বা স্নেহাস্পদেষু লিখবেন। তিনি উত্তর দিলেন যাকে ভালবাসি সে আমার ছোট না বড় সে জ্ঞান কি আর থাকে? কল্যাণীয়েষু ইত্যাদি লিখে দূরে সরিয়ে রাখব কেন? ওসব লিখলে কি অনেক ব্যবধান মেনে নেওয়া হয় না? তাঁরই আগ্রহে একবার সাহিত্য পরিষদে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করতে হয়েছিল। সে অধিবেশনে আচার্য সুনীতিকুমার প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তারিখ ১৩৩৮ ভাদ্র। তাঁর সম্পাদিত 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকাতেও বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম তাঁরই অনুরোধে। যতদূর মনে আছে ওটি পত্রিকার প্রথম প্রবন্ধ হিসাবেই প্রকাশিত হয়েছিল (১৩৩৭ অগ্রহায়ণ)। এটি পড়ে তিনি যে সানন্দ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন তাই আমার পক্ষে হয়েছিল শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ওই পত্রিকায় ছন্দ সম্বন্ধেও লিখেছিলাম তাঁরই উৎসাহে। এরকম মহামনস্বীকে যে আমি আমার পরম হিতৈষীরূপে পেয়েছিলাম তাকে আমি এখনও আমার পরম সৌভাগ্য বলে স্মরণ করি। তাঁর জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ইতি। ভবদীয়

প্রবোধচন্দ্র সেন

কালজয়ী পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

পৃথিবীর সকল-কিছুই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। মানুষের জীবনও তাই। কিন্তু তাহলেও মানুষ তার চিন্তা, কর্ম ও প্রতিভার অবদান দিয়ে কালজয়ীরূপে বিশ্ব-মানুষের মনে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকতে পারে। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের জীবনও ছিল ঠিক তেমনই—যিনি তাঁর যশস্বী ও খ্যাতিময় জীবনে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিচিত্র কর্মের অবদান দিয়ে কালজয়ী ক'রে রেখেছেন নিজেকে। অসাধারণ বিদ্যানুরাগ, মানবপ্রেম ও দেশের এবং সকল মানুষের প্রতি নির্বৈর কল্যাণদৃষ্টি তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে ও রাখবে বিশ্বসমাজে চিরদিন।

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাঁর সমগ্র জীবনকেই শিক্ষা ও সংস্কৃতিরূপিনী দেবী সরস্বতীর আরাধনায় সচল ও সজাগ করে রেখেছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও পুরাতত্ত্ব, ভাষা‍তত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, মূর্তিতত্ত্ব ছাড়াও ধর্ম ও দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য এবং বিচিত্র বিষয়ের গবেষণায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। নাটক ও নাট্যশালা, জাতি ও সমাজবিজ্ঞান ছাড়া ভারতীয় দেবদেবী সম্বন্ধে তুলনামূলক ও তত্ত্বপূর্ণ আলোচনার প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি ছিল নিবিড়। অনুবাদ সাহিত্য রচনায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। তারই জন্য বাঙলাদেশের ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতি-কেন্দ্রের সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত ছিলেন বিশেষভাবে। বাংলাভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থ 'চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ', 'সরস্বতী', 'লক্ষ্মী ও গণেশ', 'ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসধারা', 'প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য'।

'সাহিত্যসঞ্চয়ন', 'সাহিত্যবোধ', 'মহাভারতের কথা' এবং ইংরাজীতে রচিত 'Selections from Pali' এবং 'The Theatre of the Hindus' ছাড়াও তদানীন্তন কালে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বিচিত্র চিন্তাশীল জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাবলী এবং 'শিক্ষাকোষ,' 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত,' 'শ্রীকৃষ্ণ বিলাপ', 'বঙ্গীয় মহাকোষ', 'ভক্তমাল' প্রভৃতি সম্পাদিত গ্রন্থ তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দান করে।

বঙ্গভাষা ছাড়া জার্মান, ফরাসী, লাতিন, গ্রীক, হিব্রু, পোর্তুগীজ, পালি, তামিল, তেলেগু, হিন্দী প্রভৃতি দেশীয় ও বিদেশীয় ছাব্বিশটি ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল। সুতরাং তদানীন্তনকালে তাঁর মতো বহুভাষাবিজ্ঞ পণ্ডিত, শিক্ষক ও ছাত্রদরদী মানুষ সত্যই দুর্লভ ছিল। সেই সহজ সরল অথচ গভীরতত্ত্বানুরাগী মানুষটি সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেছিলেন: অমূল্যচরণ বিদ্যা-ভূষণের "প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা আমাদের শিক্ষিতসমাজ সকলের কাছে এক বিশেষ সম্মাননার বস্তু। * * আমরা তখন কোনও বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নিরসন করিতে হইলে চলমান অভিধান বা বিশ্বকোষের মতো তাঁহারই দ্বারস্থ হইতাম। * * জ্ঞান ও

বিনয়ের অবতার, সদা পরহিতে নিযুক্ত অতি সরল ও অমায়িক চরিত্রের এই জ্ঞানতপস্বী তাঁহার নিজের জীবৎকালে বঙ্গদেশে ও ভারতের নিরভিমান নিষ্কাম পাণ্ডিত্যের ও জনসেবার আদর্শরূপে আমাদের সমক্ষে বিরাজমান ছিলেন।" আমরাও অন্তরের সঙ্গে একথা স্বীকার করি।

আজ সেই চিরযশস্বী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পুণ্য শতবার্ষিকী সমারোহের উদ্‌যাপন হতে চলেছে। আমরা তাই সকলের সঙ্গে একযোগে মহাপ্রাণ পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অবিস্মরণীয় স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। সার্থক হোক তাঁর শতবার্ষিকী সমারোহ।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

৪।১২।৭৯

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৬তম বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা
মাঘ-চৈত্র
১৩৮৬

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৬তম বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা
মাঘ-চৈত্র
১৩৮৬

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
বর্ষ : ৮৬ । সংখ্যা : ৪
মাঘ-চৈত্র ১৩৮৬ ।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীসুকুমার সেন

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষে যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়-আইন চালু হল তার ফলে বাঙালীর লেখাপড়ার সরণী সুগমতর হল আর উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত বাঙালীর গবেষণা-কার্যের পথ খুলে দেওয়া হল।

তখন দেশে স্বদেশীয়ানার জোয়ার চলছে। বাঙালী সব দিকে নিজের সম্মান বাড়াতে তৎপর হয়েছে। নতুন আইন চালু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা এম. এ. পাশ করলেন তাঁদের মধ্যে দু'তিন জন প্রতিভাশালী ছাত্র ভারততত্ত্বের ও ভারত-ইতিহাসের গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। মুখ্যত নাম করতে পারি তিন জনের,—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের, রমেশচন্দ্র মজুমদারের ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর। এঁরা তিনজনেই পাণ্ডিত্যে ও গবেষণায় নিজেদের যশ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাখালবাবু ও কনিষ্ঠ হেমবাবু। রাখালবাবু এঁদের অগ্রণী ছিলেন। প্রত্নলিপিবিদ্যায় (epigraphy-তে) এঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। (এই সঙ্গে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের নাম করা যায়।) তাছাড়া ভারতের "প্রাচীন ও নবীন ইতিহাস" ভাবনায় রাখালবাবুর একটু বিশেষ বোধ (flair) ছিল। তাঁর বাংলা লেখবার দক্ষতাও বেশ ছিল। তাঁর উপন্যাসগুলিতে তিনি অতীত দিনকে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষবৎ করে গেছেন। তাঁর বিশেষ বোধের একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত হল মোহেন্‌জো-দড়ো-র আবিষ্কার। রাখালবাবুর বিচরণক্ষেত্র ছিল খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে খ্রীস্টপর অষ্টাদশ শতাব্দী।

হেমবাবুর অধিকারক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ। তিনি গুপ্ত ও পাল যুগের পরে নামেনইনি। তবে তাঁর ক্ষেত্র সংকীর্ণ হলেও তিনি কাজ করেছেন খুঁটিয়ে, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ধরনে।

গবেষণাক্ষেত্রের বিস্তার রমেশবাবু রাখালবাবুকেও যেন ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি অবশ্য রাখালবাবুর মত দক্ষ এপিগ্রাফিস্ট ছিলেন না। তিনি ছিলেন ইতিহাস-পণ্ডিত, তবে কোন টেক্‌নিক্যাল বিষয়ে তাঁর ঝোঁক ছিল না। তিনি প্রাচীন ভারতের মোটামুটি আলোচনা করেছিলেন। বহির্ভারতের ইতিহাস আরও ভালো করে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর কৌতূহল ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসেও সম্পূর্ণ সজাগ ছিল। রমেশবাবু ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। দক্ষ শিক্ষক। হেমবাবুও শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু সাধারণতঃ যাঁকে দক্ষ শিক্ষক বলে তিনি তেমন ছিলেন না। রাখাল-বাবু অল্পদিনই শিক্ষকতা করেছিলেন।

ভারতবর্ষের ও ভারতবর্ষ-প্রভাবিত কোন কোন দেশের ইতিহাস বিষয়ে রমেশচন্দ্রের শ্যেনদৃষ্টি ছিল। রাখালবাবুর মতো তাঁরও বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল বাঙালীর ইতিহাস সম্বন্ধে। রাখালবাবু নিজে লিখেছিলেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস' পাঠান আমল পর্যন্ত, আর রমেশচন্দ্র লিখিয়েছিলেন 'History of Bengal' হিন্দু আমল পর্যন্ত। এই বইখানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির রচনা ও সংকলন রমেশচন্দ্রের একটি বিশেষ কীর্তি।

আমার সঙ্গে রমেশবাবুর পরিচয় হয় ১৯৪৮ সালে দ্বারভাঙায় ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্‌স উপলক্ষ্যে। রমেশবাবু যখন ঢাকায় অধ্যাপক ও ভাইস্‌চ্যান্‌সেলর তখন আমি এক আধবার ঢাকায় গেছি, ভাইভা পরীক্ষা নিতে। তখন আলাপ হয় নি। আমার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড বার হলে পরে আমার কৌতূহল ছিল, রমেশবাবু পড়ে কি বলেন। কিছু কাল পরে সুনীতিবাবুর কাছে সে খবর পেয়েছিলুম। উনি বললেন, রমেশবাবু আপনার বইয়ের খুব প্রশংসা করলেন। তবে একটু দুঃখও করলেন। পূর্ববঙ্গ কালচারে হীন ছিল আমার এই মনোভাব ঠিক নয়। শুনেই আমি বুঝতে পারলুম যে উপক্রমণিকা অধ্যায়ে আমার একটি বাক্য রমেশবাবুর মনে ব্যথা দিয়েছে। পরবর্তী সংস্করণ থেকে সে বাক্যটি বাদ পড়েছে। অনেককাল পরে রমেশবাবুকে আমি এই ত্রুটি সংশোধনের কথা বলেছিলুম।

রমেশবাবু স্বাধীনচিত্ত ছিলেন। কারো খাতিরে তিনি ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার অথবা বিকৃত করতে চাইতেন না। এজন্যই তিনি

সরকারের খাতির বা অনুগ্রহ পান নি। সাধারণ জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও তাঁর সংকোচ ছিল না। রামমোহন রায়ের যে মহত্ত্ব শিক্ষিত লোকে প্রায় সকলে স্বীকার করেন রমেশবাবুর বিচারে তা যথার্থ নয়। এখানে আমরা ব্যক্তিগত ঝোঁকের কথা স্বীকার করব।

বছর দুই আগে আমার 'বঙ্গভূমিকা' বইটি আমি রমেশবাবুর কাছে পাঠিয়েছিলুম। তিনি বইটি পড়ে তাঁর মতামত আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। এমন প্রশংসাপত্র আমি আর কখনো পেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

রমেশবাবুর চারিত্র্যে পাণ্ডিত্যমনস্বিতার ও স্বাধীনচিন্তার অখণ্ড সমাবেশ হয়েছিল। এমন মানুষ আর হবে কি?

রমেশচন্দ্র স্মরণে

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

গত ১১ই ফেব্রুয়ারি (১৯৮০খ্রী.) সোমবার ইতিহাসাচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যুতে পৃথিবীতে ভারতবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে একটা উজ্জ্বল যুগের সমাপ্তি ঘটাল। এতে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, কোনদেশে কোনকালেই তা সহজে পূরণ করা সম্ভব হয় না। রমেশচন্দ্রের মত বাণীর একাগ্র আজীবন সাধনা ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে আর দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

রমেশচন্দ্র ৯২ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে মারা গেছেন। ইদানীং কিছুকাল তিনি অসুস্থ ছিলেন। এদিকে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চাকারী-দের মধ্যে তিনি সারা পৃথিবীতে মহাসম্মানিত পণ্ডিত বলে পরিগণিত হয়ে যশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন। জগতের পণ্ডিতসমাজ তাঁকে অশেষ প্রকারে সম্মান দেখিয়েছেন। তাই তাঁর মৃত্যুতে আমাদের শোক প্রকাশ করা ঠিক নয়। আমাদের দুঃখ এই যে, রমেশচন্দ্রের অভাবে আমরা যেন আজ অনেকটা নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছি। তাঁকে আমরা বরাবর আমাদের আশ্রয়স্থল মনে করেছি।

ভারতে এবং বাইরে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে রমেশচন্দ্র অধ্যাপকতা করেছেন। অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মানিত সদস্য করেছে এবং স্বর্ণপদক দিয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যায়তনে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি যেসব বক্তৃতা দিয়েছেন, সেসব পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে তাঁর সুনাম বৃদ্ধি করেছে। রমেশচন্দ্র Indian History Congress কলিকাতা অধিবেশন (১৯৩৯) এবং All India Oriental Conference (দারভাঙ্গা অধিবেশন, ১৯৪৮) সংস্থা দুটির মূল সভাপতি হন এবং দীর্ঘকাল কলিকাতার Asiatic Society এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। UNESCO কর্তৃক তিনি History of Mankind প্রকল্পের Cultural and Scientific Development শাখার অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

রমেশচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার গোপাল-গঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত খান্দারপাড়া গ্রামে। ফরিদপুর এবং মধুখালির মধ্যবর্তী শালকাঠী কৃষ্ণনগর গ্রামে আমার পৈতৃক বাড়ি থেকে খান্দারপাড়ার দূরত্ব খুব বেশী ছিল না। কিন্তু ছেলেবেলা কেবল তাঁর নাম শুনেছি, কখনও তাঁকে চোখে দেখিনি। তিনি ১৯১১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের M. A. degree লাভ করেন এবং ১৯২১ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের Lecturer পদ পরিত্যাগ করে নব প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Professor of History পদে যোগদান করেন। তাই আমি যখন

১৯২৯ সালে মফস্বল থেকে এসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের M. A. class-এ ভর্তি হই তখন এখানেও তাঁকে দেখতে পাই নি। তবে শুনেছিলাম যে, তিনি আমাদের M. A. পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন। যাই হোক, কয়েক বৎসর পরে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার সংযোগের সূত্রপাত হল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Journal of the Department of Letters পত্রিকার ২৬শ খণ্ডে (১৯৩৫) আমার The Successors of the Satavahanas in the Eastern Deccan (১-১২৬ পৃষ্ঠা) সংজ্ঞক একটি গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমাকে ঐ পুস্তিকাখানির ১০০ খণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং তা থেকে আমি তৎকালীন জগতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভারততত্ত্ববেত্তাদের কাছে এক এক খণ্ড পাঠিয়ে তাঁদের মতামত জানতে চেয়েছিলাম। স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র ছিলেন ঐ পণ্ডিতগণের মধ্যে অন্যতম। আশ্চর্যের বিষয়, বইখানি পেয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি জানিয়ে দিলেন, You have advanced our knowledge of the subject much further. আমার গবেষকজীবনের প্রারম্ভে তাঁর মত খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের এই প্রশংসাবাণী আমাকে যে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, এই ঘটনা থেকে আমি পণ্ডিত হিসাবে রমেশচন্দ্রের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট এবং শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিলাম। আমি তখন বুঝেছিলাম এবং পরে আরও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের শ্রমবিমুখ দেশে রমেশচন্দ্র একজন অসাধারণ কর্মযোগী। গবেষণামূলক রচনা সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতেরই হোক কিংবা আমার মত অখ্যাত অজ্ঞাত নবীনেরই হোক, পাওয়া মাত্রই তিনি পড়ে ফেলে তার মূল্য বিচার করতেন এবং যথাসময়ে যথাযোগ্যভাবে সেটা কাজে লাগাতেন। এতে তাঁর সহায়ক ছিল তাঁর প্রতিভা, কর্মদক্ষতা, অধ্যবসায়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি এবং বিচার ও যুক্তি-প্রয়োগের নিপুণতা। আর প্রধানতঃ এই গুণেই তিনি ভারতীয় ঐতিহাসিক সমাজের শীর্ষস্থানে উঠতে পেরেছিলেন।

আমার যে বইখানি রমেশচন্দ্রকে পড়তে দিয়েছিলাম, তার সূত্রেই ক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক গড়ে উঠল। ঐ সময় আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির প্রার্থী ছিলাম। তার জন্য উপস্থাপিত আমার গবেষণা-নিবন্ধের সঙ্গে আমার ঐ ছাপা পুস্তিকাটি সংযুক্ত ছিল। রমেশচন্দ্র আমার নিবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন না। তিনি অন্য একজন বৃত্তিপ্রার্থীর পরীক্ষক হিসাবে পরীক্ষকমণ্ডলীর সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমার বইখানা পড়া থাকায় তিনি আমাকে বৃত্তিদানের প্রস্তাব সমর্থন করেন। এর কিছুকাল পরে আমি তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি পাই। তাতে আমাকে বলা হয়েছিল যে, তিনি কলিকাতা আসছেন এবং আমি যেন একটা নির্দিষ্ট দিনের সন্ধ্যাবেলা দক্ষিণ কলিকাতায় এক বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

নির্ধারিত তারিখে আমি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রকে প্রথম দেখলাম। তিনি সেদিন আমাকে বললেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice Chancellor নিযুক্ত হওয়ায়, তিনি সেখানে আর প্রাচীন বাংলার শিলালেখ ও তাম্রশাসন পড়াতে পারবেন না; তাই তার জন্য সেখানে একজন নূতন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। ঐ কাজের জন্য আমাকে তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নানা কারণে তাঁর সেই ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয়নি।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই, একজন একটা গবেষণা-নিবন্ধ লিখে উপাধি পেলেন এবং ফলে একটা চাকরিও জুটে গেল; কিন্তু পরে আর তিনি সারা জীবনে কিছু লিখলেন না বা সামান্যমাত্রই লিখলেন। এদিকে রমেশচন্দ্র তাঁর দীর্ঘ জীবনের ৬০।৭০ বৎসর বাগ্‌দেবীর সাধনায় নিরলসভাবে কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁর বিপুল অধ্যবসায়ের জন্য তাঁর গবেষণাক্ষেত্রের পরিধি ছিল বহুবিস্তৃত। তাই তিনি নানা বিষয়ে অগণিত গ্রন্থাদি লিখে যেতে পেরেছেন। তিনি ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগ এবং আধুনিক ও অত্যাধুনিক কালসম্পর্কে রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিখে গেছেন। তাছাড়া, পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়াতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার এবং শিলালেখ ও তাম্রশাসনের উপরেও তাঁর অজস্র রচনা আছে। ভারতে এবং এদেশের বাইরে এটা অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব।

রমেশচন্দ্রের প্রথমদিকের রচনা প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ ও Griffith বৃত্তির জন্য গবেষণা-নিবন্ধ হিসাবে লিখিত হয়েছিল। এরমধ্যে Kushan Chronology (Part I) এবং The Gurjara-Pratiharas কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters পত্রিকার ১ম ও ১০ম খণ্ডে ১৯২০ এবং ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে তাঁর Doctor of Philosophy উপাধির জন্য লিখিত গবেষণা-নিবন্ধ Corporate Life in Ancient India ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে মুদ্রিত হয়েছিল। শীঘ্রই তিনি Early History of Bengal (১৯২৪) এবং Ancient Indian History and Civilization (১৯২৭) লিখে তাঁর পাণ্ডিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এর দ্বিতীয় গ্রন্থটি পরে Ancient India (১৯৫২) নামে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে পুনঃ প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সময়েই Hindu Colonies in the Far East সংজ্ঞক গ্রন্থমালার ১ম খণ্ড Champa (১৯২৭) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থমালার ২য় খণ্ড Suvarnadvipa দুইভাগে ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত। এই বিষয়ে রমেশচন্দ্রের আর যে সব বই বেরিয়েছে, তার মধ্যে Hindu Colonies in the Far East (১৯৪৪) এবং Inscriptions of Kambuja (১৯৫৩) নামক দুটি গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর সঙ্কলিত The Classical Accounts of India (১৯৬১) বহুব্যবহৃত গ্রন্থ।

'রামচরিত', 'রাজবিজয় নাটক', 'বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ—মধ্যযুগ)'

ইত্যাদি পুস্তক রমেশচন্দ্র অন্যের সহযোগিতায় প্রকাশ করেছেন। শেষোক্ত বইখানির প্রথম ভাগ বহুপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। এর ৩য় ও ৪র্থ ভাগ সম্প্রতি বেরিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal (১ম খণ্ড, ১৯৪৩) এবং বোম্বাই ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত The History and Culture of the Indian People (১ম থেকে ১১শ খণ্ড) রমেশচন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত। তাঁর The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 আধুনিক যুগ এবং তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ History of the Freedom Movement of India অত্যাধুনিক যুগ সম্বন্ধীয় ইতিহাস নিয়ে লিখিত। বিলাত থেকে বিভিন্ন পণ্ডিতের রচনায় সমৃদ্ধ Cambridge History of India নামক বিখ্যাত গ্রন্থের অনুসরণে ঐ ধরনের যেসব বই ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে History of Bengal সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম এবং The History and Culture of the Indian People যুগান্তকারী। এই প্রকার গ্রন্থের মূল্য নির্ভর করে সম্পাদকের পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের উপর, আর এই দুটি গুণ ভারতবর্ষে দুর্লভ। তাই মহাপণ্ডিত রমেশচন্দ্রের পক্ষে এ ক্ষেত্রে যে বিরাট সাফল্যলাভ সম্ভব হয়েছে, অন্য কোন সম্পাদকের পক্ষে তা দেখা যায় নি।

রমেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাতে তাঁর কথা মনে হলেই কতকগুলি ব্যক্তিগত ঘটনা এসে পড়ে। আমাদের দেশের পণ্ডিতসমাজে পরমতসহিষ্ণুতা সুদুর্লভ। তাই কারও কারও মতের সমালোচনা করেছি বলে তাঁরা আমাকে তাদের শত্রু মনে করেন। অথচ রমেশচন্দ্রের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে আমার যেসব বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে তিনি বুঝেছিলেন যে ঐতিহাসিক সত্যনিরূপণই আমার উদ্দেশ্য, তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করা আমার কাম্য ছিল না। তাই তাঁর স্নেহ থেকে আমাকে বঞ্চিত হতে হয়নি।

১৯৪৭ সালে আমি ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের লেখবিদ্যাশাখায় কর্মচারী নির্বাচিত হই। নির্বাচকমণ্ডলীর সভায় রমেশচন্দ্র প্রার্থীদের ইতিহাসজ্ঞান পরীক্ষা করেছিলেন। স্বর্গত নিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী মহাশয় প্রথমে আমাকে কতকগুলি আদি, মধ্য ও অন্ত্যযুগীয় ব্রাহ্মীলেখ পড়তে দিলেন। তারপর রমেশচন্দ্রের পালা। তিনি আমাকে বললেন, I shall ask you a question which you may consider to be of the Matriculation standard. Since, however, I have put it to the other candidates, I am putting the same to you. অবশ্য একথা বলার কারণ এই যে, আমি তাঁর আগে তাঁর The History and Culture of the India People গ্রন্থের জন্য নির্ধারিত বহুসংখ্যক অধ্যায় লিখে দিয়েছিলাম এবং তিনি আরও জানতেন যে, স্বর্গীয় ডক্টর হেমচন্দ্র রায় মহাশয় কলম্বো চলে যাওয়ায় এবং স্বর্গীয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় অসুস্থ হওয়ায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে তাঁদের রাজনীতিক ইতিহাসের class-গুলি

তখন আমাকে নিতে হচ্ছিলো। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যের সম্মুখে আমার পাণ্ডিত্যের প্রতি ইঙ্গিত করাতে আমি নিজেকে পুরস্কৃত বোধ করেছিলাম। আমি যখন ১৯৭৪ সালে University of Pennsylvania-র Visiting Professor-রূপে আমেরিকার Philadelphia-তে যাই, তখন এখানকার পণ্ডিতগণের আয়োজিত বিদায় সংবর্ধনায় রমেশচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সেদিন আমার আর একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন তিনি স্বর্গীয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সেখানে তাঁরা দুজনে যা বলেছিলেন, তাতে আমার প্রতি তাঁদের গভীর স্নেহ প্রকাশ পেয়েছিল।

রমেশচন্দ্র আমাদের জন্য অগণিত রচনা রেখে গেছেন। তার মধ্যে এখানে ওখানে এমন কিছু থাকা অসম্ভব নয় যা কারও কারও কাছে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে। সমস্ত পাঠকেরই প্রশংসা পেয়েছে, জগতে এমন কোন রচনা কোনদিন লিখিত হয় নি। অবশ্য যিনি সামান্যমাত্র লেখেন, কিংবা লেখেন না, কেবল কথাই বলে চলে যান, তাঁর, ভুলভ্রান্তি প্রমাণ করা কঠিন। আজ তাঁর মৃত্যুজনিত শোকচ্ছায়ায় বসে রমেশচন্দ্রের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা না তোলাই ভাল। কিন্তু একটা বিষয়ের উল্লেখ করাই উচিত মনে হচ্ছে। আজকাল একশ্রেণীর লেখক ইতিহাসাচার্য রমেশচন্দ্রের অসামান্য কৃতিত্বকে ছোট করে দেখিয়ে জাহির করতে চান যে তাঁদের নিজেদের ঐতিহাসিক রচনা অনেক উচ্চ মানের। কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতেই দেখা যায়, রমেশচন্দ্রের জীবন-ব্যাপী একাগ্র সাধনার পাশে এই সমালোচকদের ইতিহাসচর্চা তেমন নজরে পড়বার মত কিছু নয়। রমেশচন্দ্রের অগণিত রচনাসম্ভার যদি একটা বটবৃক্ষ হয়, তবে এঁদের রচনা তার পাশে একটা ভেরাণ্ডাগাছের চেয়ে বড় হবে না। অবশ্য এঁরা এবং এঁদের বন্ধুগণ মনে করেন যে, এঁদের রচনা এক এক খণ্ড হীরক; তার অতি ক্ষুদ্রকণাও রমেশচন্দ্রের রচনার বিরাট ভস্মস্তূপের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান্। কিন্তু এই সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের চর্চা করেন এবং তাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও রচনাবলীর মূল্য সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা আছে। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, এঁদের রচনায় তথ্যগত ত্রুটির কোন অভাব নেই এবং অনেক সময় কোন একটা বিষয় সম্বন্ধে আশানুরূপ পড়াশোনা না করেই এঁরা গুরুগম্ভীর মতামত ব্যক্ত করেন। যাহোক, বাগ্দেবীর কৃপায় রমেশচন্দ্র ছিলেন 'শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ'; দুর্লভ সাধনার সিদ্ধিফল তাঁর পক্ষে অনায়াসলভ্য ছিল। তাঁর পাশে তার সমালোচকদের বাগাড়ম্বর শুনে মনে পড়ে—'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।'

আমি রমেশচন্দ্রের ছাত্র না হয়েও চিরদিন নিজেকে তাঁর ছাত্রস্থানীয় মনে করেছি। আমার মত তাঁর ছাত্র জগতের নানা দেশের ভারতবিদ্যাচর্চাকারীদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তিনি যদিও বাংলাদেশে জন্মেছিলেন, তাঁর কীর্তি সারা ভারতে, সারা বিশ্বে বিস্তৃত। রমেশচন্দ্র কেবল বাংলার বা ভারতের নন, তিনি সমস্ত জগতের।*

* প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৮ ফাল্গুন ১৩৮৬ তারিখে রমেশচন্দ্রের স্মৃতি-সভায় পঠিত।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র

শ্রীজগদীশনারায়ণ সরকার

ভারতের প্রখ্যাত ও সর্বজ্যেষ্ঠ, ও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর স্মরণ-সভায় শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস মহাশয় আমাকে অনুরোধ করে সম্মানিত করেছেন। আচার্যের ধূপের ধোঁয়ায় ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। আমাদেরও মন ভারাক্রান্ত। মৌনতার মধ্যেই প্রকৃষ্ট শ্রদ্ধা নিবেদন হত। তবু কিছু বলতে হ'বে। এ সময়ে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ্ ও ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার সাফল্যের আলোচনা করা সমীচীন বা সম্ভব হ'বে না। তাই সংক্ষেপে তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব।

আচার্য রমেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘকালের নয়। ছাত্ররূপে তাঁর পদতলে বসবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি যখন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তিনি কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তবুও সব সময়ে আমি নিজেকে তাঁর ছাত্ররূপেই মনে করতাম। তিনি ছিলেন আমার শিক্ষক, পাটনা কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড: সুবিমলচন্দ্র সরকারের সমসাময়িক। এঁর কনিষ্ঠভ্রাতা অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকারকে আপনারা সকলেই জানেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে পাটনা কলেজে আমার বন্ধু ও সহকর্মী ড. কালীকিঙ্কর দত্তের কাছ থেকে আচার্য রমেশচন্দ্রের চরিত্রের অনেক গুণাবলীর ও শিক্ষক হিসাবে তাঁর যোগ্যতার কথা দূরাগত বাঁশীর সুরের মত শুনেছি। তাঁকে প্রথমে আমি পাটনায় দেখি যখন তিনি সেখানে এম. এ. পরীক্ষার অথবা পি. এইচ-ডি গবেষণা পত্রের পরীক্ষক অথবা বিহার ও উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির বাৎসরিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যেতেন। পাটনায় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পত্রের এম. এ. ক্লাসের ছাত্রদের নিকটে পরীক্ষকরূপে তাঁর নাম আতঙ্কের সৃষ্টি করত, কারণ তিনি অত্যন্ত কঠোর পরীক্ষকরূপে ছাত্রদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। যাঁরা অন্য বিষয়ে ৫০-৬০ নম্বর পেতেন, তাঁরা আচার্য মজুমদারের কাছে ৩৫-৪৫ নম্বরের বেশী পেতেন না। কিন্তু পাটনা কলেজে অথবা বিহার রিসার্চ সোসাইটিতে তিনি যে সব ভাষণ দিতেন তা ছিলো খুবই তথ্যসমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয়। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা শ্রোতাদের মুগ্ধ ক'রত। পাটনা কলেজের ছাত্র ও পরে শিক্ষকরূপে আমাকে আচার্য রমেশচন্দ্র রচিত প্রাচীন কলেজের

ও বৃহত্তর ভারত-সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে হয়। তাঁর রচনাসমূহ আমাদের জ্ঞানের শূন্যতা পূরণ করে, ইতিহাসের অনেক ভুল ধারণা সংশোধন করতে সাহায্য করে এবং আমাদের সামনে জ্ঞানের এক অজানা দেশের দৃশ্যপট পরিস্ফুট করে তোলে।

প্রকৃতপক্ষে তাঁরই জন্য আমার পক্ষে বিহার সরকারী চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডারের পদে এবং পরে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়। মনোনয়ন কমিটির সদস্যরূপে আচার্য রমেশচন্দ্র ও স্বর্গত ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ আমার নাম সুপারিশ করেন। তারপর থেকে আচার্যের সঙ্গে আমার যোগাযোগ গত ১৮ বছর ধরে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। যখনই কোন ব্যক্তিগত কারণে অথবা গবেষণা-বিষয়ক সমস্যা সমাধানে তাঁর কাছে আমি গেছি, তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন ও সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। কোন বিতর্কিত বিষয় সমাধানের প্রয়োজনে তিনি তাঁর অমূল্য গ্রন্থরাজি থেকে আমার জন্য গ্রন্থ খুঁজে দিয়েছেন, যত্ন নিয়ে আমার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠ করে মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং খুব দ্রুত আমার পত্রের উত্তর দিয়েছেন। গবেষকদের সাহায্য করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ কতটা, তা এই কয়টি দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়। সম্প্রতি এসিয়াটিক সোসাইটি যে আমাকে 'যদুনাথ-স্বর্ণপদক' প্রদান করেছেন তার মূলেও আচার্য মজুমদারের সুপারিশ ছিল। দুর্ভাগ্যবশত আমি পদক নিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে পারি নি, কারণ তিনি তখন অত্যন্ত অসুস্থ। জীবদ্দশায় ডঃ সুনীতিকুমারের মত তিনিও তাঁর পায়ে হাত দিয়ে কখনো প্রণাম করতে দেন নি। মৃত্যুর পর কেওড়াতলা মহশ্মশানে তাঁর শবাধার স্পর্শ করে তাঁর প্রতি আমার অন্তিম প্রণাম জানাই।

প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিকযুগের ভারতের ইতিহাস নিয়ে আচার্য রমেশচন্দ্র যে অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন তা নিয়ে বিস্তৃত ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে আমি তাঁর ইতিহাস রচনার ধরন ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করব।

উনিশ শতকের বাংলায় নানা মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা ভারতের সাংস্কৃতিক উন্মেষে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন ও অনেকেই সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন, অক্ষয়কুমার মৈত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিমানবিহারী মজুমদার। এঁদের মধ্যে দুজন উদীয়মান ঐতিহাসিক ছিলেন, যাঁদের যশ বর্তমান শতকে ভারতকে ছাপিয়ে বিশাল বিশ্বেও ব্যাপ্ত হয়েছিল। এঁদের দুজনের জীবন একশো বছরেরও বেশি। যদুনাথ সরকার জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭০ সালে, রমেশচন্দ্র তার ১৮ বছর পরে ১৮৮৮ সালে। আজ রমেশচন্দ্রের তিরোধানে ভারতীয় ইতিহাস রচনারও প্রায় একশ বছর পূর্তি হ'ল।

যদুনাথ আমাদের দেশে সর্বপ্রথম ইতিহাস রচনায় বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। আচার্য রমেশচন্দ্রও ভিন্ন ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। স্যার যদুনাথের রচনাপঞ্জী, বক্তৃতা ও আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তিনি ইতিহাসের যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ করা, আর তা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। আচার্য রমেশচন্দ্রের রচনাপদ্ধতির মধ্যেও একই মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। আচার্য রমেশচন্দ্র মনে করেন, উন্নতমানের ঐতিহাসিক রচনার প্রয়োজনে নিম্নে উল্লিখিত কয়েকটি নীতি ও পদ্ধতি মেনে চলা উচিত :

(১) কোনো বিষয়ে লিখতে হলে সম্ভবপর সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো তথ্য পরিহার করা গর্হিত অপরাধ। তথ্যের ভিত্তিতে জ্ঞানলাভের পূর্বেই কোন ধারণার বা তত্ত্বের বশবর্তী হয়ে লিখলে তা কখনই ভালো হতে পারে না। (দ্র: Freedom Movement এবং Sepoy Mutiny & Revolt of 1857)।

(২) তথ্যসমূহ বিচারকের মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করতে হবে, উকিলের মনোভাব নিয়ে নয়। আটশত বছর পূর্বে কাশ্মীরের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কল্হন্ এই কথাই বলেছিলেন। স্যার যদুনাথও একই মনোভাব ব্যক্ত করেন (দ্র: ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকটে লেখা স্যার যদুনাথের পত্র)।

(৩) ইতিহাস-রচনায় স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। র‍্যাঙ্কের ও স্যার যদুনাথের মত, আচার্য রমেশচন্দ্রও ইতিহাস রচনায় সত্যনিষ্ঠ হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। স্যার যদুনাথ বলেন, পরিণতির কথা ভেবে বিচলিত না হয়ে ঐতিহাসিকের কর্তব্য হলো সত্যকে উদ্ঘাটিত করা। আচার্য রমেশচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে স্যার যদুনাথের আদর্শবাণী উদ্ধৃত করে ঐতিহাসিকদের সত্যনিষ্ঠ হবার কথা বলেন। আচার্য রমেশচন্দ্র রচিত দুখানি গ্রন্থে স্যার যদুনাথের যে বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়, তা হল :

"I do not care whether truth is pleasant or unpleasant and in consonance with or opposed to current views. I would not mind in the least whether truth is or is not a blow to the glory of my country. If necessary, I shall bear in patience the ridicule and slander of friends and society for the sake of preaching truth. But still I shall seek truth, understand truth and accept truth. This should be the first resolvd of a historian" (দ্র: বাংলার ইতিহাস এবং Historiography in Modern India)।

আচার্য রমেশচন্দ্র নিজেও এই বিষয়ে যে মন্তব্য করেন তা উল্লেখযোগ্য :

"Truth, nothing but truth, and as far as possible the whole truth, should form the steel frame of history, on which you may

build a structure according to different plots, rhythms, plans or patterns in which you believe according to your philosophy of history." সুতরাং বলা যেতে পারে রমেশচন্দ্র হলেন যদুনাথের প্রকৃত ভাবশিষ্য।

(৪) আচার্য রমেশচন্দ্র মনে করেন, বৈজ্ঞানিকের মতে ঐতিহাসিককেও এক বিশুদ্ধ বস্তুগত মনোভাব নিয়ে ইতিহাস রচনা করতে হবে। যদিও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা কষ্টকর, তাহলেও এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি কোনমতেই পরিহার করা যায় না। যাঁরা দলীয় নির্দেশে বা বিশেষ মত অনুযায়ী ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেন তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

এই সমস্ত নীতি ইতিহাস রচনায় অপরিহার্য হলেও তা সব সময়ে মেনে চলা কষ্টকর তা আমি ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে (Thoughts on Indian History) উল্লেখ করেছিলাম। আমি আচার্যকে এই মুদ্রিত ভাষণ দিই ও পরে মতামত জিজ্ঞাসা করি কিন্তু তিনি কোন বিরূপ মন্তব্য করেন নি।

প্রসঙ্গত আমি আচার্য রমেশচন্দ্রের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক এখানে উল্লেখ করতে চাই। তিনি সর্বসময়ে নির্ভীকভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। আমি এক নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পারি, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের এক অধিবেশনে যখন তাঁর এক উত্তরভারতীয় সহকর্মী তাঁকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে ভীতি প্রদর্শন করেন, তখন আচার্য রমেশচন্দ্র বলেন, জীবনে তিনি অনেকবার এই ধরনের ভীতি প্রদর্শনের সম্মুখীন হয়েছেন। তাই তাঁকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তাঁর নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত করা যাবে না।

তাঁর গ্রন্থের কোন কোন মতামত সম্পর্কে হয়ত দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ আছে। তাহলেও আমাদের জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত করার ব্যাপারে ও ইতিহাস রচনায় তাঁর অসামান্য অবদান সম্পর্কে কোনই বিতর্কের অবকাশ নেই। যদি 'কেমব্রিজ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থরাজিকে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে গণ্য করা যায়, তাহলে একই কারণে আচার্য রমেশচন্দ্র সম্পাদিত, ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত 'হিষ্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অব দি ইণ্ডিয়ান পিপল' গ্রন্থরাজিকেও ভারতীয় ঐতিহাসিকদের এক মূল্যবান অবদান হিসেবে উল্লেখ করা যায়। আর এই ইতিহাস শুধু রাজনৈতিক বা রাজা-উজীরদের ইতিহাস নয়। পিপল বা জনসাধারণেরও ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতিরও ইতিহাস।

ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে আচার্য রমেশচন্দ্রের চিন্তাধারা এবং আধুনিক ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যায় তাঁর মতামত, তাঁর অসংখ্য রচনাবলী ও ভাষণসমূহ থেকে জানা যায়। তিনি অধুনা বিলুপ্ত 'ইতিহাস' পত্রিকায় 'স্মৃতিকথা' শিরোনামায় যে স্মৃতিচারণ করেন ও সম্প্রতি যে আত্মকথা

লিখেছেন তাতে এই সব বিষয়ে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি সবাইকে বিস্মিত করে।

ইতিহাস সাধনার ক্ষেত্রে যদুনাথ ও রমেশচন্দ্রের কিছু সাদৃশ্য ও কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। স্যার যদুনাথের মতই তাঁর গবেষণার ফসল প্রাচুর্যপূর্ণ। স্যার যদুনাথের অবদানের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র খর্ব না করেও এই কথা বলা চলে যে, আচার্য রমেশচন্দ্রের গবেষণার ক্ষেত্র স্যার যদুনাথের চেয়ে অনেক বেশী প্রসারিত। স্যার যদুনাথ রচিত India through the Age গ্রন্থখানি বাদ দিলে দেখা যাবে তিনি ভারতীয় ইতিহাসের ১৫০ বছর নিয়ে গবেষণায় রত ছিলেন (সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত)। আর অন্যদিকে আচার্য রমেশচন্দ্র প্রাচীন ভারত থেকে আরম্ভ করে আধুনিক ভারত পর্যন্ত পরিক্রমা করেছেন। অসংখ্য তথ্যের সাহায্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতের ওপর তিনি আলোকপাত করেছেন। আর একই সঙ্গে মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাসের কাঠামোকে সুদৃঢ় করে তোলেন। বলা যেতে পারে ইতিহাস চর্চায় যদুনাথ অণুবীক্ষণ (miscroscope) ব্যবহার করেছেন, রমেশচন্দ্র প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে অনুবীক্ষণ ও মধ্যযুগীয় ও বর্তমান ভারতীয় ইতিহাসে ব্যবহার করেছেন দূরবীক্ষণ (telescope)। আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস রচনার প্রথম পর্যায়ে স্যার যদুনাথ একইসঙ্গে খননকারী ও স্থপতি ছিলেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তা বোঝা যাবে। তাঁর 'শিবাজী' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানি ফার্সি, মারাঠী, রাজস্থানী, ইংরেজি, ডাচ, পর্তুগীজ ও আরও বিভিন্ন তথ্য নির্ভর করে রচিত। এই গ্রন্থখানি পাঠ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে কি অক্লান্ত অধ্যবসায় ও মনীষা সহকারে স্যার যদুনাথ আধুনিক পদ্ধতিতে ভারতীয় ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত করেন। তাঁকে সেই আমলে অনেক অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়। বলতে গেলে তখন তো ভারতীয় ইতিহাস-রচনার এক বিস্মৃত ঊষাকালমাত্র। আর আচার্য রমেশচন্দ্র এমন সময়ে কলম ধরেন যখন ইতিহাস চর্চার অনেক সমৃদ্ধি ঘটেছে, যেন মধ্যাহ্ন গগনের দীপ্ত আলোময় ভুবন। তাই স্যার যদুনাথের চেয়ে অনেক অনুকূল পরিবেশে তিনি প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হন। আচার্য রমেশচন্দ্র স্যার যদুনাথের অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাই আমরা দেখি তাঁর রচনায় ও ভাষণে স্যার যদুনাথের অবদানের উল্লেখ। কিন্তু ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে রমেশচন্দ্র এক ত্রিকালদর্শী সাধক ঐতিহাসিক। যিনি প্রাচীন ভারত মধ্যকালীন ভারত ও বর্তমান ভারত এই তিন ক্ষেত্রেই সমসাফল্যের সহিত বিচরণ করেছেন। আগামী একশ বছরেও এই বিশাল জ্ঞানের পরিধি আয়ত্তে কেউ আনতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাঁকে সহজেই last of the Mohawks বলা চলে।

আর একটি বিষয়েও এই দুইজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা

যায়। তাঁদের ইংরেজি রচনাশৈলী ও ইতিহাস রচনা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। উভয়েই খুব সুখপাঠ্য, readable। কিন্তু স্যার যদুনাথ খুব অল্প কথায় তাঁর বিষয়টি আলোচনা করতেন। তিনি ধরে নিতেন, তাঁর পাঠকেরা অনেক কিছুই জানেন। তিনি মূলতঃ তথ্যনির্ভর যুক্তির অবতারণা করলেও অনেক সময়ে পাঠকদের মনে কিছুটা শূন্যতা থেকে যায়। অন্যদিকে আচার্য রমেশচন্দ্র তথ্য, যুক্তি দিয়ে বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করায় পাঠকেরা সহজেই তা বুঝতে পারেন।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্যার যদুনাথ-জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে স্যার যদুনাথের রচনাপঞ্জির ও পত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়। সেই প্রদর্শনীতে ড. জি. এস. সরদেশাইকে লিখিত একটি পত্রও ছিলো। এই পত্রে স্যার যদুনাথ রমেশচন্দ্রকে এক বিশেষ কাজের উপযোগী মনে করেন। আচার্য রমেশচন্দ্র এই পত্রখানার বিষয়ে তখনই জানতে পারেন এবং তা পাঠ করে মন্তব্য করেন, এই ছিলো স্যার যদুনাথের চরিত্রের এক উল্লেখযোগ্য দিক। তিনি কখনই রমেশচন্দ্রকে এই বিষয়ে কিছু বলেননি, অথচ তাঁর সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করে পাঠান। আমিও ঐ প্রদর্শনীতে তখন উপস্থিত ছিলাম।

কয়েক বিষয়ে যদুনাথ ও রমেশচন্দ্রের জীবনে আশ্চর্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পারিবারিক শোকতাপের মধ্যেও উভয়কেই দেখি অবিচলিত। উভয়েই জীবনের উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন কর্মযোগীর নিরলস সাধনায়। উভয়কেই নিজ মতামতের উপর বিশেষ আস্থা রাখতেন বা জোর দিতেন। যেটা ঠিক বলে মনে করতেন নোঙ্গরের মত তাকেই আঁকড়ে থাকতেন। কোন প্রকার ভীতি প্রদর্শন বা চাপের নিকট নতি স্বীকার করেন নি। ভারত সরকারের সঙ্গেও রমেশচন্দ্রের মত বিরোধ হয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও ১৮৫৭ বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা নিয়ে।

দুজনেই সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করেছেন। উভয়েই মৃত্যুকাল পর্যন্ত কাজে লিপ্ত ছিলেন, যাকে বলে died in harness। ওদের উভয়েরই মৃত্যু সাধকের ও সুফীর ঈপ্সিত। আমরা বেঁচে রইলাম অপরিমেয় ক্ষতি সহ্য করবার জন্য। রমেশচন্দ্র আগেও কয়েকবার সেরে উঠেছিলেন এবারেও আশা করেছিলাম যে সেরে উঠবেন।

উভয়েই জীবনের কর্ম-ক্রম শেষ করে এনেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে যদুনাথ আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে তিনি ভারতের সামরিক ইতিহাস লিখছেন আলেকজান্দার থেকে ওয়েলিংটন পর্যন্ত ও এই তার শেষ কাজ। রমেশচন্দ্র ১১ খণ্ডে সমাপ্ত ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সম্পাদন শেষ করে চেয়েছিলেন শান্তিতে মৃত্যু। কিন্তু কর্মযোগী ও সাধকের পক্ষে আলস্যে কালাতিপাত করা সম্ভব নয়। যদুনাথ তাঁর সামরিক ইতিহাস শেষ করতে পারেন নি। রমেশচন্দ্র 'Lessons of Indian History' লিখতে মাত্র শুরু করেছিলেন।

আমাদের দেশে একদল তরুণ ঐতিহাসিকের উদ্ভব হচ্ছে যাদের ঐতিহ্য ও ইতিহাস দর্শন ভিন্নপথাবলম্বী। আচার্য মজুমদারের প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষ করছি এক দৃঢ় বিশ্বাস ও আশা নিয়ে। আমি বিশ্বাস করি আচার্যের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত তাঁর উত্তরসূরাদের অনুপ্রাণিত করবে—সত্যকে খোঁজা ও নিরলস সাধনা। আশা রাখি যে যেমন কিছু তরুণ লেখক আজকাল যদুনাথের ঐতিহাসিক চরিত্র হনন করার চেষ্টা করেছেন, আচার্য মজুমদার যেন তদনুরূপ ভাগ্য থেকে রেহাই পান। তাঁর সমালোচকদের কাছে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করব যে তাঁরা তাঁর রচনাবলী ও চিন্তাধারা মনের সাধ মিটিয়ে ব্যবচ্ছেদ করুন. কিন্তু পিছনে যে ব্যক্তি আছেন তাঁকে যেন মরণোত্তর হত্যা না করেন।*

* প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৮ ফাল্গুন ১৩৮৬ তারিখে রমেশচন্দ্রের স্মৃতিসভায় পঠিত।

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

আধুনিক কালের ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দু'জন ঐতিহাসিক একে একে ইহলোক ত্যাগ করলেন। আচার্য যদুনাথ সরকার চিরবিদায় নিলেন ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে এবং আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারকে আমরা হারালাম এ-বছর ১১ই ফেব্রুয়ারি। আমি এঁদের দু'জনকেই অনেককাল ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার ও জানবার সুযোগ পেয়েছি। ১৯২১ সনে আচার্য রমেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন তিনি ঐ নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন এবং বি. এ. ক্লাশে তার ছাত্র ছিলাম। আচার্য যদুনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় ও পরে ঘনিষ্ঠতা হয় ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণাকালে।

আচার্য রমেশচন্দ্র ১৯৭৫ সনের ১১ই আগস্ট অত্যন্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এর কিছুদিন পরে একটু ভাল হলে তিনি আমাকে লেখেন, "I had a heart-stroke on 11 August and am still very weak. I am now in my daughter's house." এর পরেও তাঁর ইতিহাস রচনার কাজ একেবারে বন্ধ হয় নি, কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে আলাপে ও তাঁর চিঠিতে বুঝতে পেরেছিলাম যে, তিনি পূর্বের স্বাস্থ্য ও শক্তি আর ফিরে পান নি। ১৯৭৭ সনের ১০ই নভেম্বর তিনি আমাকে আর একবার লিখেছিলেন, "আমার শরীর এখনও খুব দুর্বল। বয়স ৮৯ পূর্ণ হইল—সুতরাং আবার সবল হইবার সম্ভাবনা কম।" প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বরাবরই চলছিল, কিন্তু পরে আরও কঠিন রোগ নতুনভাবে আক্রমণ করল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে আরোগ্য করার সমস্ত চেষ্টাই সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বর্তমান বাংলা দেশের ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত খান্দারপাড়া নামে একটি ছোট গ্রামে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয়েছিল। এই গ্রাম তখন ছিল মাদারীপুর মহকুমার অধীন, পরে ইহা গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর পিতার নাম হলধর মজুমদার; ইনি আগরতলায় ত্রিপুরা এস্টেটের রাজার উকিল ছিলেন এবং মাঝে মাঝে দেশের বাড়িতে আসতেন। দেশে তাঁর যৌথ বৃহৎ পরিবার ভরণ-পোষণের জন্য রমেশচন্দ্রের শৈশব ও বাল্যকাল দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। তাঁর মাতা বিধুমুখী দেবী ছিলেন মহারাজা রাজবল্লভের "ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ" প্রসন্নকুমার সেনের একমাত্র কন্যা। দুর্ভাগ্যবশতঃ, তিনি মারা যান রমেশচন্দ্রের দেড় বছর বয়সের সময়ে, এর পরে তাঁর জেঠীমা তাঁকে প্রতিপালন করেন। সুতরাং তাঁর শৈশবকাল বেশ দুঃখের

মধ্যে কেটেছে। একদিকে দারিদ্র্য, অপরদিকে মাতৃবিয়োগ। পাঁচ বছর বয়সে রমেশ চন্দ্রের প্রথম বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় গ্রামের মাইনর স্কুলে এবং প্রায় বার বছর পর্যন্ত তিনি এই স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। তারপর কলকাতায় গিয়ে তিনি প্রথম ভর্তি হন সাউথ সুবার্বান স্কুলে, পরে জেনারেল অ্যাসেম্বলি স্কুলে ; তৎপর একে একে ঢাকা, হুগলি, আবার কলকাতা এবং শেষে কটকে যান। শেষোক্ত স্থানের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯০৫ সনে তিনি প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাশ করেন। মেধাবী ছাত্ররূপে তাঁর বেশ সুনাম ছিল এবং এত স্থান ও বিদ্যালয় পরিবর্তন করতে হলেও তাঁর পরীক্ষার ফল বরাবর সন্তোষজনক ছিল।

এফ. এ. পড়ার জন্য তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু বরিশালে প্রায়ই পেটের অসুখে ভুগতে থাকায় তিনি কলকাতা চলে আসেন এবং রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ভর্তি হন। ১৯০৭ সনে তিনি এই কলেজ থেকে এফ. এ. পাস করেন চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এনট্রান্স ও এফ. এ. এই উভয় পরীক্ষাতেই তিনি বৃত্তি পেয়েছিলেন। ইতিহাসে অনার্স নিয়ে ঐ বছর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের বি. এ. ক্লাশে ভর্তি হন এবং ১৯০৯ সালে অনার্সসহ বি.এ. পাস করেন. মাসে ৩২ টাকা পোস্ট গ্রাজুয়েট স্কলারশিপও তিনি পেয়েছিলেন। দু'বছর পরে তিনি ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এম. এ. পাস করেন।

এবার তাঁর ইতিহাসে গবেষণা আরম্ভ হয়। অধ্যাপক নীলমণি চক্রবর্তীর পরামর্শে তিনি এ-কাজ আরম্ভ করেন এবং ১৯১২ সনে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য তিনি থিসিস দাখিল করেন ও সাফল্য লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "অন্ধ্রকুশান আমল (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দ থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দ পর্যন্ত)"।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এম. এ. পাস করার অল্প দিনের মধ্যে অশোক সম্বন্ধে তাঁর একটি প্রবন্ধ "বীরভূমি" নামক একটি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহাই তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ। ইহার সম্বন্ধে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্যে' মন্তব্য করা হয়েছিল,—"এটি সুলিখিত এবং সুখপাঠ্য।" ('জীবনের স্মৃতিদীপে', রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ২২)

১৯১৩ সনে তাঁর চাকরি-জীবনের প্রারম্ভ। এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ঢাকা ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনার পদে যোগদান করেন, কিন্তু এ-কাজে তিনি অধিককাল ছিলেন না। পরের বছর জুলাই মাসে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে লেকচারার-এর পদে যোগ দেন। তাঁর নিজের লেখা থেকে জানা যায় যে, সেখানে তিনি প্রথমে "প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের ইতিহাস" পড়াতেন। এই পদে তিনি সাত বছর ছিলেন এবং ঐ সময়ে তিনি প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে গবেষণায় বিশেষ-ভাবে মনঃসংযোগ করেন। তিনি লিখেছেন, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময়েই আমি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে রীতিমত গবেষণা শুরু করি। তখন

বিভিন্ন পত্রিকায় আমার [গবেষণামূলক] লেখা প্রকাশিত হচ্ছে,… একটি এ-ধরনের প্রবন্ধ লিখে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রিফিথ পুরস্কার পেয়েছিলাম। সেই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু কিছু পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রির থিসিস হিসেবে দাখিল করি এবং ঐ ডিগ্রি লাভ করি। ('জীবনের স্মৃতিদীপে', পৃ. ২৮,৩১) থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল—"Corporate Life in Ancient India"—এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৮ সনে এবং তিনি পি.-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন ১৯১৯ সনে।

১৯২১ সনের জুলাই মাসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে যোগ দেন এবং ইহার কিছুদিন পরে ভোটে জয়লাভ করে তিনি আর্টস্ বিভাগের ডীন (Dean) নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সনে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও আইনজ্ঞ ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে আবার কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ব্যতীত জগন্নাথ হলের প্রোভোস্টও ছিলেন। তাঁর পদত্যাগের ফলে আচার্য রমেশচন্দ্র জগন্নাথ হলের প্রোভোস্টও নিযুক্ত হলেন এবং এর পর থেকে তের বছর তিনি এই পদে ছিলেন।

গবেষণার প্রতি যে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার পরিচয় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে দেখিয়েছেন, ঢাকায় গিয়ে তা উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে থাকে। আমরা দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে প্রচুর কাজ করতে হত, কিন্তু তা সত্বেও গবেষণা তিনি কখনও ভোলেন নি। এ কাজের জন্য তাঁর সময় নির্দিষ্ট করা থাকত এবং কোন ক্রমেই তা অবহেলায় নষ্ট হতে দিতেন না। ১৯২৪ সনে Early History of Bengal নামে তিনি একটি ছোট বই প্রকাশ করেন, এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "এর প্রায় কুড়ি বছর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার সম্পাদনায় যে History of Bengal, vol. I., প্রকাশিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিকে তার সূচনা বলা চলে।" ১৯২৭ সনে "Outline of Ancient Indian History and Civilisation" নামে তাঁর অপর একটি বই প্রকাশিত হয় এবং ইহা পরে "পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত" আকারে "Ancient India" নামে বের হয়। এ বছর তিনি 'চম্পা' নামে হিন্দু উপনিবেশের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডও প্রকাশ করেন। তৎপর তাঁর মনে হয় যে, এ বিষয়ে আরও ভাল করে পড়াশুনা করা প্রয়োজন এবং এর জন্য তাঁর ভারতের বাইরে যাওয়া দরকার। ১৯২৮ সালে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, আনাম, কাম্বোডিয়া, শ্যাম ও মালয় উপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যান।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশের ইতিহাস পুনরায় লিখতে শুরু করেন এবং দু'খণ্ডে সুবর্ণ দ্বীপ নামে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হিন্দু উপনিবেশ যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের ইতিহাস রচনা করেন। ১৯৪৩ সনে তিনি কাম্বোজ দেশ সম্বন্ধে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে "স্যার উইলিয়াম মেয়ার" বক্তৃতা দেন, তা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় "কাম্বোজ দেশ" নামে প্রকাশ করে। ১৯৫৩

সনে তিনি "মহারাজা সয়াজীরাও গায়কোয়াড় অনোরেরিয়াম বক্তৃতা মালায়" যে বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন, সে-সমস্ত বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় Greater India নামে প্রকাশ করে। এগুলি ভিন্ন তিনি Hindu Colonies in the Far East নামে একটি ছোট পুস্তকে সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস লেখেন; ইহাতে ব্রহ্মদেশের ইতিহাসও আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার ইতিহাসে গবেষণার স্বার্থে মূল্যবান পুরাতন পুঁথি ইত্যাদি সংগ্রহের দিকেও তাঁর নজর ছিল এবং তাঁর উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় যে নব উদ্যম এখানে দেখা গিয়েছিল, তাতে বেশ কিছু অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান সংগৃহীতও হয়েছিল।

বাঙলার একটি বড় এবং প্রামাণ্য ইতিহাস যাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় সে-দিকেও তিনি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়েছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টির আগেও এরকম একটি ইতিহাস রচনার প্রস্তাব হয়েছিল, কিন্তু সে-সময়ে ইহা কার্যে পরিণত হয়নি। রমেশচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্যে ও আন্তরিক প্রয়াসের ফলে এই কাজের অগ্রগতি হয় এবং শেষ পর্যন্ত ইহা প্রকাশিত হয়। এর প্রথম খণ্ড (হিন্দু যুগ) প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সনে তাঁর নিজের সম্পাদনায় এবং দ্বিতীয় খণ্ড (মুসলমান যুগ) প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সনে আচার্য যদুনাথের সম্পাদনায়। এ সম্পর্কে আচার্য যদুনাথ লিখেছিলেন, "Dr. Rameshchandra Majumdar Ph. D., smoothed the bunching of the scheme by making the preliminary arrangements and giving constant attention to the work to be done by the Dacca Committee, during his five years' Vice-Chancellorship of that University, till his retirement in 1942." (History of Bengal, vol. II., p. x.)

আচার্য রমেশচন্দ্র ১৯৩৭ সনের ১লা জানুয়ারি থেকে পাঁচ বছরের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু এর পরেও তাঁর কার্যকাল ছ'মাস বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন তিনি ঐ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে খুবই প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমরা আচার্য রমেশচন্দ্র ও অপর শিক্ষকদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার যথেষ্ট সুযোগও পেতাম এবং আমাদের প্রতি তাঁরাও ছিলেন মমতাপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে এ-রকম নিবিড় প্রীতির সম্পর্কের মূল্য এখনকার দিনেও যে কত বেশি, তা বলা বাহুল্য।

রমেশচন্দ্র ভারতের আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন,—একটি, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে College of Indology-র প্রিন্সিপ্যাল; এখানে তিনি ১৯৫০ সনের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯৫২ সন পর্যন্ত ছিলেন। দ্বিতীয়টি হল,

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে College of Indology-র অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। এখানে তিনি যান ১৯৫৫ সনের শেষ ভাগে। বেনারসে তাঁরই তত্ত্বাবধানে Indology বিভাগ প্রথম খোলা হয়, নাগপুরেও তাই। ভারতের বাইরেও,—শিকাগো ও পেনসিলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানেও কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলেন।

পূর্বোক্ত বাংলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা ব্যতীত ভারতীয় বিদ্যাভবনের ইতিহাস—History and Culture of the Indian People-এর General Editor রূপে তিনি যে মহৎকার্য সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন, তা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। বৈদিক যুগ থেকে ১৯৪৭ সনে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত যে এগারটি বড় বড় খণ্ডে এই ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রথম খণ্ড থেকে শেষ খণ্ড পর্যন্ত সমস্তই তিনি সম্পাদনা করেছেন, কতিপয় সহকারী সম্পাদকের সাহায্যে। শুধু ভারতীয় ঐতিহাসিকদের দ্বারা রচিত এমন প্রামাণ্য বিরাট ভারতের ইতিহাস, এ-দেশে এই প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। রমেশচন্দ্র এর সম্পাদনায় যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সহকারী সম্পাদক থাকলেও তিনি নিজে সমস্ত কার্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদারক করতেন, এমন কি প্রত্যেকটি লেখার প্রত্যেকছত্রও তিনি ভালভাবে না দেখে উহা ছাপাতে দিতেন না, কোন জায়গাতে ভুল থাকলে তিনি উহা সংশোধন করতেন, বা প্রয়োজন হলে লেখকের কাছে এর জন্য পাঠাতেন। অনেকগুলি খণ্ডে অনেক মূল রচনাও তাঁর লিখতে হয়েছে।

এই ইতিহাস সম্পাদনের ভার ১৯৪৫ সালে যখন কুলপতি কে. এম. মুন্সী তাঁর ওপরে অর্পণ করেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "The Samiti (Bharatiya Itihasa Samiti) was lucky in securing the services of Dr. R. C. Majumdar, formerly Vice-Chancellor of Dacca University and one of India's leading historians, as full-time editor." রমেশচন্দ্র এ কার্যের ওপরে কি রকম গুরুত্ব দিতেন সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখেছেন, "ইতিহাস চর্চার দিক থেকে এইটিই আমার জীবনের সর্বপ্রধান কাজ বলে মনে করি।......জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই কাজের সঙ্গেই যুক্ত থাকব—এমন আশা ছিল—সৌভাগ্যবশতঃ আমার জীবিত কালেই (১৯৭৭) একাদশ খণ্ডে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।"

এই গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হওয়ার উপলক্ষে ১৯৭৭ সনের ২৫শে আগস্ট দিল্লীতে তখনকার প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা অতি সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় এবং আচার্য রমেশচন্দ্রকে সম্বর্ধনা করা হয়। আমন্ত্রিত হয়ে এই অনুষ্ঠানে আমিও উপস্থিত ছিলাম এবং উহার সমস্তই প্রত্যক্ষ করেছি।

দেশবরেণ্য নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর বাণীতে লিখেছিলেন, "I am glad to hear the History has already won the plaudits from scholars and

educationists the world over and is considered one of the high water marks of the achievements of modern Indian scholarship."

শ্রীমোরারজী দেশাই বলেছিলেন, "He (Munshiji) has always a great capacity for finding the right man for the right job. And that is why he selected Dr. Majumdar who has the correct view about history and the duty of a historian." ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাও বলেন, One may well compare Dr. Majumdar to the celebrated Greek historian Thucydides who wrote his classic history of the Peloponnesian war and did so as a true historian. Dr. Majumdar set before himself the high ideals of a true historian and stuck to them all these years in seeing through these II-volumes."

রমেশচন্দ্রের মৌলিক ও প্রামাণ্য লেখা শুধু প্রাচীন ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতের মধ্য ও বর্তমান যুগের ইতিহাসেও তিনি তাঁর লেখায় কম কৃতিত্বের পরিচয় দেন নি। তাঁর লেখার মধ্যে আমরা পাই তাঁর সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, বৈশ্লেষিক ও প্রয়োজনীয় সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান, স্বাধীন অথচ যুক্তিপূর্ণ মতামত ও সত্য নির্ণয়ে আন্তরিক প্রয়াস। সত্য নির্ণয়ে তাঁর কেমন সতর্ক দৃষ্টি ছিল, তা তাঁর নিম্নের উক্তি থেকে বেশ বোঝা যায়,—"The goal of history ··· is nothing more and nothing less than that history must be regarded as an eternal quest for truth · A historian must divest his mind of sentiments, prejudices, and pre-conceptions and all kinds of human emotions which are likely to distort his vision and judgment." "ভারতের ইতিহাস-রচনা প্রণালী" পুস্তকে তিনি লিখেছেন, "ব্যাপকভাবে দেখিলে, মানব সমাজের অনন্ত প্রবাহের বিবরণ-ই-তো ইতিহাস। ঐতিহাসিকদের পবিত্র দায়িত্ব হইল প্রমাদ, অশুদ্ধি, অসত্য হইতে ইতিহাসের শুচিতা ও নিষ্কলুষতা রক্ষা করা। এই গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়াই ..... আচার্য যদুনাথ সরকার একটি ইতিহাস সম্মিলনে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'সত্য প্রচার করিবার জন্য সমাজের বা বন্ধুবর্গের মধ্যে গঞ্জনা সহিতে হয় সহিব। কিন্তু তবু সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব।' ইহাই প্রকৃত ঐতিহাসিকদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।"

তাঁর সব লেখা তর্কাতীত না হলেও এ কথা বলা যায় যে, প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তিযুক্তভাবে যা সত্য বলে তিনি বিবেচনা করেছেন, তাই তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করেছেন। ইতিহাস রচনায় তিনি অপরের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তারের বিরোধী ছিলেন, কারণ তাতে প্রকৃত ইতিহাস লেখায় নানারকম প্রতি-

বদ্ধকতা আসে। তাঁর ভারত সরকারের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ইতিহাস রচনার ডিরেক্টরের পদ ত্যাগ করার মূলেও ছিল অপরের হস্তক্ষেপ, যা মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন যখন তিনি ইউনেস্কো পরিকল্পিত মানবজাতির সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্পর্কে ইতিহাস প্রণয়নের জন্য আন্তর্জাতিক কমিশনের সম্পাদকমণ্ডলীর উপ-সভাপতির পদ লাভ করেন। ১৯৫১ সনে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সের ইণ্ডোলজি শাখার সভাপতি মনোনীত হয়েও তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত এবং বিদেশ থেকেও তিনি নানাভাবে সম্মানিত হয়েছেন। কলকাতা, যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি এবং বিশ্বভারতী থেকে "দেশীকোত্তম" উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং কলকাতা ও বোম্বের এশিয়াটিক সোসাইটির Honorary Fellow ছিলেন। বহু প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদও তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন, যেমন, এশিয়াটিক সোসাইটি (কলকাতা), ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্, সর্বভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস, সর্বভারতীয় ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স, এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট্ অব কালচার (কলকাতা)।

ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে তাঁর তিন শতের বেশি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়ে ছড়িয়ে আছে। আগে তাঁর যে সব পুস্তকের উল্লেখ করা হয়েছে, তা ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল,—Classical Accounts of India, The Study of Sciences in Ancient India (in Bengali), The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857, History of the Freedom Movement in India (three volumes), History of Bengal (in Bengali, Four volumes), History of Mediaeval Bengal, On Rammohan Roy, Renascent India, Historiography in Modern India, বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র এবং জীবনের স্মৃতিদীপে।

প্রায় সুদীর্ঘ সত্তর বছর ব্যাপী ভারতীয় ইতিহাসে, তাঁর বহুমুখী কর্মধারা ও অনলস সাধনায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম, অসীম ধৈর্য, কর্মে অবিচল নিষ্ঠা, ও জ্ঞানের গভীরতায় তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন এবং তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সংখ্যাধিক্যে ও তাদের গুণগত বিচারে বর্তমান কালের ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে তাঁর স্থান নিঃসন্দেহে অতি উচ্চে।*

* প্রবন্ধটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৮ ফাল্গুন ১৩৮৬ তারিখে রমেশচন্দ্রের স্মৃতি-সভায় পঠিত।

রমেশচন্দ্র মজুমদার ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯১৪ সালে ঢাকার চাকরি ছেড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কলিকাতায় ছিলেন। রাখালদাসকে কেন্দ্র করে তখন ভারতের প্রাচীন ইতিহাসচর্চার একটি মণ্ডলী আপনা আপনি গড়ে উঠেছিল। রমেশচন্দ্রও ছিলেন তার একজন। তাঁর স্মৃতি-চারণ করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র লিখেছেন :

"তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতি ইহার কর্ণধার। পরিষদের সংলগ্ন 'রমেশ ভবনে' একটি চিত্রশালা এখন মূল্যবান সম্পদে পরিপূর্ণ। কিন্তু তখন যে সমুদয় প্রাচীন মূর্তি ও মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার কোন তালিকা বা বিবরণ ছিল না। এইটি সংস্কারের ভার ত্রিবেদী মহাশয় রাখালবাবুর হাতে দিলেন। রাখালবাবু আমাদের কয়েক জনকে লইয়া মহা উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেলেন। প্রাচীন মুদ্রা ও মূর্তিগুলি কাল ও শ্রেণী অনুসারে সাজাইয়া তাহার যথাযথ তালিকা ও বিবরণী প্রস্তুত হইয়াছিল। এই বিষয়ে রাখালবাবুই ছিলেন আমাদের নেতা। তাঁহার উপদেশ ও নির্দেশ মতই আমরা চলিতাম। পরিষদের কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যও আমাদের সহায়তা করিতেন।

কিন্তু ক্রমে একটা বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হইল। তখনকার দিনে একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক বর্তমান কালের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাসচর্চার ধার ধারিতেন না। কিম্বদন্তী, কুলশাস্ত্র প্রভৃতির প্রতি তাঁহাদের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। ইহাদের সাহায্যে তাঁহারা অনেক চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করিয়া শিক্ষিত সমাজে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ বেশ অর্থও উপার্জন করিতেন। এইরূপ ঐতিহাসিকেরা কিরূপ প্রণালীতে বড়লোক বশ করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

একদিন বড়লাট লর্ড কারমাইকেল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পরিদর্শন করিতে আসিলেন। বলা বাহুল্য এই সম্পর্কে অনেক নামজাদা লোকেরও সমাগম হইয়াছিল, আমার উপর ভার ছিল মূর্তি ও মুদ্রা প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিবার।

লর্ড কারমাইকেল কিছু কিছু ব্যাখ্যা শুনিয়া অন্যদিকে গেলেন। একটু পরেই রাধাচরণ পাল আসিলেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস পালের পুত্র ও কলিকাতা পৌর-সভার একজন প্রভাবশালী সভ্য ছিলেন। আমি কিছু বলিবার আগেই একজন প্রাচীন

ঐতিহাসিক তাঁহাকে বলিলেন, "এই দেখুন আপনার পূর্বপুরুষের কীর্তি।" অর্থাৎ বাংলার পাল সম্রাটেরা রাধাচরণ পালের পূর্ব পুরুষের কীর্তি।

পাল মহাশয় শুনিয়া ত মহাখুশী। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ঐতিহাসিক তখনকার ধনী ও সুপ্রসিদ্ধ এটর্নি গণেশচন্দ্রের (নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের পিতা) বাড়িতে উপস্থিত। ঐতিহাসিক বলিলেন—"এইবার আপনাদের প্রাচীন বংশের সন্ধান মিলেছে। আপনার পূর্ব-পুরুষেরা যে কত বড় রাজা ছিলেন এতদিনে তা টের পাওয়া গেল।" এই ঐতিহাসিক বহু কুলশাস্ত্র সংগ্রহ করেন এবং আদিশূর সম্বন্ধে বহু তথ্য জাহির করেন। যখন নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কারের ফলে তাঁহার কাল তথ্য ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইত তখন তিনি অমনি আর একখানি কুলশাস্ত্র আবিষ্কার করিতেন—তাহাতে ঐ নূতন তথ্যটি যথাযথভাবে লিখিত থাকিত। অনেকেরই সন্দেহ ছিল যে কুলশাস্ত্রের পুঁথি জাল হইত। নূতন লেখা পুঁথিকে কি প্রণালীতে অতি প্রাচীন জীর্ণশীর্ণ কীটদষ্ট পুঁথিতে পরিণত করা যায় একবার এক ভদ্রলোক তাহা আমার নিকট বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি এরূপ বহু পুঁথি জাল করিয়াছেন।

রাখালবাবু ইতিহাসের এই কদর্য কলঙ্ককে দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। আমাদের দলের মধ্যেও এ বিষয়ে খুব উৎসাহের সঞ্চার হয়। কিন্তু যে প্রাচীন ঐতিহাসিক এই দোষে বিশেষভাবে দোষী বলিয়া রাখালবাবু তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তাঁহারা সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ প্রতিপত্তি-শালী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতিও তাহাদের পক্ষে। সুতরাং প্রথমে বাদানুবাদ ও পরে তুমুল কলহ আরম্ভ হইল। সেই দিনকার সে সব বাক্‌বিতণ্ডা কিরূপ তাণ্ডবে পর্যবসিত হইয়াছিল এবং বন্ধুবিচ্ছেদ ও সাহিত্য পরিষদের ভিত্তি শিথিল করিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহা আজ সবিস্তারে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। মোটের উপর রাখালবাবুর ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দলের উপর সাহিত্য-পরিষদের কর্ম কর্তারা বিষম চটিয়া গেলেন। আমরাও কিছুদিন পরিষৎ হইতে দূরে রহিলাম।

এই সংঘর্ষের ফলে একদিকে যেমন পরিষদের প্রধান নায়কেরা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন অন্যদিকে তেমনি রাজশাহীর বরেন্দ্র পরিষদের দল আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। এই দলের তিনজন কর্ণধার ছিলেন—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শরৎকুমার রায় ও রমাপ্রসাদ চন্দ। পরে রাধাগোবিন্দ বসাকও এই দলে যোগ দেন। কোন ব্যক্তিগত কারণে রাখালবাবুর ও এই দলের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল। কিন্তু কুলশাস্ত্রের জালিয়াতির বিরুদ্ধে যখন রাখালবাবুর নায়কত্বায় আমাদের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গোলযোগ বেশ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে তখন আমাদের সঙ্গে ইহাদের মিলন ঘটিল। একজন প্রবীণ ও প্রাচীন ঐতিহাসিকের বিরুদ্ধে গোপনে একটি ষড়যন্ত্র হইল। তিনি একখানি কুলশাস্ত্রের একখানি কি দুইখানি শ্লোকের সাহায্যে একটা

খুব বড় রকম তথ্যের আবিষ্কার করেন। যখন তাঁহাকে ঐ পুঁথি দেখাইতে বলা হইল, তিনি জবাব দিলেন যে, নড়াইলের নিকবর্তী একটি দুরধিগম্য গ্রামে ঐ পুঁথি আছে—কিন্তু পুঁথির মালিক (এক বিধবা ব্রাহ্মণী) তাহা কিছুতেই হাতছাড়া করিবেন না। বরেন্দ্র সমিতি তাঁহাদের এক পণ্ডিতকে পাঠাইয়া ঐ পুঁথি হইতে প্রয়োজনীয় অংশ নকল করিয়া আনিলেন। দেখা গেল যে পূর্বের উপরের শ্লোকগুলি ঠিকই আছে, কিন্তু যে শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া পূর্বোক্ত প্রবীণ ঐতিহাসিক এক অভিনব মৌলিক তথ্যের আবিষ্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার কোন সন্ধানই মিলিল না। আমরা ইহা গোপন রাখিয়া পরিষদের কর্তৃপক্ষকে বলিলাম যে, প্রকাশ্য এক সভায় এই বিষয়ে আলোচনা করা হউক। প্রবীণ ঐতিহাসিক সম্মত হইলেন। সভার দিনও নির্দিষ্ট হইল। কিন্তু কার্যকালে ঐতিহাসিক মহাশয় বেমালুম গা ঢাকা দিলেন। এই রূপে বিনা যুদ্ধেই আমাদের জয় হইল।" ('সুহৃদ্বর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়', সা. প. প., বর্ষ ৮১. সংখ্যা ২-৪)

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও এর মধ্যে রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে আত্যন্তিক যোগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এ-সম্পর্কে পরে তাঁর 'জীবনের স্মৃতিদীপে' গ্রন্থেও বিশদ উল্লেখ করেছেন। যে প্রাচীন ঐতিহাসিক ব্যক্তির সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তিনি হলেন নগেন্দ্রনাথ বসু। যে তথ্য আলোচনার জন্য প্রকাশ্য সভার আয়োজন করা হয়েছিল তা হোল 'রাজা আদিশূর' সম্পর্কে। "নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে তিনি সম্প্রতি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখা হরিমিশ্রের কারিকা এবং এডু মিশ্রের কারিকা নামে দু'খানি প্রাচীন পুঁথিতে আদিশূরের উল্লেখ দেখেছেন এবং এ সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোকও উদ্ধৃত করেন।" কিন্তু পরে আর ঐ শ্লোক-গুলির কোন অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। পুঁথি জাল করা সম্পর্কেও তিনি উল্লেখ করেছেন যে, "নূতন পুঁথির উপর অ্যাসিড ছড়িয়ে বালির নীচে রাখলে সেটি পুরনো কীটদষ্ট পুঁথির মতো দেখায়।···নগেনবাবুর অনেক পুঁথি নাকি এ-ভাবেই পুরনো করা হয়েছে।" "বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র" নামক গ্রন্থে রমেশচন্দ্র এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রমেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এই সময়েই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে তাঁর নিবিড় সংযোগ ঘটে। 'পরিষৎ-পরিচয়' থেকে জানা যায় ১৫ পৌষ ১৩২৪, কলিকাতায় রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনে রমেশচন্দ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। তখন বঙ্গের ও বঙ্গের বাইরে ভারতের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত শিক্ষা-সংক্রান্ত ও সাহিত্য-বিষয়ক সভা-সমিতির অধিবেশনে যোগদানের জন্য পরিষৎ থেকে প্রতিনিধি আহূত হোত।

তারপর রমেশচন্দ্র চাকুরিসূত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। সেখানে

নানা পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করে অবশেষে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি রমেশচন্দ্র ঢাকা থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন।

যতদূর জানা যায়, রমেশচন্দ্র ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে আবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন এবং তখন থেকে আমৃত্যু তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির কোন-না-কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষট্‌সষ্টিতম বার্ষিক অধিবেশনে রমেশচন্দ্র ষট্‌ষষ্টিতম বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি উক্ত পদে সপ্ততিতম বর্ষ (১৯৬৪) পর্যন্ত আসীন ছিলেন। সপ্ততিতম বর্ষের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

একসপ্ততিতম বর্ষের বার্ষিক অধিবেশনে রমেশচন্দ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ হতে ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৮০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ছিলেন সহ-সভাপতি। ১৩৮১ এবং ১৩৮২ বঙ্গাব্দে তিনি ছিলেন পত্রিকাধ্যক্ষ। ১৩৮২ বঙ্গাব্দ থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন সহ-সভাপতি।

১৩৮০ বঙ্গাব্দের ১লা জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় পরিষদ মন্দিরে কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি মোহিতলাল মজুমদারের চিত্র প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে মোহিতলাল মজুমদারের স্মৃতিচারণ করেন রমেশচন্দ্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে অবসর নিয়ে রমেশচন্দ্র যেদিন কলকাতায় আসেন সেদিন মোহিতলাল নীলক্ষেত প্রান্তরে সান্ধ্য ভ্রমণের নিত্যসঙ্গী রমেশচন্দ্রের উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ উপহার দেন। রমেশচন্দ্র মোহিতলালের সেই অপ্রকাশিত কবিতাটি সভায় পাঠ করেন। কবিতাটি পরে ৮১তম বর্ষ ১ম সংখ্যা, সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রমেশচন্দ্রের সর্বমোট বারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি হোল :

	প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা		পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	নারায়ণের লিপি	২৮	৪	১৬৯-১৭৩
২.	সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ	৪৬	৪	২৩৩-২৩৯
৩.	দেশাবলিবিবৃতি	৫৫	১-২	১-২০
৪.	বল্লসেনের বংশাবলী	৫৬	১-২	১-১৫
৫.	বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণে	৮০	২	৪৯-৫৮
৬.	রমাপ্রসাদ চন্দ	৮০	৩	৯-১৬
৭.	সুহৃদ্বর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮১	২-৪	২১-৩৪

৮.	বাংলার পালবংশীয় রাজগণের কালপঞ্জী সম্বন্ধে মন্তব্য	৮২	১-২	২৩-২৫
৯.	রামমোহন রায় : প্রচলিত ধারণা বনাম ঐতিহাসিক সত্য	৮২	১-২	৩১-৪৮
১০.	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৮২	৩-৪	৫২-৫৩
১১.	হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিয়োর জন্মতারিখ	৮৩	৩-৪	৪২-৪৩
১২.	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	৮৪	১-২	১-৩

রমেশচন্দ্র পরিণত বয়সেই প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৮৮ এবং গত ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮০, বিরানব্বই বৎসর বয়সে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। বয়স তাঁর মনের উপর বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি বলেই তিনি প্রায় শেষ পর্যন্তও মনের দিক দিয়ে ছিলেন প্রাণবন্ত। তিনি আরো দীর্ঘায়ু হলে আমরা তাঁর কাছ থেকে আরো নতুন নতুন চিন্তার ফসল পেতাম। সেদিক থেকে রমেশচন্দ্রের মৃত্যু দেশের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি রমেশচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদে শোকাহত। কার্যনির্বাহক সমিতির ২৩ ফাল্গুন ১৩৮৬ (৯ মার্চ ১৯৮০ তারিখের অধিবেশনে রমেশচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও শোক জ্ঞাপন করা হয়।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের জীবনতথ্য ও নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

সংকলক ঃ শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী

জন্ম—৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৮৮। মৃত্যু—১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০।

জন্মস্থান—বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার খাণ্ডারপাড়া গ্রাম।

ইতিহাসে এম. এ. (প্রথম শ্রেণী); প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার; গ্রিফিথ প্রাইজম্যান, ডক্টর অফ্ ফিলসফি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

ডক্টর অফ্ লিটারেচার : অনারারি (কলিকাতা, যাদবপুর, রবীন্দ্র ভারতী, বর্ধমান) দেশিকোত্তম (বিশ্বভারতী), বিদ্যাবারিধি (নব নালন্দা মহাবিহার), ভারততত্ত্ব ভাস্কর (সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা)।

লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রফেসর এবং উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যক্ষ, কলেজ অফ্ ইন্‌ডোলজি, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়; ভারতীয় ইতিহাসের ভিজিটিং প্রফেসর, চিকাগো এবং পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়; শেরিফ অফ ক্যালকাটা।

সভাপতি, অল ইণ্ডিয়া হিস্টরি কংগ্রেস, অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স, ইন্‌স্টিটিউট অফ্ হিস্টরিক্যাল স্টাডিজ (১৯৬৮); ১৯৫১ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত 'ইন্‌ডোলজি'র সভাপতি; সদস্য, এক্সিকিউটিভ্ কমিটি, ব্যুরো অফ্ ইণ্টারন্যাশন্যাল কাউন্সিল ফর ফিলসফি অ্যাণ্ড হিউম্যানিস্টিক স্টাডিজ, ইউনেসকোর সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি বিভাগের সহ-সভাপতি; সভাপতি, এসিয়াটিক সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ ক্যালকাটা এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ; সহ-সভাপতি, চিত্রশালাধ্যক্ষ, পত্রিকাধ্যক্ষ, বিশিষ্টসদস্য, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা। এছাড়াও দেশ-বিদেশের শতাধিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী :

Ancient India (Motilal Banarsi Das, 1952, Rev. ed. of Ancient Indian History and Civilisation 1927) 5th Ed. 1968.

Ancient Indian Colonies in the Far East. Vol-I ; Lahore, Punjab Sanskrit Book Depot, 1927, Vol-II : Suvarnadipa. Dacca. Asok kr. Majumdar, Part-I : Political History (1937), : Part-II Cultural History (1938).

Ancient Indian Colonisation in South East Asia—G. H. Bhatt. Boroda. 1955 .

Corporate Life in Ancient India. Cal. 1918 ; 2nd ed.—1922

Hindu Colonies in the Far East : Calcutta, General Printers and Publishers, 1944, 2nd ed. K. L. Mukhopadhyaya 1963.

Inscriptions of Kambuja. Calcutta Asiatic Society, 1953.

Kambuja Desa or Ancient Hindu Colony in Combodia. Madras University, 1944.

Maharaja Rajballav : A Critical Study on Contemporary Records (C. U. 1944, 1947)

Outline of Ancient Indian History and Civilisation (Pub. by R.C. Majumdar, 1927)

A classical Accounts of India ; Calcutta, Firma K. L. M. 1960.

The Phases of India's Struggle for Freedom, Bombay, Bharatiya Vidya Bhavan, 1961.

The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 (Ist, ed.) Calcutta ; Srimati S. chaudhuri, 2nd ed. Firma K. L. M. 1963

An Advanced History of India (with H. C. Roy Chaudhuri, and K. K. Datta, Ist. ed. 1946, corrected 2nd ed. in 3 Separate Volumes, also in 1967)

Glimpses of Bengal in the 19th Century. Calcutta, 1960

History of Freedom Movement in India 3 vols. 1962, 1963, Calcutta, Firma K. L. M.

Swami Vivekananda : Historical Review. Calcutta, General Printers and Publishers.

Medieval Culture in Bengal : Kamala lectures, Calcutta, C.U. 1965

On Rammohan Roy (B. B. Majumdar Lecturer) Calcutta, Asiatic Society 1972

বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) কলিকাতা, জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স (১ম সং. ১৯৪৬, ৪র্থ সং. ১৯৬৬) ।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চা (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) কলিকাতা, বিশ্বভারতী,

হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ।

বাংলাদেশের ইতিহাস (৩ খণ্ড), কলিকাতা, জি, ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং,

বিদ্যাসাগর : বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারীপ্রগতি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা), কলিকাতা, (জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র । কলিকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৭৩ ।

কমলা বক্তৃতামালা। কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬।

[১ম বক্তৃতা : মুসলমান সংস্কৃতি।

২য় বক্তৃতা : হিন্দু-সংস্কৃতি।

৩য় বক্তৃতা : হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়।

৪র্থ বক্তৃতা : Culture in Medieval Bengal.]

জীবনের স্মৃতিদীপে। কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৭৮।

সম্পাদিত গ্রন্থ :

History of Bengal vol. I—Hindu Period (Dacca 1953)

Great women in India, Almora, Advaita Asharm, 1953

Readings in Political History of India [বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ৩৬টি প্রবন্ধের সংকলন]

History and Culture of the Indian People-II vols.

Raja Vijay Nataka a Sanskrit drama, Calcutta, Indian Research Institute, 1947

Ram charita (Varendra Research Society, 1939)

Expansion of Indian Culture in Eastern India, Imphal, 1963.

Historiography in Modern India,Cal., Asia Publishing House,1970

Indian culture in S. E. Asia. Ahmedabad, 1969

The Vedic Age. London, George Allen & Unwin, 1951

Ancient India as described by Megasthenes and Arian. Calcutta, Chakrabarti and Chatterjee, 1960

The Vktaka—Gupta Age (1946, Reprinted in 1954—Bharatiya Bhasha Parisad.

পুস্তিকা :

Medicine (with Bibliography), Calcutta, Indian National Science Academy.

The Early History of Bengal. Dacca, Dacca University.

Greater India (1940. Dayananda College Book Depot)

Presidential Address (All India Oriental Congress 1948,Darbhanga)

Presidential Address (1939, Calcutta)

Presidential Address (Dacca Teachers' conference 1935)

Spirit in Ancient India (Bose Institute, Calcutta) etc. These notes have been taken from the "Joyasree" Patrika (Acharya Ramesh Chandra ajumdar issue, 43 years Baisakh 1385 B. S). There are more detailed descriptions.

The Early History of Bengel, Dacca University Bulletin 3 O. U.P. Calcutta.

Greater India, Sain Dass Foundation Lectures 1940, Dayananda College Book Depot. Lahore, 1941.

Presidential Address :

a) Indian History Congress (3rd session, 1939)

b) Dacca District Teachers' conference.

c) Dacca Collegiate School Centenary 1935.

d) Archeological Section : The tenth All India Oriental Cor-erence, Tirupali 1940.

e) History Section : Proceedings of the All India Oriental Conference IX, Published from Trivandrum.

f) 33 Scientific spirit in Ancient India—Bose Institute, Calcutta.

g) Annual meeting of the Asiatic Society (1966) .

এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

পরিষৎ-সংবাদ

শোক-সংবাদ :

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার গত ১১ই ফেব্রুয়ারি বিরানব্বই বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ২৩ ফাল্গুন, ১৩৮৬ ৯ মার্চ, ১৯৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত সাহিত্য পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতির অধিবেশনে তাঁহার মহাপ্রয়াণে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত অধিবেশনেই সদ্য প্রয়াত (৮ মার্চ) প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পরিষৎ সভাপতি ডঃ সুকুমার সেন।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে নানা দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া জড়িত ছিলেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য স্থির হয়, বর্তমান বর্ষের পরিষৎ পত্রিকায় (৮৬তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) তাঁহার জীবন ও কৃতি সম্পর্কেই প্রবন্ধগুলি নিবেদিত হইবে।

বিশেষ অধিবেশন :

(ক) অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেনের অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনা সভা।

গত ৫ মাঘ, ১৩৮৬ ইং ২০ জানুয়ারি, ১৯৮০ পরিষদ-ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে পরিষদ্ ভবনে এক মনোরম ভাবগম্ভীর পরিবেশে সভাপতি ডঃসুকুমার সেনের অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। পরিষদের পক্ষ হইতে মানপত্র পাঠ করেন পরিষদ্ সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস। তিনি পঞ্চফল ও মিষ্টান্ন উপহার দিয়া অধ্যাপক ডঃ সেনকে সম্বর্ধিত করেন। পরিষদ কর্মিবৃন্দ তাঁহাকে রক্ত গোলাপ উপহার দিয়া সম্বর্ধিত করেন।

ডঃ দেবীপদ ভটাচার্য, শ্রীমতী মিমি ক্লেমন, ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, ডঃ সরোজ-মোহন মিত্র, ডঃ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ নরেশচন্দ্র জানা, ডঃ নির্মলচন্দ্র দাস, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীপুলকেশ দে সরকার, শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশিবদাস চৌধুরী প্রমুখ পরিষৎ সদস্যবৃন্দ অধ্যাপক ডঃ সেনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত অধ্যাপক ডঃ সেনকে একটি পুষ্পস্তবক উপহার দেন। কলিকাতার পুস্তক প্রকাশক এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোম্পানি একটি স্টীলের থালা, ধুতি ও গরদের চাদর ডঃ সেনকে উপহার দেন। এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোম্পানির পক্ষে মানপত্র পাঠ করেন শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

সংবর্ধনার উত্তরে অধ্যাপক ডঃ সেন বলেন : তিনি জীবনে বহু সম্মান ও সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছেন তবে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা তিনি লাভ করিয়াছেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-

পরিষৎ হইতে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। [সম্বর্ধনার উত্তরে তাঁহার বক্তব্য পরিশিষ্টে সংযোজিত হইল।]

সভাপতির ভাষণে শ্রীজগদীশ ভটাচার্য অধ্যাপক ডঃ সেনের বহুমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁহার দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করেন। সম্পাদক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উদ্বোধন সঙ্গীত করেন শ্রীমতী ছন্দা মুখোপাধ্যায়।

খ) নির্মলকুমার বসু স্মৃতি বক্তৃতা।

১১ই ফাল্গুন, ১৩৮৬ (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০) পরিষদ্ ভবনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুরজিৎ সিংহ "নৃতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতের সভ্যতার গঠন ও বিবর্তন" বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। পরিষৎ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস নির্মলকুমার বসুর জীবন দর্শন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করেন ও সমবেত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতি মহাশয়ও নির্মলকুমার বসুর জীবনের নানা দিক্ ও বিবর্তন লইয়া আলোচনা করেন।

গ) ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্মরণসভা।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রয়াণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৮৬ (২রা মার্চ, ১৯৮০) এক স্মরণসভার আয়োজন করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার।

সভার প্রারম্ভে পরিষদ্ সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস প্রয়াত রমেশচন্দ্রের জীবন ও বিবিধ দিক লইয়া আলোচনা করেন। প্রয়াত রমেশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ডঃ জগদীশনারায়ণ সরকার, শ্রীজীবনতারা হালদার, ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার, ডঃ আশুতোষ ভটাচার্য, ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এই সভায় পঠিত প্রবন্ধগুলি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

ঘ) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মারক-বক্তৃতা।

২৪শে ফাল্গুন, ১৩৮৬ (৮ মার্চ, ১৯৮০) পরিষদ-ভবনে এই স্মারক-বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন।

সমবেত সকলকে স্বাগত জানান পরিষৎ সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস। তিনি রামপ্রাণ গুপ্তের কর্মজীবন সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া উল্লেখ করেন যে, রামপ্রাণ গুপ্তই বাংলা ভাষায় প্রথম ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত করেন। দীর্ঘকাল পরে এই বক্তৃতার আয়োজন করিতে পারিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আনন্দিত। তিনি সভায় জানান যে এই স্মারক-বক্তৃতার জন্য যে গচ্ছিত তহবিল আছে তাহা হইতে এই বক্তৃতার

ব্যয় সঙ্কুলান সম্ভব নহে, সেজন্য কার্যনির্বাহক সমিতি সাধারণ তহবিল হইতে বাড়তি বরাদ্দ অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন।

অতঃপর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ডঃ ভবতোষ দত্ত "আধুনিক যুগে বাঙলার অর্থনীতি চিন্তার ও বঙ্গভাষায় অর্থনীতি চর্চার ইতিহাস" সম্পর্কে তাঁহার লিখিত মনোজ্ঞ বক্তৃতাটি পাঠ করেন। প্রাসঙ্গিক প্রশ্নেরও তিনি সদুত্তর দেন।

সভাপতির ভাষণে ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন ডঃ দত্তের ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এইরূপ বক্তৃতার আয়োজনের জন্য তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ঙ) 'বৃন্দাবনে নবাবিষ্কৃত বৈষ্ণব পুঁথিসম্ভার' বিষয়ে বক্তৃতা।

১লা চৈত্র, ১৩৮৬ (১৫ মার্চ, ১৯৮০) ডঃ সুকুমার সেনের সভাপতিত্বে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় "বৃন্দাবনে নবাবিষ্কৃত বৈষ্ণব পুঁথিসম্ভার" শীর্ষক দীর্ঘ লিখিত ভাষণ পাঠ করেন।

সভাপতির ভাষণে ডঃ সুকুমার সেন বলেন, ডঃ মুখোপাধ্যায় যে তথ্যসম্ভার সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ তবে তিনি তাঁহার সাহিত্যের ইতিহাসে যে কথা বলিয়াছেন তাহা হইতে তিনি বিচ্যুত হইতেছেন না। শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিষৎ-পত্রিকা প্রসঙ্গ :

কার্যনির্বাহক সমিতি ২৩শে চৈত্র, ১৩৮৬ তারিখের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য হইবে তিন টাকা এবং যুগ্ম সংখ্যার মূল্য হইবে ছয় টাকা।

১৩৭৬ হইতে ১৩৭৮ এই তিন বৎসর পরিষৎ পত্রিকার কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। পত্রিকার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য কার্য নির্বাহক সমিতি পূর্বেই উক্ত তিন বৎসরের জন্য একটি বিশেষ যুগ্ম-সংখ্যা প্রকাশ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত অধিবেশনে কার্যনির্বাহক সমিতি স্থির করিয়াছেন এই যুগ্ম-সংখ্যার মূল্য হইবে দশ টাকা। পরিষদ সদস্যগণ অবশ্য যথানিয়মে পরিষদ পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাই বিনামূল্যে পাইবেন। বর্তমান বৎসরের পত্রিকাধ্যক্ষ ডঃ সরোজমোহন মিত্রের উদ্যোগে এই বিশেষ যুগ্ম-সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

কার্যনির্বাহক সমিতি আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পরিষৎ-পত্রিকার যে সমস্ত পুরানো সংখ্যা অবিক্রীত আছে তাহার একটি প্রদর্শনী করিয়া ঐগুলি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সাংগঠনিক সংবাদ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি প্রয়াত রমেশচন্দ্র মজুমদারের শূন্যপদে কার্যনির্বাহক সমিতি ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৮৬ তারিখের অধিবেশনে ডঃ রমা চৌধুরীকে অন্যতম সহকারী সভাপতি রূপে মনোনীত করিয়াছেন।

শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী গ্রন্থশালাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় তাঁহার শূন্যপদে ২৫শে মাঘ ১৩৮৬ তারিখের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের নাম মনোনীত হয়। ডঃ সরোজমোহন মিত্র ও শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী পরিষদের রীতি অনুযায়ী গত নির্বাচনে একবিংশতিতম স্থানাধিকারী ব্যক্তিকে মনোনীত করিবার জন্য মত প্রদান করিয়াছিলেন।

২৩শে ফাল্গুন, ১৩৮৬ তারিখের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় সভাপতি ডঃ সুকুমার সেন বলেন যে কর্মাধ্যক্ষ ও কার্যনির্বাহক সমিতির যে সদস্যগণ নিয়মিত কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় যোগদান করেন না, কর্মাধ্যক্ষ মনোনয়নের সময় যেন তাঁহাদের নাম উল্লেখিত না হয়। সভায় আলোচনায় স্থির হয় যে পরিষদের নিয়মাবলী অনুযায়ী যে সব কর্মাধ্যক্ষ এবং সদস্যগণ পরপর চারটি সভায় অনুপস্থিত থাকিবেন আগামী বৎসর হইতে তাঁহাদের সভ্যপদ বাতিল হইয়া যাইতে পারে। এই সম্পর্কে সদস্যগণকে পরিষদ নিয়মাবলী অবহিত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উক্ত অধিবেশনে ১৩৮৭ বঙ্গাব্দের জন্য ১৭ জন কর্মাধ্যক্ষের নাম মনোনীত হইয়াছে এবং ৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যপদের জন্য অনুমোদিত হইয়াছে। বর্তমানে পরিষদের ৮ জন বিশিষ্ট সদস্য আছেন।

২৩ চৈত্র, ১৩৮৬ তারিখের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে পরিষৎ কর্মিবৃন্দের ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে নূতন করিয়া এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিষৎ কর্মিগণের বর্তমানে অনুসৃত ৯০ দিনের পরিবর্তে ১২০ দিন পর্যন্ত অর্জিত ছুটি জমা থাকিবে। পরিষদ কর্মিগণের অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা ৬৫ বৎসরই থাকিবে। যদি ৬৫ বৎসরের পরেও পরিষদের কোন কর্মী পুনর্নিয়োগের জন্য আবেদন করেন তাহা হইলে কার্যনির্বাহক সমিতি তাঁহার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ও কর্মদক্ষতার কথা বিবেচনা করিয়া এক বৎসর করিয়া তিন বৎসর পর্যন্ত তাহাকে পুনর্নিয়োগ করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়ম হিসাবে গণ্য হইবে না। সভাপতি ডঃ সুকুমার সেন বয়ঃসীমা সম্পর্কিত দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাঁহার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

জাতীয় গ্রন্থাগার বহু মূল্যবান পুস্তক পরিষৎকে উপহার হিসাবে প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শাখা সংবাদ :

গত ৮ই ও ৯ই চৈত্র, ১৩৮৬ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশন ও সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্মেলনে মূল সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ কলিকাতা বিশ্বালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস; সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যক্ষ ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু; প্রধান অতিথি ছিলেন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়; এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়।

। পরিশিষ্ট ।

ডঃ সুকুমার সেনের অশীতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে সম্বর্ধনার উত্তরে আচার্য ডঃ সুকুমার সেনের ভাষণ।

বন্ধুগণ !

আপনারা আজ আমার প্রতি এই যে স্নেহবাণী এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন তার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। জন্মতিথি পালন একান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। এমন ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে বাইরের কোন অনুষ্ঠান আমি পছন্দ করি না। তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কথা স্বতন্ত্র। বর্তমানে ঘরের বাইরে এই পরিষদের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক। আমার কাছে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব এল তখন আমি ওঁদের বলেছিলাম ঘরোয়া অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান করলে যাব। আপনারা আজ একেবারে অনাড়ম্বর না করলেও ঘরোয়া অনুষ্ঠান করেছেন এতে আমি খুব খুশি।

সকল মানুষেরই মা থাকে, কারো কারো ধাইমাও থাকে আবার কারো কারো বিদ্যা-মা (Alma Mater) ও থাকে। আমি পড়ি শেষের দলে। আমার বিদ্যা-মা আছে। একটি নয়, অন্তত তিনটি। আমার প্রথম বিদ্যা-মা হল, বর্ধমান-রাজ পাবলিক লাইব্রেরি। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হই এবং সেখানকার লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করি। সেটা হল আমার দ্বিতীয় বিদ্যা-মা। তারপর সুনীতিবাবু ও বসন্তবাবু (বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ) আমাকে সাহিত্য পরিষদে ভর্তি করেছেন। আমার যেখানে জন্ম এবং যেখানে থাকতাম তার কাছেই সাহিত্য পরিষৎ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আমার তৃতীয় বিদ্যা-মা।

এই পরিষদে এসে আমার বাংলা লেখা রীতিমত শুরু হয়। এম-এতে ও পি-আর এস-এ আমার থিসিস ছিল বৈদিক গদ্যে বাক্‌-ব্যবহার বিষয়ে। সুনীতিবাবু বললেন, আপনি এই বিষয়ের উপর বাংলায় একটা প্রবন্ধ লিখে পরিষৎ পত্রিকায় দিন। সুনীতিবাবু বোধ হয় তখন পরিষৎ পত্রিকার অধ্যক্ষ ছিলেন। আমি তখন লিখি 'আর্যভাষার গদ্যের ভঙ্গী' প্রবন্ধটি। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এটাই আমার প্রথম লেখা। আমাদের তখন সাধুভাষায় লিখতে হতো। সুনীতিবাবু প্রথমে লেখাটা দেখে বললেন, আপনি দেখছি বাংলা লিখতে পারেন না। সুনীতিবাবুর কথা শুনে আমার অভিমান এবং রাগ হয়েছিল। আমি বর্ধমান রাজ লাইব্রেরিতে ১৯১৭/১৮ পর্যন্ত নানা রকমের অনেক বই পড়েছি। আমি ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত সেখানে পড়ি। ১৯১৯ প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম করে যে ৭৫./° নম্বর পেলে স্টার দেওয়া হবে, আর কোন বিষয়ে ৮০ নম্বর বা তার বেশি পেলে লেটার

দেওয়া হবে। আমি ভার্নাকুলারে লেটার পেয়েছিলাম। আমার একটা গর্ব ছিল যে আমি ভালো বাংলা জানি। তারপর একটু হালকা চালে আবার লিখলুম। তারপর সে লেখা নিয়ে তাঁর কাছে গেলুম। পছন্দ হল তাঁর।

তারপর আমি আরেকটা লেখা লিখি নারীর ভাষা সম্পর্কে। সেই লেখাটা আমি যে সভায় পড়ি তার সভাপতি ছিলেন ডাক্তার চুনীলাল বসু। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেমিক্যাল এগজামিনার ছিলেন। তিনি নিজেও সাহিত্যিক ছিলেন। প্রশংসা শুনতে সকলেরই ভালো লাগে, আমারও লাগে। প্রশংসা অনেক সময় উৎসাহ যোগায়। প্রশংসা বা উৎসাহ নৌকার পালে অনুকূল হাওয়ার মতো। চুনীলালবাবু সেদিন আমার প্রবন্ধের প্রচুর প্রশংসা করেছিলেন। তা আমার গবেষণা কাজে খুব উৎসাহ জুগিয়েছিল। পরিষদ প্রাপ্ত সেই উৎসাহের কথা আমি চিরদিন মনে রেখেছি। অধ্যাপক তারাপুরওয়ালা আমার গবেষণার বিষয় প্রথম নির্দেশ করেছিলেন। তারপর থেকে যেসব কাজ করেছি সবই আমার নিজের ভাবনা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আমার তৃতীয় আলমা মেটা। এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। মাঝখানে সম্পর্ক ছেদ হয়ে গিয়েছিল। আবার আপনারা আমাকে নিয়ে এসেছেন। আমি আজ আপনাদের বক্তব্যে বেশ প্রীত হয়েছি। আমি আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অক্ষুণ্ণ থাকুক, সেই প্রার্থনা করি।

শ্রীসুকুমার সেন

[শ্রীসরোজমোহন মিত্র কর্তৃক অনুলিখিত]

১৩৮৬ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তকের তালিকা

অচল ভট্টাচার্য ; C/o শিশু তীর্থ এডুকেশান ট্রাস্ট, হাওড়া-২

১। সুকান্ত (জীবননাট্য)—অচল ভট্টাচার্য

অজিত রায়চৌধুরী ; "জহুরালয়," ঠাকুর নিত্যগোপাল রোড, পানিহাটি, ২৪ পরগণা

১। শক্তির সন্ধানে—অজিত রায়চৌধুরী

অঞ্জলি বসু ; ৫৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-১২

১। বড়ো পিসিমা—বাদল সরকার

২। রাম শ্যাম যদু— ,,

৩। সলিউশন এক্স— ,,

৪। কবিকাহিনী— ,,

৫। স্পার্টাকুস— ,,

৬। এবং ইন্দ্রজিৎ— ,,

৭। লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী ,,

৮। মিছিল— ,,

অঞ্জলি ভৌমিক ; 'গুরুধাম', পি-২৩৮/সি, সি.আই.টি. রোড, পো: কাঁকুড়গাছি, কলি-৫৪

১। বাবামণির শ্রীচরণ সঙ্গে (১ম খণ্ড)—ব্রহ্মচারী অসীম

অতুল সুর ; ১১, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলি-৫০

১। কালের কড়চা—চন্দ্রাবতী

অনাদিভূষণ দাস ; ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৬

১। মার্কিন জাতির কর্মবীর—যোগেশচন্দ্র বাগল

২। জগৎ কোন্ পথে ?— ,,

৩। সাহসীর জয়যাত্রা— ,,

৪। জাতির বরণীয় যাঁরা— ,,

৫। রাজগুহ্যযোগ (শ্রীশ্রীমদ্ভগবদগীতা)—শ্রীশ্রীসত্যদেব

অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় ; ৮৮/১ রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড

১। সধবার একাদশী—দীনবন্ধু মিত্র, ক্ষেত্র গুপ্ত, স°

২। মালিনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। বিসর্জন— ঐ

৪। সমালোচনা সংগ্রহ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

৫। সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা—সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

৬। চর্যাগীতির ভূমিকা—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির ; ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১৩

১। আফ্রিকার রূপকথা—অমিয়কুমার চক্রবর্তী

অমর দত্ত ; C/o জাতীয় সাহিত্য সঙ্ঘ, ১৩ সি, ফরডাইস লেন, কলিকাতা-১৪

১। অধ্যাপক সুকুমার সেন (৮০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকা)—অমর দত্ত

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ ; ১০এ, তেলিপাড়া রোড, কলি-২৫

১। ফক্কড়দার শাঁকচুন্নির গল্প—অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ

অরুণকুমার রায় ; ৪৪ বি, আঞ্জুমান আরা বেগম রো, কলি-৩৩

১। বর্ণমালা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৮৫

২। শারদীয়া বর্ণমালা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৮৫

৩। বর্ণমালা (রবীন্দ্র সংখ্যা) বৈশাখ, ১৩৮৪

অরুণচাঁদ দত্ত ; ৩৯, ফিয়ার লেন, কলি-১৩

১। হংস বলাকার প্রত্যাবর্তন—মিখাইল ষ্টেলম্যাথ

অলকেন্দুশেখর পত্রী ; পি-৪৯, বি-ব্লক, লেকটাউন, কলি-৫৫

১। কালোবজ্র—অলকেন্দুশেখর পত্রী

২। খোদাই করায়—অলকেন্দুশেখর পত্রী

৩। শঙ্খের সূর্যোদয়—ঐ

অশোক উপাধ্যায় ; ১৩, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী রোড, কলি-৬

১। হরি যাকে রাখে—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

অশোক কুণ্ডু ; বোড়হল, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী

১। গীত-মঞ্জরী, ১ম খণ্ড—তারকচন্দ্র ঘোষ

২। মুর্শিদাবাদে কয়েকদিন—সন্তোষ পাল

৩। আনন্দম্—আনন্দ

৪। সাম্যবাদ—দীপক দে

৫। কিছু কিছু বৃক্ষ আছে বলে—অনুরূপা বিশ্বাস

৬। ঐতিহাসিক কণ্ঠস্বর—মৃত্যুঞ্জয় সেন

৭। বিদগ্ধ সাধক স্বামী বেদানন্দ ও তাঁর সাহিত্য কর্ম—স্বামী নির্মলানন্দ

৮। মধু মেলা—কাজী শাহাদাত আলী

৯। খরা, বন্যা, ভালোবাসা—অজিত দেব/নরেশ মণ্ডল

১০। দাবী—সন্তোষ পাল

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১। শক্তি গীতি-পদাবলী—অরুণকুমার বসু

২। কালান্তের রূপকথা—কমলাপ্রসাদ ঘোষ

৩। সঙ্গীত পরিক্রমা—নারায়ণ চৌধুরী

৪। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র—ঐ

৫। বঙ্কিমচন্দ্রের ট্র্যাজেডি চেতনা—ড: জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়

৬। শরৎ জিজ্ঞাসা—আদিত্যপ্রসাদ মজুমদার

৭। বঙ্গবন্ধু মুজিবর ও ভারতরত্ন ইন্দিরা—মিলন দত্ত

৮। কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত—বিনয় ঘোষ

৯। বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য—প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস ; ৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট, কলি-১২

১। পূব সাগরের পার হতে—সবিতা ঘোষ

২। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন বেদ—হেনা চৌধুরী

৩। কালাপানির ওপারে—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। শার্লক হোম্‌স ফিরে এলেন—অদ্রীশ বর্ধন, অনুবাদক

৫। নিজেকে যাচাই করুন—অদীশ বর্ধন

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড ; ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলি-১

১। ২১৯ খণ্ড ক্যালকাটা গেজেট (১৯৩৬-৭৩)

২। ৩৪ খণ্ড গেজেট অফ ইণ্ডিয়া : ৯৩৯, '৬৩-'৬৭, ১৯৭০

৩। সেন্সাস অফ ইণ্ডিয়া ১৯৫১, ১ম খণ্ড, ইণ্ডিয়া, Pt II B

৪। গভ: অফ্ বেঙ্গল, ইরিগেশন ডিপার্ট., রিপোর্ট অন রেনফল অ্যাণ্ড ফ্লাডস ইন্ নর্থ বেঙ্গল, ১৮৭০-১৯২২

৫। আত্মশিক্ষা—রাসবিহারী বসু

৬। শিশু বড় হয় কি করে—উৎপল হোমরায়

৭। মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা : ১ম—অরুণ ঘোষ

৮। জ্ঞানশিক্ষার কথা—নিখিলরঞ্জন রায় ও ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

৯। ইতিহাস শিক্ষক—আবদুল হাকিম

১০। শিশু পরিবেশ—সমীরণ চট্টোপাধ্যায়

১১। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান—বিজয়কুমার ভট্টাচার্য

১২। মহান্ শিক্ষানায়কদের শিক্ষাতত্ত্ব—গৌরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩। শিক্ষার চারদিক—শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য

১৪। আমাদের জাতীয় শিক্ষা—চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

১৫। চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস—নরেশচন্দ্র ঘোষ

১৬। দেহরক্ষণা—পশুপতি ভট্টাচার্য

১৭। বিউটি স্পট—জগন্নাথ সরকার

১৮। ইন্দ্রিয়ী মাত্রেই—অবনী সাহা

১৯। রত্নাকরের প্রেম—নিমাইকুমার ঘোষ
২০। সহেলী—সুদর্শন
২১। বিদেহী—ধনঞ্জয় বৈরাগী
২২। জেলেনী—আদিল রসিদ/বোম্মানা বিশ্বনাথম্, অনু°
২৩। পাতার নাম জনম—চোমং লামা
২৪। বেনেট সাহেবের বাংলো—নিরূপ মিত্র
২৫। কদমখণ্ডীর ঘাট—বীরভদ্র
২৬। ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও অর্থনীতি—দেবেশ রায়
২৭। দশাননের গল্প
২৮। দর্শন গবেষণা—নীলমণি ঘটক
২৯। প্রেম মৃত্যুহীন
৩০। নগ্নদেবতা—হাওয়ার্ড ফাস্ট
৩১। গান্ধীবাদ—সত্যব্রত ঘোষ
৩২। হিন্দু স্ত্রীর উত্তরাধিকার—রঘুনাথ মাইতি
৩৩। পশ্চিমবঙ্গীয় ভাড়াটিয়া আইন : ১৯৫৬
৩৪। ইংলিশে বাংলায় লড়াই—অরূপ
৩৫। আমার শিকার-স্মৃতি—বিজয়কান্ত সেন
৩৬। স্থান কাল পাত্র—অমিতাভ চৌধুরী
৩৭। নিশিদিন—ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
৩৮। প্রিয়তমেষু—নবগোপাল দাস
৩৯। সুখের নাম প্রজাপতি—জীবন ভৌমিক
৪০। বিলিতি বিচিত্রা—হিমানীশ গোস্বামী
৪১। মঞ্চ থেকে পৃথিবী—অতীন্দ্রিয় পাঠক
৪২। প্রগতিশীল শিক্ষা—কার্লটন ওয়াশবার্ণ
৪৩। শিক্ষা সমস্যার কয়েকটি দিক—বিমলচন্দ্র সিংহ
৪৪। সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা—ডিয়ানা লেভিন
৪৫। শিশুমনের সহজ কথা—দীপিকা পাল
৪৬। The treasury of general knowledge—Ram Labhaya & J. R. Goil
৪৭। বুনিয়াদী শিক্ষা—বিজয়কুমার
৪৮। শিক্ষা পরিক্রমা—ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য
৪৯। শিক্ষক শিক্ষণ প্রবেশিকা—বিমল দাশগুপ্ত
৫০। শিশু অপরাধ ও অপরাধী—প্রমদানাথ চৌবে

৫১। শিক্ষার নূতন পথে—শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী
৫২। আমেরিকা ও যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা—আর্থার এস. ফ্লেমিং
৫৩। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা (তত্ত্ব ও প্রয়োগ)—শেফালিকা শেঠ
৫৪। শিক্ষক শিক্ষণ প্রবেশিকা—বিমল দাশগুপ্ত
৫৫। প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা—শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য
৫৬। শিক্ষা ও স্বাধীনতা—কোনান্ট। ফণী দাশ, অনু°
৫৭। শিক্ষার ভিত্তি—বনফুল
৫৮। শিক্ষার ইতিহাস—মৃত্যুঞ্জয় বকসী
৫৯। শিক্ষণ সঙ্কিতা : ১ম—জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৬০। শিক্ষায় পথিকৃৎ—বিভুরঞ্জন গুহ
৬১। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান—বিজয়কুমার ভট্টাচার্য
৬২। শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস বিজ্ঞান—লক্ষ্মীশ্বর সিংহ
৬৩। শিশুমঙ্গল—আবুল হাসানাৎ
৬৪। অবোধ্য শিশু—উমা চৌধুরী ও বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়
৬৫। বুনিয়াদী শিক্ষা (নাটক)—মণিকা চৌধুরী
৬৬। শিশুশিক্ষার গোড়ার কথা—উৎপল হোমরায়
৬৭। যুবকল্যাণ—বিনয় ঘোষ
৬৮। শিক্ষাবিচার—বিনোবা
৬৯। সোভিয়েট ইউনিয়নের ছেলেমেয়ে—গোপাল চক্রবর্তী
৭০। বুনিয়াদী শিক্ষায় একটি নূতন পদক্ষেপ—জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, স°
৭১। নূতন শিক্ষার ভূমিকা—অদিতিকুমার রায়
৭২। শিক্ষা প্রসঙ্গ—বার্টাণ্ড রাসেল, নারায়ণচন্দ্র চন্দ, অনু°
৭৩। আধুনিক শিক্ষা-তত্ত্ব—বীরেন্দ্রমোহন আচার্য
৭৪। শিক্ষানীতি—কুলদাপ্রসাদ চৌধুরী ও গৌরী সেনগুপ্তা
৭৫। শিক্ষা-প্রসঙ্গ—শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য
৭৬। শিক্ষা-বিচিত্রা—নিখিলরঞ্জন রায়
৭৭। কর্মের পথে—স্বরূপানন্দ
৭৮। মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ—কানুপ্রিয় গোস্বামী
৭৯। প্রসাদ—কাজী আশ্‌রাফ মাহমুদ
৮০। প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যা—মনোনীত সেন
৮১। গীতামৃত—গীতামাতৃক
৮২। সমাধান : ২য় খণ্ড—স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী
৮৩। বাঙলায় শ্রীগীতগোবিন্দ—মহাদেব গোস্বামী

৮৪। শ্রীশ্রীমৎ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মৌনী অবস্থার উপদেশ : ২য়

৮৫। গুরু-শিষ্য-সংবাদ—শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী ব্রজাবদেহী

৮৬। যোগে দীক্ষা—শ্রীঅরবিন্দ

৮৭। স্মৃতিচিত্র—ম্যাকসিম গোর্কি। প্রদোৎ গুহ, অনু°

৮৮। ভারতই আমার দেশ—সিনথিয়া বোলজ। ইন্দ্রাণী [illegible], অনু°

৮৯। মাতাজী গঙ্গাবাঈ—অজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

৯০। মহাযোগেশ্বর বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনী ও তৎশিষ্যা শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী : ১ম খণ্ড

৯১। মহারাষ্ট্রের মহাপুরুষ শ্রীশ্রীসৈ বাবা—জিতেন্দ্রনাথ বসু

৯২। শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব—অরুণ ঘোষ

৯৩। বাংলা পড়ানোর নূতন পদ্ধতি—সুধীরচন্দ্র রায়

৯৪। শিশু মন—রমেশ দাস

৯৫। বাংলার ব্যাঙ্কিং—হরিশচন্দ্র সিংহ

৯৬। রাষ্ট্রসংঘ—কালিদাস চক্রবর্তী

৯৭। জয় বাংলা—মহাদেব খাঁ, স° (হিন্দি)

৯৮। এই নির্বাচন—কী শিখলুম— অরবিন্দ চক্রবর্তী

৯৯। গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রপরিচয়—রতিকান্ত ভট্টাচার্য

১০০। যুগের দাবী—ধীরেন্দ্র মজুমদার

১০১। ইলেকট্রিক মেশিন প্রভৃতির দোষ ও প্রতিকার

১০২। কালী কীর্তন : ৫ম খণ্ড—স্বামী সত্যানন্দ

১০৩। খসড়া শাসনতন্ত্র [গণ-পরিষদে পাকিস্তান সরকারের পর রাষ্ট্রসচিব মাননীয় জনাব হামিদুল হক্ চৌধুরীর ভাষণ]; ১৯৫৬

১০৪। স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা

১০৫। পৌরাণিক প্রেমকথা—নবফুল

১০৬। কলঙ্কিত—শ্রীহংস

১০৭। আরতি শঙ্খ ও সুরের বাণী—গজেন্দ্রনাথ গুছাইত

১০৮। কথা দাও—অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

১০৯। প্রথম দশজন : স্কুল ফাইন্যাল : ১৯৬৮

১১০। বুনিয়াদী শিক্ষা (নাটিকা)—মণিকা চৌধুরী

১১১। শিশুপালনে কোনটি চাই : বংশগতি না পারিপার্শ্বিক—সুবিনীতা ঘোষ

১১২। দেশবিদেশের শিক্ষা—শ্রীজ্ঞানান্বেষী

১১৩। কর্মনির্দেশ—ব্যানার্জি ও খাঁ

১১৪। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা—শিক্ষাবিদ্

১১৫। আমাদের ছেলেমেয়ে—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

১১৬। শিশুমন—রমেশ দাশ

১১৭। আধুনিক শিক্ষণ সহায়িকা—নারায়ণচন্দ্র চন্দ

১১৮। শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব—মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১১৯। শিক্ষা, চরিত্র ও মনোবিদ্যা—ঐ

১২০। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাতা— বিভুরঞ্জন গুহ ও শাস্তি দত্ত

১২১। ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ —সন্তদাস বাবাজী

১২২। যোগচতুষ্টয়—স্বামী সুন্দরানন্দ

১২৩। তথাগতের মৈত্রী—উপেন্দ্রলাল বড়ুয়া

১২৪। আনন্দ প্রতিষ্ঠা—শ্রীচিত্তরঞ্জন

১২৫। ভারতীয় বেদভিত্তিক সাম্যবাদ : ১ম—শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী

১২৬। লীলা-সঙ্গী—বিষ্ণু সরস্বতী

১২৭। সহজ রাষ্ট্রভাষা বোধ—ক্ষীরোদকুমার দত্ত

১২৮। হিন্দী ভাষা ও ব্যাকরণ—তারকনাথ আগরওয়ালা

১২৯। চলতি তামিল শিক্ষা—ঈশ্বরচন্দ্র শেখর শাস্ত্রী

১৩০। প্রবাল (কবিতা)—শ্রীমুন্সী

১৩১। গীতার বাণী—অনিলবরণ রায়

১৩২। শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী—পঞ্চানন

১৩৩। সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী : ১৩৮৩—অশোককুমার কুণ্ডু, স°

১৩৪। গীতা ও গীতার্থ বোধিনী—বসন্তকুমার দাস, স°

১৩৫। চেতনার অবতরণ—নলিনীকান্ত গুপ্ত

১৩৬। শ্রীমদ্ভগবদগীতা (ইংরেজী অনুবাদ সহ)—দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩৭। শ্রীমধুকৃসচন্দ্র—ব্রজগোপাল দত্তরায়

১৩৮। প্রপন্ন পথিক—শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

১৩৯। মৃতের কথোপকথন—নলিনীকান্ত গুপ্ত

১৪০। প্রবন্ধাবলী : ৫ম—মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ

১৪১। বাইওকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকা—নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়

১৪২। আলোর তৃষা—যতীন্দ্রনাথ দাস

১৪৩। নীলাঞ্জন ছায়া—শংকর মিত্র

১৪৪। রামকৃষ্ণ—পূর্ণেন্দু গুহরায়

১৪৫। কুটজমালা—কাজী আশ্রাফ মাহ্মুদ

১৪৬। সহজ রাষ্ট্রভাষা বোধ—ক্ষীরোদকুমার দত্ত

১৪৭। লেখাপড়া শেখানর নূতন পদ্ধতি—বিজ্ঞানভিক্ষু
১৪৮। একজন গ্রাম্য কবি (কবিতা)—ঈশ্বর ত্রিপাঠী
১৪৯। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ উপনিষদ্—প্রফুল্ল দাস
১৫০। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল চরিতামৃত—স্বামী ওঙ্কারানন্দ পরিব্রাজকাবধূত
১৫১। তোমার বাঙলা আমার বাঙলা—হিমাংশু জানা
১৫২। সাধনা, ভক্তি ও জ্ঞান—উদিতেন্দুপ্রকাশ মল্লিক
১৫৩। অমর শর্বরী (কবিতা)—ত্রৈলোক্যনাথ দে
১৫৪। রুক্ষ যুগের দুঃখ (কবিতা)—চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়
১৫৫। মুক্তিপথে শিক্ষা-সংস্কার—মাষ্টার মশাই
১৫৬। ঐ ঐ
১৫৭। শিক্ষার ভূমিকা—মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য
১৫৮। শিক্ষা আমার শিশুর কাছে—প্র্যাট্
১৫৯। শিক্ষা ও সমাজ—হরিসাধন গোস্বামী
১৬০। বুনিয়াদী শিক্ষার কথা—অনিলমোহন গুপ্ত
১৬১। সমাজশিক্ষার ভূমিকা—নিখিলরঞ্জন রায়
১৬২। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী—হুমায়ুন কবির
১৬৩। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা—জগদিন্দু বাগচী
১৬৪। শিক্ষার চারদিক—শ্রীনিবাস ভটাচার্য
১৬৫। শিক্ষা : শিক্ষার্থী ও শিক্ষক—শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত
১৬৬। শিশুতীর্থের পথ—উৎপল হোমরায়
১৬৭। অবাধ্য শিশু ও শিক্ষাসমস্যা—বিভুরঞ্জন গুহ
১৬৮। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান—অরুণ ঘোষ
১৬৯। বুনিয়াদী শিক্ষা—সমরেন্দ্র দত্তরায়
১৭০। শিশুর জীবন ও শিক্ষা—শ্রীনিবাস ভটাচার্য
১৭১। সমাজ ও শিশু সমীক্ষা—প্রতিভা গুপ্ত
১৭২। মানুষের মন ও শিক্ষাপ্রসঙ্গ—বিভুরঞ্জন গুহ
১৭৩। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাতা—বিভুরঞ্জন গুহ ও শান্তি দত্ত
১৭৪। জনশিক্ষা-সহচর—বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৭৫। রামকৃষ্ণ—পূর্ণেন্দু গুহরায়
১৭৬। মা—শ্রীঅরবিন্দ
১৭৭। ভাগবত-জীবন—চারুচন্দ্র দত্ত
১৭৮। শিশুপালন—চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়া
১৭৯। মহারসায়ন—সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

১৮০। সৎসঙ্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী
১৮১। উপনিষৎ রত্নমালা—স্বরূপানন্দ গিরি
১৮২। বেদান্তের ভাষ্য—নৃত্যগোপাল রুদ্র
১৮৩। সীবলী চরিত—জ্যোতিপাল
১৮৪। আশ্চর্যনীলমণি—বিশ্বপ্রণবাশ্রম
১৮৫। শ্রীগীতায় গুরুতত্ত্ব—স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি
১৮৬। আহার ও ধর্ম—কালিকানন্দ স্বামী
১৮৭। গীতামৃত—কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৮। সত্যের সন্ধান—শিবদাস মান্না, সং,
১৮৯। ঋণ সালিশী বোর্ড—রঘুনাথ মাইতি
১৯০। সরল ধাত্রীশিক্ষা ও কুমারতন্ত্র—ডঃ সুন্দরীমোহন দাস
১৯১। ব্লাড-প্রেসার—ডঃ খগেন্দ্রনাথ বসু
১৯২। দীপমালিকা—বিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
১৯৩। কর্মের পথে—স্বামী স্বরূপানন্দ
১৯৪। সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম : ১ম ভাগ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
১৯৫। কবিতার জন্য কবিতা—অভিজিৎ ঘোষ
১৯৬। নীলাঞ্জন ছায়া—শংকর মিত্র
১৯৭। The Perspective—B. B. Thengadi
১৯৮। ইরানের শিল্প ও সংস্কৃতি—গুরুদাস সরকার
১৯৯। মহাভারত : ১ম খণ্ড
২০০। সুন্দর সংহিতা—চারুধর্মী
২০১। অবশেষে (কাব্য)—মানব ঘোষ
২০২। মেনা একটি নদীর নাম/পদ্মা একটি নদীর নাম—নিমাই মান্না
২০৩। সজনে নির্জনে আমি—অরুণাভ দাশগুপ্ত
২০৪। রূপসী বারোটি রুশ কবিমন—প্রণবেন্দুসুন্দর সান্যাল, অনু°
২০৫। দূরদর্শী—সুধাংশু গুপ্ত
২০৬। মনোগঙ্গা—রাধামোহন মহান্ত
২০৭। আলোকিত মেঘ—প্রশান্ত দাস
২০৮। আলোকের উৎস সন্ধানে—সঞ্জয়
২০৯। সম্পূর্ণ—ভোলানাথ শীল
২১০। ভাঙা তলোয়ার—জুলফিকার হায়দার
২১১। স্বপ্নসম্ভবা—দীপ্তিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
২১২। গঠনের পথে ভারত (USIS প্রচারিত)

২১৩। শিশু পালন—পারুল দেবী
২১৪। প্রতিবিম্ব—
২১৫। জয়বাংলা—শৈলেন দত্ত
২১৬। গান্ধী স্মারকনিধি (বাংলা শাখা)
২১৭। বায়াম্নো থেকে বায়াত্তর—খুরশেন-উন-নবী তবারক. স°
২১৮। Union Board Manual—Suresh ch. Ghosh
২১৯। ভারতশাসন আইন—অমলেন্দু সেন
২২০। ১৯৬৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় দোকান ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কীয় আইন
২২১। ঋণ সালিশী বোর্ড—রঘুনাথ মাইতি
২২২। ব্যক্তিগত—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
২২৩। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ—মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
২২৪। আমি ও লেখা—প্রভাতকুমার ঘোষ
২২৫। প্রসাদ—কাজী আশ্‌রাফ মাহমুদ
২২৬। নিবেদন—ঐ
২২৭। অশ্রু—'মনকুসুম'
২২৮। কুটজমালা—কাজী আশ্‌রাফ মাহ্‌মুদ
২২৯। ঝরা ফুল—তারাপদ চক্রবর্তী
২৩০। নামসার—গিরিবালা দেবী
২৩১। সারথি—মাখন গুপ্ত
২৩২। শ্যামা-গীতিকা—শ্রীকুমার ভট্টাচার্য
২৩৩। অভিরাম—দেবীমল্লিকা
২৩৪। রাত্রির আকাশে সূর্য—অনিলকুমার দলুই
২৩৫। নন্দনপুর নাট্য সমিতি—রাতুল লাহিড়ী
২৩৬। দধীচি—যামিনীমোহন মতিলাল
২৩৭। উষার আলো—অন্নদামোহন বাগচী
২৩৮। মহাজীবন—পরেশচন্দ্র ভোরা
২৩৯। শিল্পধারা—প্রভাতকুমার দত্ত
২৪০। অঞ্জলি—হরিদাস দে
২৪১। আহার ও ধর্ম—কালিকানন্দ স্বামী
২৪২। পূজা—কেলসাম
২৪৩। রহস্যবিদ্যা—বিজয়কৃষ্ণ
২৪৪। গীতাবিন্দু—বিহারীলাল গোস্বামী
২৪৫। সাধক—শ্রীরাধারমণ দেব

২৪৬। তারা জানে না ইস্‌লাম কি—মোহাম্মদ তৈমুর
২৪৭। উপনিষৎ—সংকলন : ১ম
২৪৮। কামকাঞ্চন—বালক ব্রহ্মচারী
২৪৯। শ্রীশ্রীগুরুমহিমামৃত—সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
২৫০। দীক্ষামন্ত্র—চিন্তাহরণ বিশ্বাস
২৫১। কিম্বা…অথচ…এবং…কিন্তু—আবদুস সামাদ
২৫২। উপনিষদের আলো—মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৫৩। বেদান্ত বাচস্পতি যদুনাথ—মতিলাল দাশ
২৫৪। বনফুল সাধন গীতিমালিকা—সানন্দ ব্রহ্মচারী
২৫৫। স্বামী বিবেকানন্দ স্মারকগ্রন্থ (মেদিনীপুর কলেজ)
২৫৬। লোকশক্তি (পত্রিকা) : ৫ম বর্ষ, নভেম্বর—ডিসেম্বর '৭৫, জানু—এপ্রিল '৭৬
২৫৭। আনন্দবাজার পত্রিকা রিক্রিয়েশন ক্লাব : দুইপুরুষ (সুভেনির)
২৫৮। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জাতীয় সম্মেলন '৭৩
২৫৯। শুশ্রূষাবিদ্যা, ৪র্থ পাঠ—ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস
২৬০। হাইড্রোপ্যাথি মতে শিশু-চিকিৎসা—ডাঃ প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২৬১। টি. বি. : সহজবোধ্য ও সহজসাধ্য—ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত
২৬২। যক্ষ্মায় সারে !—পশুপতি ভট্টাচার্য
২৬৩। যক্ষ্মা ও তাহার প্রতিকার—বিধুভূষণ পাল
২৬৪। প্রসূতি ও নবজাতক—শক্রজিৎশংকর দাশগুপ্ত
২৬৫। স্ত্রীরোগের জল চিকিৎসা—কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২৬৬। যক্ষ্মা ও চিকিৎসা—প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়
২৬৭। সচিত্র জন্মনিয়ন্ত্রণ—মত ও পথ—আবুল হাসানাৎ
২৬৮। কুষ্ঠসেবা—পার্বতীচরণ সেন
২৬৯। গো-জীবন—প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭০। প্রাকচর্যা—ডাঃ অরুণ শীল
২৭১। খাদ্যের নববিধান—কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২৭২। নীতিবিজ্ঞান—ইন্দুভূষণ মজুমদার
২৭৩। রূপ নেহারলুঁ—বরেন ঘোষাল
২৭৪। এই সীমান্তে—মিহির সরকার
২৭৫। কত কথা মনে পড়ে—শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৭৬। পরিবার পরিকল্পনা—ডাঃ মদন রানা
২৭৭। যক্ষ্মারোগ ও প্রতিরোধ—সন্তোষকুমার ঘোষ

২৭৮। রোগটা যখন টি. বি.—অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়
২৭৯। যক্ষা : রোগ ও রোগী—ডাঃ সুবলচরণ লাহা
২৮০। সিদ্ধেশ্বরী সঙ্গীত-মালা—সতীশচন্দ্র ঘোষাল
২৮১। পথিকের গান—অসীমানন্দ
২৮২। গীতি-বীথিকা—সাধনভাই
২৮৩। সাধন সঙ্গীতমালা—নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২৮৪। জলের প্রকৃতি ও প্রয়োগ—বিধুভূষণ পাল
২৮৫। সুর সাগরের তীরে—আর্যকুমার মুখোপাধ্যায়
২৮৬। অর্ঘ্য—দেবী মল্লিকা
২৮৭। পল্লী গীতিকা—শিবেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল
২৮৮। মনোমোহন অমিয় গীতি—কানুপ্রিয় সমাজদার
২৮৯। সঙ্গীত-সপর্য্যা—নৃসিংহদাস তন্ত্ররত্ন ভট্টাচার্য
২৯০। কথাগুলি—হরিপদ বিশ্বাস
২৯১। অভিনব প্রাকৃতিক চিকিৎসা
২৯২। প্রশ্নোত্তরে মনোরোগ প্রসঙ্গ—ডাঃ অজিতকুমার দেব
২৯৩। কেমন করিয়া চিকিৎসককে অবস্থা জানাইতে হয়—বিজয় বসু
২৯৪। শিশুরোগের গৃহচিকিৎসা—কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২৯৫। গানের গান—নলিনীকান্ত গুপ্ত
২৯৬। সরোজরঞ্জন ভজনাবলী—সরোজরঞ্জন ঘোষ
২৯৭। গীতিমালিকা—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ
২৯৮। ব্লাড ক্যানসার—উমাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
২৯৯। আবৃত ইতিহাস উনকোটি—জয়ন্তনাথ চৌধুরী
৩০০। একটা গুলির শব্দে—বাসুদেব দেব
৩০১। অন্তরা—চিত্ত ঘোষ
৩০২। শিশির সিনান—এস. ইস্
৩০৩। এক নাম বহু নাম—রথীন ভৌমিক
৩০৪। এবং কয়েকজন যুব—সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য
৩০৫। এরই নাম ভালবাসা—শৈলজানন্দ ভট্টাচার্য
৩০৬। পূর্বপারের রূপকথা—ধীরেশ ভট্টাচার্য
৩০৭। একই পাখি রঙ আলাদা—নির্মল আচার্য
৩০৮। বৈমানিকের ডায়েরী—দীপঙ্কর
৩০৯। ইভান দেনিসোভিচের জীবনের একদিন—সুভাষ মুখোপাধ্যায়
৩১০। লগবুক—রবীন্দ্রনাথ রায়

আভাসচন্দ্র মজুমদার ; ২৬/১, কৈপুকুর লেন, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০২

১। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ —আভাসচন্দ্র মজুমদার, স°

আয়তি, সম্পাদক ; ৫৪, চণ্ডিতলা ব্রাঞ্চ রোড, কলি-৫৩

১। আয়তি, ১ম বর্ষ, সংখ্যা ৪-৫ (২ কপি)

এ. কে. সরকার এ্যাণ্ড কোং ; ১/১ এ, বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি-৭৩

১। আঙ্কল টম্‌স কেবিন—হরতোষ চক্রবর্তী, অনু

২। ডাঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড—অসিতকুমার সরকার, অনু

৩। সেকস্‌পীয়রের গল্প—গৌরসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

এক্ষণ, প্রকাশক ; ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ; কলি-৯

১। এক্ষণ, ১১শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ বিশেষ সংখ্যা, ১৩৮১

২। „ ১৩শ বর্ষ, „ ১৯৭৮

এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ; ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি-১২

১। ঈদ্‌-উল-ফিতর—সবিতা সেনগুপ্ত

২। মুখর মর্মর—বিভা সরকার

৩। কথা ১৯৫০-১৯৭০—অন্নদাশংকর রায়

৪। বিশ্বসাহিত্যের লেখক—ভবানী মুখোপাধ্যায়

৫। সাতনরী—সাধনা দেবী

৬। এবার প্রিয়ংবদা—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৭। দ্বিতীয় রহিত—সুজাতা

৮। তিক্ততার এই রঙে জন্ম—লোকনাথ ভট্টাচার্য

কমল সমাজদার ; ৫, মুরারি মিত্র রোড, কলি-৫৮

১। খড়দহ থানা সমাচার (শারদীয়া ১৩৬৯)

২। শারদীয় কালান্তর (১৩৮৬)

কল্যাণী দেবী (প্রামাণিক) ; বেলগাছিয়া ভিলা, কলিকাতা-৩৭

১। দীঘি আর আকাশ—কল্যাণী দেবী (প্রামাণিক)

২। খোকন বাবু— ঐ

৩। শিশুর ভক্ত— ঐ

৪। রাজার ঘরে যে ধন নেই— ঐ

কুমারেশ ঘোষ ; করুণাধারা, ২৮/৩ আর, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড,কলি-৫৪

১। এক ঘর অনেক কনে—কুমারেশ ঘোষ

২। যষ্টিমধু পত্রিকার ৩টি সংখ্যা, ১৩৮৫

কোহিনুরকান্তি করণ ; ক্ষেমানন্দ কুটির, ডাকনমারি, পোঃ জমকা, মেদিনীপুর

১। মহেন্দ্রচরিত (২ কপি)—কোহিনূরকান্তি করণ সঙ্কলক

ক্ষুদিরাম দাস ; ১৮সি, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

১। কবিকঙ্কন চণ্ডী—ক্ষুদিরাম দাস

২। রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়—ঐ

৩। বাঙলা কাব্যের রূপ ও রীতি—ঐ

গণেশ লালওয়ানী ; জৈন ভবন, পি ২৫, কালাকার স্ট্রীট, কলি-৭

২। শ্রমণ ; বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৮৫—গণেশ লালওয়ানী সম্পাদিত

২। Jain Journal—Vol. 13, No. 1-4

গায়ত্রী গোস্বামী ; ১ বি গোরাচাঁদ বসু রোড, কলি-৬

১। Manimanjari Byakaranam—Nilmoni Mukhopadhya

২। তর্কসংগ্রহ (সংস্কৃত)— পণ্ডিত আনাম ভট্ট

৩। বেদার্থ্য ভাষ্য—পণ্ডিত আর্য্যমুনি

গৌরী গোস্বামী ; ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

১। শঙ্খবতী—শ্রীমন্ত সওদাগর

গ্রন্থ মেলা ; এ/১২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

১। রামপ্রসাদ (জীবনী ও রচনা সমস্ত)—সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

গ্রন্থলোক ; ৯৩/২ বৈঠকখানা রোড, কলি-৯

১। আলফ্রেড হিচকক নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প—দীনেশচন্দ্র সাহা

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ; ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২

১। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী, ১ম ও ২য় খণ্ড—নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত

চতুষ্কোণ সম্পাদক ; ১২৩ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলি-১৪

১। চতুষ্কোণ ১৩৮৫ বৈশাখ-চৈত্র—শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী

চারুশীলা সেন ; ৩৭ গৌরীবাড়ী লেন, কলি-৪

শুকতারা ১৩৮৫ অগ্রহায়ণ-চৈত্র, ১৩৮৬ আষাঢ়

চিত্ত সিংহ ; ৪ ভূপেন বোস এভিন্যু, কলি-৪

১। সজনী সংবাদ, ১ম বর্ষ, ১ম, ২য়-৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৭৯

তরুণদেব ভট্টাচার্য ; মুর এভিন্যু হাউসিং এস্টেট, ব্লক-এল, ফ্ল্যাট-২, কলি-৪০

১। পশ্চিমবঙ্গ দর্শন ; মেদিনীপুর—তরুণদেব ভট্টাচার্য

তুলি-কলম ; ১ কলেজ রো, কলি-৯

১। স্বপ্ন সত্য বাস্তব—জরাসন্ধ

ত্রিদিবনাথ রায় ; ১৯ শ্রীনাথ মুখার্জী লেন, কলি-৩০

১। প্রবন্ধ-মঞ্জুষা—ত্রিদিবনাথ রায়

দিলওয়ার হোসেন ; টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ

১। দ্বিতীয় সূর্য শুক্লপক্ষের—দিলওয়ার হোসেন
২। এখন প্রত্যহ একুশে ফেব্রুয়ারী „

দিলীপকুমার দাস ; ৩৫ উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলি-৫৪

১। তিন শতকের কলকাতা—নকুল চট্টোপাধ্যায়
২। চিরকুমারী সভা— ঐ
৩। যখন ছাপাখানা এলো—শ্রীপান্থ
৪। গিরীশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
৫। মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৬। দাদাঠাকুর—নলিনীকান্ত সরকার
৭। আর কোনোখানে—লীলা মজুমদার
৮। ক্ষুদ্রপট ক্ষুদ্র প্রাণ—সমুদ্র গুপ্ত
৯। গগনেন্দ্রনাথ—মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
১০। শ্রদ্ধাস্পদেষু—নলিনীকান্ত সরকার
১১। সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস
১২। বাংলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
১৩। Selections from the Indian Journals, Vol. 9. Calcutta Journal—Satyajit Das, ed.
১৪। Bengal riots their rights & Liabilities—Sanjeebchandra Chatterjee.
১৫। On the Bengal Renaissance—Susobhan Sarkar.
১৬। বনস্পতির বৈঠক, ১ম পর্ব, ২য় খণ্ড—প্রবোধকুমার সান্যাল
১৭। জীবনের স্মৃতিদীপে—রমেশচন্দ্র মজুমদার
১৮। সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন—জয়ন্ত গোস্বামী
১৯। বনস্পতির বৈঠক, ১ম পর্ব, ১ম খণ্ড—প্রবোধকুমার সান্যাল
২০। প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহ—কুনাল সিংহ
২১। বাবু বৃত্তান্ত—সমর সেন
২২। রাজনারায়ণের কলকাতা—অমরেন্দ্র দাস
২৩। পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র—হিরণকুমার সান্যাল
২৪। পুরানো কলকাতার ভুতুড়ে বাড়ী—সুভাষ সমাজদার
২৫। জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী—নারায়ণ দত্ত
২৬। The Newspaper in India—Hemendraprosad Ghosh
২৭। ঠিকানা কলকাতা—সুনীল মুন্সী

২৮। ভারতের শিল্প ও আমার কথা—অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
২৯। বঙ্গ সংস্কৃতির কথা—যোগেশচন্দ্র বাগল
৩০। চিত্রকর—বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
৩১ ব্রিটিশ আমলে 'পথের দাবী' ও রবীন্দ্র-শরৎপ্রসঙ্গ—ইন্দ্র মিত্র
৩২ ক্ষণকালের ছন্দ—সুব্রত রুদ্র
৩৩ জিন্দাবাহার—পরিতোষ সেন
৩৪ ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সংগীত—দেবব্রত বিশ্বাস
৩৫ কাদম্বরী দেবী—সুব্রত রুদ্র
৩৬ মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রাবলী—সুশীল রায়, অনু° স°
৩৭। আমার কাল আমার দেশ—সুধীরচন্দ্র সরকার
৩৮। কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ—সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়
৩৯। কোম্পানী আমলে বিদেশী চিত্রকর—প্রদ্যোৎ গুহ
৪০। ফিরে ফিরে চাই—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৪১। The Bengali Press (1818-1868) : A study in the Growth of public opinion - Smarjit Chakraborty
৪২। The two Great Indian Artist—Prasanta Daw, ed.
৪৩। Calcutta keep sake - Aloke Roy, ed
৪৪। মহৎ স্মৃতি বা মহতের অনুধ্যানে—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
৪৫। শুভাকাঙ্খী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৬। Suppression of Prema in Nineteenth century India—Pramila Pandhe, ed.
৪৭। পুরানো কলকাতার কথাচিত্র—পূর্ণেন্দু পত্রী
৪৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইউরোপীয় লেখক (ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)
৪৯। কলকাতার রাজকাহিনী—পূর্ণেন্দু পত্রী
৫০। সবারে আমি নমি—কানন দেবী
৫১। তীর্থংকর—দিলীপকুমার রায়
৫২। অবসন্তের অপলাপ—বিনায়ক সান্যাল
৫৩। আমার যৌবন—বুদ্ধদেব বসু
৫৪। আমার ছেলেবেলা— „
৫৫। যাত্রী—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫৬। তিহি কলকাতা ছাড়িয়ে—বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
৫৭। Henry Derozio : The Eurasian Poet and Reformer—Elliot walter Madge, ed. by Subir Roy Chowdhuri

৫৮। Social Thought in Bengal (1757-1947)—Indira Sarkar

৫৯। বাবু গৌরবের কলকাতা—বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ; ২৯, আনন্দ পালিত রোড, কলি-১৪

১। Twenty years of Socio-economic Research Institute (7th July 1959-7th July-1979)—Issued by Durgaprasad Bhattacharya

দেবকুমার বসু ; 'বিশ্বজ্ঞান', ৯/৩ টেমার লেন, কলি-৯

১। মনীষার মণীষা শ্রীঅরবিন্দ—নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

২। দেশ বিদেশের শিক্ষা—শ্রীজ্ঞানান্বেষী

৩। ফরাসী বিপ্লবে মুদ্রাস্ফীতি—দিলীপকুমার বিশ্বাস ও শেখর কুমার

৪। ইতিহাস শিক্ষণ—দিলীপকুমার বিশ্বাস

৫। জলতরঙ্গ—সলিল লাহিড়ী

৬। সময়ানুগ ১ম বর্ষ : ১ম-১২শ সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩৭৮—আশ্বিন ১৩৭৯)

৭। দেহ দানের ভূমিকা—নিতীশদেব সরকার

৮। অমল অন্ধ—সন্তোষ দাশ

দেবজ্যোতি গোস্বামী ; ৫/১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলি-৯

১। সত্যজ্যোতি-জীবনস্মৃতি—সুনীন্দ্রনাথ রায়

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

১। দ্বিজ—কবিচন্দ্রের কপিলা-মঙ্গল—দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

দেবাশিষ বসু ; ৫/২ বণ্ডেল রোড, কলি-১৯

১। স্মরণ—ইন্দিরাসুন্দরী দাসী

২। প্রতারিতা—ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

দ্বিজদাস কর ; অনিমা প্রকাশনী, ১৪১ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলি-৯

১। কীর্তিস্তম্ভ—ভবতোষ ঘোষ

নন্টু ঘোষাল ; ১নং কলোনী, ই. পি. ৯৮, কলি-৪৮

১। চশমা, ১৩৮৬, শ্রাবণ—সমীরকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

২। ঐ, বিশেষ কার্তিক সংখ্যা, ১৩৮৫— ঐ

নবজাতক প্রকাশন ; এ-৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭

১। একুশে ফেব্রুয়ারী—হাসান হাফিজুর রহমান, সম্পাদনা

২। পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা—সৈয়দ মুজতবা আলী

৩। মরু-ভাস্কর—কাজী নজরুল ইসলাম

৪। লাতিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রাম (১ম ও ২য় খণ্ড)—সুদর্শন রায়চৌধুরি

৫। ইন্দিরা শাহী—

৬। পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট—মূল রচনা, বদরুদ্দিন উমর, সম্পাদনা জিয়াদ আলি

৭। একটি গাছ একশ ফুল—দুর্গাদাস সরকার

৮। এযুগের রক্তে—শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

৯। অশান্ত কাম্বোডিয়া—সৌম্য মিত্র

নরেশচন্দ্র দাস ; ২০ ঠাকুরতলা রোড, পূর্ব বরিষা, কলি-৮

১। নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ (২ কপি)

নির্মলকান্তি মজুমদার ; ৩৭ বেলগাছিয়া রোড এম.আই.জি., ব্লক-জি. ফ্ল্যাট-৬, কলি-৩৭

১। Ratnavalia, a drama in four acts, tr. from the Bengali— Michael M. S. Dutta

২। খ্রীষ্টের অনুকরণ—De Imitatione chirti-র অনুবাদ

৩। P. Vergili Maronis Aeneidos Liber V/The Funeral Games — Arthur Calvert

৪। Lectures on the ancient system of irrigation in Bengal— Sir William Willcocks

নির্মলকুমার খাঁ ; হাওড়া জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, ৫৯, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-১

১। হাওড়া জেলা ও শরৎচন্দ্র—নির্মলকুমার খাঁ সম্পাদিত

নির্মলকুমার খাঁ ; শতকণা, ১৪ মাকড়দহ রোড, হাওড়া-১

১। আচার্য শঙ্কর—জীবনকৃষ্ণ শেঠ

২। সবুজ মনের মুকুরে—বিশ্বনাথ দহ

নীরেন ব্যানার্জী ; ২এ, কালীঘাট পার্ক সাউথ, কলি-২৬

১। বন্দে মাতরম্ আনন্দমঠ ও বঙ্গজীবনকাব্য—শকুনি (ছদ্মনাম)

২। India astrologycally—Niren Banerjee

৩। আমি নেতাজী বলছি—ডালিয়া বসু

নীরেন্দু হাজরা ; ১৭/১২/২ শশীভূষণ সরকার লেন, শালকিয়া, হাওড়া

১। শরৎ সাহিত্য পরিক্রমা—নীরেন্দু হাজরা

নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য ; শোভাকর পাড়া, পোঃ ভদ্রিপাড়া, হুগলি

১। শ্রীশ্যামা কল্পলতিকা (টীকা, বঙ্গানুবাদ ও কবি জীবনীসহ)—নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য

পতাকীভূষণ মজুমদার, ৫ মুরারী মিত্র রোড, কলিকাতা

১। সানুবাদ মন্ত্রশক্তি বা সর্বাঙ্গ রক্ষা—কালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ, অনু ও সং

পথের আলো সম্পাদক : রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী

১। পথের আলো (পত্রিকা) ত্রয়োদশ বর্ষ, ১-৬৬ সংখ্যা—রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী

পরিমল চক্রবর্তী ; 'নিরালা' ৪৩৪ পূর্ব-সিঁথি রোড, কলিকাতা-৩০

১। রঞ্জিত ফাল্গুন— পরিমল চক্রবর্তী

২। ঝর্ণা-মন— "

পরেশ মণ্ডল ; "অব্যয়", ৪২ গড়পার রোড, কলি-৯

১। উনিশ শ উনআশি (১৯৭৯)—সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য

পরেশ মণ্ডল ; বারুইপুর, ২৪ পরগনা

১। পেণ্ডুলাম— পরেশ মণ্ডল

২। অদূরে জলের শব্দ— "

পুঁথিপত্র ; ৯ অ্যান্টনিবাগান লেন, কলি-৯

১। শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা—সুরেশচন্দ্র মৈত্র, সং

পুলকেশ দে সরকার ;

১। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—পুলকেশ দে সরকার

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত ; ২০০ রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া— ৭১১১০১

১। পাণ্ডব গৌরব— প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, সং

২। সধবার একাদশী— "

৩। শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক কাহিনী— "

প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য ; ৬/১ বনমালী চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-২

১। বাঙলা নাটকে স্বদেশিকতার প্রভাব (১৮০০-১৯১৪)—প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য

প্রভাস রঞ্জন দে ; ৪/২ যাদব ঘোষ লেন, কলি-৬১

১। Children's Literature of Bengal—Provashranjan Dey

২। National Register of Writers for Children— ,,

বন্দিরাম চক্রবর্তী ; ৪০/১ ট্যাংরা রোড, ব্লক-ডি, ফ্ল্যাট-১২, কলি-১৫

১। নব পর্যায় বীরভূমি—নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৮৬

২। বীরভূমি (শারদীয়া সংখ্যা), ১৩৮৬

৩। Centenary volume ; C. F. Andrews 1871-1971

বাণী প্রকাশন ; ৯/১ টেমার লেন, কলি-৯

১। লীলা তত্ত্ব সৃষ্টিলীলা : জীবলীলা (৩ কপি)—নগরাজ

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ ; ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

১। পরিবর্তন— মনোরঞ্জন ঘোষ

২। সুন্দরবনের চিঠি— যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৩। গল্প আর গল্প— প্রেমেন্দ্র মিত্র

৪। স্বর্ণমুকুট— গোপেন্দ্র বসু

৫। গল্পময় ভারত, ১ম— সুশীল জানা
৬। এক জাহাজ গল্প : সাগর দাঁড়ী— প্রেমেন্দ্র মিত্র
৭। মকর মুখী— „
৮। Trends in Shakespearian criticism—S. P. Sengupta
৯। Scientific & Technical terms in modern Indian Languages —Suniti Kr. Chatterjee
১০। Modern Bengal—Nirmal Kr. Bose
১১। Studies in Browning —S. P. Sengupta
১২। ময়ূর পঙ্খী— প্রেমেন্দ্র মিত্র
১৩। বিপ্লবী মহানায়ক— মনোরঞ্জন ঘোষ
১৪। সাদা ঘোড়ার সওয়ার— প্রেমেন্দ্র মিত্র
১৫। Studies in Browning, vol. II—S. P. Sengupta
১৬। গোয়েন্দা হলেন পরাশর বর্মা— প্রেমেন্দ্র মিত্র
১৭। গীতা— অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
১৮। মঞ্জমায়া— ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

বিভূতিভূষণ রায় ; কাজি বাজার, কটক-১

১। মেঘদূত (২ কপি)—কালিদাস, ছন্দানুবাদ : বিভূতিভূষণ রায়

বিমলেন্দু চক্রবর্তী ; ২২/২এ বাগবাজার স্ট্রীট, কলি-৩

১। পাদপীঠ—৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
২। জ্যোতির্ময়—৩য় বর্ষ, ১ম সংকলন
৩। জ্যোতির্ময়—শারদ সংখ্যা, ১৩৮৫

বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

১। সতেরো বছর বয়সে—নীল লোহিত
২। ঘরের কাছে আরশি নগর—কালকূট
৩। পায়ের তলায় মাটি—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৪। গন্তব্য—সমরেশ বসু
৫। মহাভারত : বিরাট পর্ব (১২)—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত
৬। „ উদ্যোগ পর্ব (১৩)— „
৭। „ „ (১৪)— „

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'আয়ুর্বেদ কুটীর,' ৭৮ সূর্যসেন রোড, কলি-৩৫

১। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূচনাও অবসান—বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১। কবির ভনিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুলবুল চক্রবর্তী ; ৮৯, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলি-৫৪

১। বিমান নিয়ে বিভীষিকা—চিত্তরঞ্জন ঘোষাল

বুলু মুখার্জী ; ৩৮/১/এ গড়িয়াহাট রোড, কলি-২৯

১। Raja Rammohan Roy : His life, writings speeches.
২। Raja Rammohan Roy and the last Moghuls : 'A selection from official Records' (1803-1859)
৩। The Father of Modern India
৪। Rammohan Roy and America
৫। Keshabchandra Sen in England
৬। Tuhfatul Mawahhiddin (in English) — Rammohan Roy
৭। Tuhfatul Mawahhiddin (in Persian) — „
৮। The spirit of god (2 copies)—Pratapchandra Mozoomdar
৯। Appreciations of Raja Rammohan Roy at home and Abroad
১০। The Precepts of Jesus
১১। The English Works of Raja Rammohan Roy
১২। The English Works of Raja Rammohan Roy (in three parts)
১৩। Raja Rammohan Roys Mission to England—Brajendranath Banerjee
১৪। Brahmo Dharma (in English)
১৫। Brahmo Dharma (in Bengali)
১৬। Brahmojijnasa
১৭। Tour round the World—Pratapchandra Mozoomdar
১৮। Keshabchandra Sen—P. K. Sen
১৯। Raja Rammohan Roy—S. D. Collett
২০। Letters and Documents relating to the life of Rammohan Roy—Chanda and Majumdar
২১। The life of Keshabchandra Sen—Pratapchandra Mojoomdar
২২। Last Days in England—Mary Carpenter
২৩। English works of Raja Rammohan Roy
২৪। Teachings of the Upanishads—Hemchandra Sarkar
২৫। The Oriental Christ—Pratapchandra Majoomdar
২৬। Heartbeats „
২৭। Rammohan : the Universal Man—Brajendranath Seal
২৮। Rishi Pratapchandra
২৯। Brahmo Prabashir Patra

৩০। Raja Rammohan Roy's Sanskrita o Bangla Granthabali
৩১। Aspects of the Vedanta
৩২। Three Great Acharyas : Sankara, Ramanuja, Madhwa
৩৩। Sri Sankaras Select works
৩৪। Bhagavat Gita—Annie Besant
৩৫। Exploration in Tibet (২ কপি)—Swami Pranavananda
৩৬। Raghuvansar canto II
৩৭। Golden Threshold—Sarojini Naidu
৩৮। Brahmo Year Book for 1882
৩৯। Brahmo Upasaner Bandha Padyati—Surendrasashi Gupta
৪০। The Religious Education of Children— ,,
৪১। Dharmasadhaney Sarir— ,,
৪২। Brahmic Unity—Dr. V. Ramkrishna Rao
৪৩। The Pilgrim—Benoyendranath Sen
৪৪। The Possibility of a Universal Religion—Rev. Charles. W. Wendte
৪৫। Manus Rammohan—SatishChandra Chakraborty
৪৬। Rammohan Smriti
৪৭। Acharya Satishchandra Chakraborty
৪৮। Vedanta-Sar
৪৯। Religion of the Brahmo Samaj—Hemchandra Sarkar
৫০। ছেলেমেয়েদের ধর্ম-শিক্ষা—সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত

Directorate of Census operation ; West Bengal, 20 British Indian Street, Cal-1

1. Census of India, 1961 Vol. 3, Assam japisajia, a village survey monograph
2. ,, ,, Vol. 5, pt. 6, No. 9. Gujart sutrapada fishing hamlet
3. ,, ,, Vol. 14, pt. 1-c(ii) Rajasthan sub sidiary tables.
4. ,, ,, Vol. 15, pt.1-c(i) Uttarpradesh subsidiary tables
5. ,, ,, Vol. 15, pt. 6. Uttarpradesh village Chapnu (Dehra Dun)
6. ,, ,, Vol. 16, pt. 1-A (i)—W. B. Sikkim. General report. Population Progress
7. ,, ,, Vol. 16, pt. II-B(i)-W. B. & Sikkim. General economic tables

8. Census of India 1961 Vol. 16. pt. x-B—W. B. & Sikkim. Alphabetical index of villages

9. ,, ,, Vol. 16, pt. II-c(iii)—W. B. & Sikkim Migration tables

10. ,, ,, Vol. 16, pt. 6. No. 2—West Bengal Village survey : Kamnara (Burdwan)

11. ,, ,, Vol. 16, pt. 6(6)—West Bengal & Sikkim. Village survey (Chandrabhag)

12. ,, ,, Vol. 16, pt. x-A. W. B. & Sikkim Tables on the Calcutta industrial region

13. ,, ,, Vol. 16, pt. II-C(i)—W.B. & Sikkim Social & Cultural tables

14. ,, ,, Vol. 16, pt. 1-A(ii)—W. B. & Sikkim General table : Population & Society

15. ,, Vol. 16, pt. 1-B.—W. B. & Sikkim Report on vital statistics

16. ,, Vol. 16, pt. 5-A(ii),—W.B. & Sikkim tables on Scheduled Tribes

17. ,, Vol. 16, pt. 5-A(i)-W. B. & Sikkim Tables on Scheduled Castes

18. ,, ,, Vol. 16, pt. 1-C—W.B. & Sikkim Subsidiary tables

19. ,, ,, Vol. 16, pt. 7-A (iii)—W. B. & Sikkim Handicrafts survey monograph on stonewares

20. ,, ,, Vol. 16, pt. 7-A(12)—W. B. & Sikkim Handicrafts survey monograph on cutlery of Jhalda

N. C. Lahiri ; 57/6 Raja Dinendra St. Cal-6

1. Lahiri's Indian ephemeris of planets position : According to the Nirayana or Sidereal System for 1980 A. D.—N. C. Lahiri

National Library ; Belvedere, cal-27

1. Leo Tolstoy : an exhibition
2. Garcin de Tassy : an exhibition
3. Village India, 1963—Mekim Marriott, ed.
4. Rural profiles, 1955—D. N. Majumdar, ed.
5. Traditional Cultures, 1965—G. M. Foster
6. Metropolis, 1965—J. C. Bollens & H. J. Sehmandt
7. The Ulster of India, 1936—Dunichand (of Ambala)

8. Letters to the people of India responsible Govt. 1917 —Lionel Curtis
9. Differential fertility in Central India, 1963—E. D. Driver
10. An English man defends mother India, 1929—Ernest Wood
11. Uncle Sham, 1929—Kanhayalal Gauba
12. Internationalism and Nationalism—Liu Shao-Chi
13. Indian Politics, 1924—J. T. Gwynn
14. India ; the most dangerous decades, 1960—S. S. Harrison
15. Towards struggle, 1946—JayaPrakash Narayan
16. Notes and extracts, 1891-1912—Sarvadhikari
17. Communism in India, 1960—G. D. Overstreet & Windmiller
18. India : Old and New, 1921—Sir Valentine Chirol
19. Mahatma Gandhi, 1948—E. Stanley Jones
20. Early history & growth of Calcutta, 1905—Binoykrishna Deb
21. Jawaharlal Nehru in the Soviet Union, 1955
22. The Charm of Kashmir, 1900—V. C. Scott O'connor
23. The Slang dictionary, 1925
24. A Grammar of the Latin language—Henry John Roby
25. A Winter's journal, 1961—H. O. Thorean
26. Programme budgeting, 1965—David Novic, ed
27. Technical Progress in USSR, 1959-1965—Y. Maksaryov, ed
28. Socialist way of development in agriculture, 1966—Y. Rudakov
29. Socialist nationalism of industry, 1966—V. Vinogradov
30. A Short biography of S. N. Banerjee
31. Phonetics--Kenneth L. Pike
32. The Voice of Asia--James A. Michener
33. Two lectures on linguistics, 1959—Sm. Katre
34. The loom of Language, 1945—Frederick Bodmer
35. Treatise on economics—N. G. Pearson
36. A course in modern linguistics, 1958—C. F. Hockett
37. The Treatment of beauty, 1930 Robert Bridges
38. The old man and the sea, 1955—E. Hemingway
39. Tortilla flat, 1935—J. Steinbeck

40. The Yearling, 1947—M. K. Rawlings
41. Essays in national idealism, 1909—A. K. Coomarswami
42. Notes on Bengal Renaissance, 1957—Amit Sen
43. History of Hindu civilisation during British Rule, 1894-96 —Pramathanath Bose
44. For whom the bell tolls, 1954—E. Hemingway
45. History of the Indian nationalist movement, 1920—Sir V. Lovett
46. Quiet crisis in India, 1962—J. P. Lewis
47. Planning a new India—M. N. Roy
48. Constitutional proposals of the Sapru Committee, 1945—
49. Sino-Soviet dispute, 1961—G. F. Hudson & others
50. Grammar of the Latin language, 1874—H. J. Roby
51. Power & Fuel report, 1947—National Planning Committee
52. New India, 1958—India Planning Committee
53. Transport services, 1949—National Planning Committee
54. National Planning Principles & administration, 1948— K. T. Shah
55. A Century of conflict, 1953—S. T. Possony
56. Policy towards nationalities of the Peoples Republic of China, 1953—
57. Rules of the Communist party of the Soviet Union, 1962—
58. Road to communism, 1961—
59. Presidential address, Indian National Congress, 1955—U. N. Dhebar
60. Programme of the Communist party of the Soviet Union
61. 23rd Congress of the CPSU
62. Concise History of the Communist party of the Soviet Union, 1960—J. S. Reshetar
63. Economic History of India, 4th ed, 1906—R. C. Dutt
64. Economic Development of USSR, 1959-65—N. S. Khrushchov
65. Sonnets—Milton
66. Shelley and his personality, 1963—Bhupendranath Roy
67. Development of Self-Govt. in Yugoslavia, 1961—Pavte Kovac

68. The State—V. I. Lenin
69. The April Thesis— "
70. Study in the economic condition of ancient India, 1929—Prannath
71. The Constitution of the Communist Party of China, 1956—
72. Problems of building Socialism & Communism in the USSR—V. I. Lenin
73. From wooden plough to atomic power, 1966—A. Khavin
74. A manual for writers, 1955—K. L. Turabian
75. Evolution of Indian industries, 1939—Rohinimohun Chaudhuri
76. Literary & historical atlas of Asia—J. G. Bartholomew
77. The foundation of Indian culture, 1954—Sri Aurobindo
78. European lecture tour, 1961—Swami Ranganathananda
79. India—Pierre Loti
80. Handbook for travellers in India, Burma and Ceylon, 12th ed, 1926—
81. Beyond the high Himalayas, 1952—W. O. Douglas
82. Tours in Sikkim, 1917—
83. Kailas-Manasaravar, 1949—Swami Pranavananda
84. Japan and South-East Asia lecture tour, 1962—Swami Raghunathananda
85. Lectures on the principles of political deligation 1924—T. H. Green
86. Travels in India, Vol. I & 2, 1962—V. Ball
87. Kashmir, 1924—F. Xounghusband
88. Travels in Ladak, Tartary and Kashmir, 1863—Col. Torrens
89. The Human Cycle, 1962—Sri Aurovindo
90. Portuguese discoveries dependencies, 1893—Rev. Alex J. D. Dorsey
91. Progress of the Colombo plan, 1960, 1961—
92. Capital and labour in the tea industry, 1954—Sanatkumar Bose
93. History of Economics, 1944—W. Stark
94. Banking terms, 1931—Herbert Scott
95. On the unity of the International Communist movement 1966—V. I. Lenin

96. Question of national policy, 1970—V. I. Lenin
97. Selected works, Vol, 2. pt. 2—V. I. Lenin
98. Polish scholars, 1954—M. Dobrowolski
99. Handbook of Colloquial Tibetan, 1894—G. Sandberg
100. Industrial finance, 1948—National planning committee
101. A guide to Communist Jargon, 1957—R. N. Carew Hunt
102. Bengal in the sixteenth Century, A.D., 1914—J. N. Dasgupta
103. Shivaji & his times, 2nd ed. 1920—Jadunath Sarkar
104. Mughal Administration, 1924— ,,
105. Indian speeches and documents on British rule, 1821-1918, 1937—J. K. Majumdar
106. For Socialist economic construction in our country, 1958—Kim Il. Sung
107. Dragon harvest, 1945 –Upton Sinclair
108 Presidential agent, 1945— ,,
109. Wide is the gate, 1944— ,,
110. The I. C. S. 1937—Sir Edward Bluat
111. Some aspects of Public administration in Bengal, 1945—Nareshchandra Roy
112. Oil ! 1936—Upton Sinclair
113. The Unfinished business of Civil Service reform, 1952—W. S. Carpenter
114. Milton, 1914—
115. Poetical works of Mrs. Browning, V. I—S. A. Brooke
116. Poetical works of Robert Burns, 1898
117. History of Chemistry in ancient & medieval India, 1956—P. C. Roy
118. Nuclear explosions, 1959—Am-Kuzin
119. Source book of on atomic energy—S. Glasstone
120. Indian cotton textile industry, 1953—S. D. Mehta
121. Structure of cotton-Mill industry of India, 1949—M. M. Mehta.
122. Urban prospect, 1968—Lewis Mumford
123. India, 1889—H. B. W. Garrick
124. Tactics & Strategy of revolution, 1948—Soumyendranath Tagore

125. Pilgrimgage of Fa Hian, 1848
126. Centenary book of Tagore. 1961—Sookamal Ghosh, ed
127. Rabindranath Tagore, 1939—V. Lesny
128. A wandering student in Far East Vol. 1, 1908—Ronaldshay
129. Rabindranath Tagore in Germany, 1961—D. Rothermund
130. The first Indian war of Independence, 1857-59—Mary & Engels
131. Strangers in India, 1943—P. Moon
132. Gandhism for millions, 1949—V. G. Krishnamurti
133. The last Peshwa, 1818-51, 1944—Protulchandra Gupta
134. The national problem in India today, 1966 – A. M. Dyakov
135. Why Pakistan ? And why not ? 1944—K. T. Shah
136. Revolution and quit India, 1946—Soumyendranath Tagore
137. Bengal under Communal award and Poona Past, 1933—N. N. Sircar
138. Works of Lord Byron, 1837
139. Complete Poetical works of Oliver Goldsmith, 1906—Austin Dobson, ed
140. On Marxism, 1969—V. I. Lenin
141. Judicial Dictionary, Vols. 1, 2, 3, 1903—F. Stroud
142. Population growth, 1958—A, J. Coale
143. Indian mining, 1943—J. A. Dunn
144. Sanskrit Phonetics, 1898—C. C. Uhlenback
145. Sanskrit Vocabulary, 1847—E. A. Prinsep
146. Snow balls of Garhwal, 1946—D. N. Majumdar
147. Joint Institute for nuclear Research—V . A. Biryukov
148. New class, 1957—Milovan Djilas
149. The development of polish science, 1956—Bogdan Suchodolski
150. Positive sciences of the ancient Hindus—Brajendranath Seal
151. Garmonatical method in Panini, 1961—Betty Shefits
152. Beginning Chinese, 1963—John Lefrancis
153. Smaller Latin English Dictionary
154. Planning power and welfare, 1959—Daya Krisna
155. Socialism to Sarvodaya, 1956—Jayaprakash Narayan

156. Studies in the early political system of the East India Company in Bengal, 1939—D. N. Banerjee
157. Speeches of Surendranath Banerjee, 1905
158. Studies in Indian social polity, 1944—Bhupendranath Dutta
159. Unhappy India, 1928—Lajpat Rai
160. Early administrative system of the East India company, v. I. 1765-1774, 1943—D. N. Banerjee
161. Indian cotton—Indian Central Cotton Committee
162. Depreciation allowances—Employer's Association
163. Bengal famine (1943), 1949—Tarakchandra Das
164. A hundred years of Indian cotton, 1947—East India Cotton Association
165. Economic consequences of divided India—C. N. Vakil
166. Administrative & economic development in India, 1963—R. Braibanti
167. Rural marketing and finance, 1947—National Planning Committee
168. Engineering industries, 1948— ,,
169. Linear programming 1958—R. O. Ferguson
170. Land reform in China, 1953—B. N. Ganguly
171. Rural and Cottage industries—National Planning Committee
172. Indian Nationalism, 1914—Ediwn Bevan
173. Danger in India, 1932—G. Tyson
174. Amritsar Congress of the Communist party, 1958—Ajoy Ghosh
175. Indian National Congress, 1953-54
176. Handbook of Indian Legislatures, 1937—R. R. Saksena
177. Economic annals of Bengal, 1927—J. C. Sinha
178. Economic life of a Bengal district, 1910—J. C. Jack
179. Indian National Demand, 1928—Nehru Reports
180. Consider Japan, 1963
181. Autocraft of the breakfast, 1798—O. W. Holmes
182. Romantic movement in English Literature, 1920—W. A. T. Archbold
183. Inter-racial problems, 1911—G. Spiller

184. Outline of coloquial Kannada, 1958—W. Bright

185. History of Tamil language, 1965—T. P. Meenakshi-sundaram

186. Kharia Phonology, 1965—H. S. Biligiri

187. Introduction to Nepali, 1963—T. W. Clark

188. Kashi, a language of Assam, 1961—Lili Rabel

189. Garo grammer, 1961—R. Burling

190. Introduction to Bengali, pt. I. 1964—E. C. Dimock

S. K. Bhowmick ; Deptt. of Museum, G. S. Museum and Picture Gallery, Baroda—2

1. Technical studies in the field of Museums and Fine Arts—Swarnakamal

2. Protection and Conservation of Museum Collection—Swarna kamal

Yuva Prakashani ; 206 Bidhan Sarani, cal-6

1. Hindi Self-Instruction—Rakhalchandra Chowdhuri, ed.

Director, American Unersity Centre, 1 Bidhan Sarani

১। Persuasive Communication—Erwin P. Bettinghans

২। Prize Stories, 1978 : The O. Henry Awards—W. Abrahams, ed

৩। Sellected Letters of Gonrad Aiken—J. Killorin, ed

The Asiatic Society ; 1 Park St., Cal-16

১। The fundamentals of K. C. Bhattacharya philosophy—Kalidas Bhattacharyya

২। Ananda Coomaraswamy : A study—Moni Bagchee

৩। Vadanyayaprana of Acharya Dharmkirtti—Swami Dwarikadas Shastri

৪। পাদরি বুড় (সুকুমার সেনের ভূমিকাসহ)—অমর দত্ত

৫। Physical Anthropology of the Nicobarise—Pranab Ganguly.

৬। A Biometric study of tribes of North-Western Himalayan region —S. K. Majumdar

৭। Saraswatikanthabharanam ; A work on rhetoics by Maharajadhiraja Bhoja. Part—I Kamleshwarnath Mishra.

৮। The Religious ideas of Rammohan Roy—Ajitkumar Roy

৯। বাঙালীর ইতিহাস—কমল মজুমদার
১০। চটগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড—আব্দুল হক চৌধুরী
১১। Sabda Manjari (Revised fourth ed.)—Vidyasagar K. L. V. Sastri and Pandit L. Anandarama Sastri

ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য ; পি ১০বি, সি. আই. টি. রোড, কলি-১৪
১। কবিতায় মেডিসিন—ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য

ভারত বুক এজেন্সী ; ২০৬ বিধান সরণী, চার নং ঘর দোতলা, কলি-৬
১। কৃত্তিবাস রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড—শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী ও নরেশচন্দ্র জানা
২। আধুনিক বাংলা কবিতা পাঠ—অরুণকুমার ঘোষ

ভারবি প্রকাশক ; ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২
১। বাল্মিকি রামায়ণ—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, অনু°
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (২)—রামায়ণ বিস্তারস্বকৃত অনুবাদ

মণ্ডল বুক হাউস ; ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
১। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
২। সাধুসঙ্গ—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মধুসূদন বসু ; ১১৯/৭, শরৎ ঘোষ, কলি-৩১
১। গঙ্গা-যমুনা-মন্দাকিনীর পথে পথে—মধুসূদন দত্ত

মহাবীর বড়াল (বর্ণালী বণিক), ৩/৩০ বি. এস. এম. লেন, কলি-৩৯
১। অশ্রু মাল্য—বর্ণালী বণিক

মাণিকলাল সিংহ সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখা
১। পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি—মানিকলাল সিংহ
২। রাঢ়ের মন্ত্রযান ”

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স ; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২
১। ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ—প্রবোধচন্দ্র সেন
২। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (চার খণ্ড একত্রে)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৩। ফিরে ফিরে চাই—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৪। গোবিন্দচন্দ্র দাস কাব্য সম্ভার—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
৫। রবীন্দ্র কথা-কাব্যের শিল্পসূত্র—সুখরঞ্জন রায় সঙ্কলক

মৃগাঙ্ক ভটাচার্য, C/o প্রাচী প্রতীচী ৩৩, কলেজ রো, কলি-৯
১। ইলিয়াড (হোমর রচিত)—মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, অনুদিত

রফিক উল্লাহ ; বারুইপুর, বি. এড. ট্রেনিং কলেজ, ২৪ পরগণা
১। বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি—অধ্যাপক রফিক উল্লাহ
২। হাদীস শরীফ— ” স°

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ; ১৯, পি. সি. ঘোষ, রোড কলি-৪৮

১। আত্ম-গঠন বা ব্রহ্মচর্য প্রসঙ্গ—স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

২। 'জ্যোতির্বাণী', ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা—হৃষীকেশ শাস্ত্রী, স°

৩। 'প্রণব', শ্রাবণ, ১৩৮৫—স্বামী আত্মানন্দ, স°

৪। 'সনাতন সারথি', ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

৫। 'খেলার কথা', ১ লা জুলাই, ১৯৭৮—প্রদ্যোতকুমার দত্ত স°

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ; ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলি-৭

১। পটদীপ ধ্বনি—অমর ঘোষ

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলি—৫০

১। রবীন্দ্র-দর্শন—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ; সাহিত্যতীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রীট, কলি-৬

১। কবি করুণানিধান স্মরণিকা—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক সম্পাদিত

২। সাহিত্যতীর্থ, রজতজয়ন্তী বর্ষ ১৩৮৫—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক সম্পাদিত

৩। এক পালখের পাখি ”

৪। সাহিত্যতীর্থ (রজত জয়ন্তী বর্ষ) ১৩৮৫

৫। সাহিত্যতীর্থ (বনফুল স্মরণিকা) ১৩৮৫

রাইকমল মজুমদার ; পি-২১১ লেক টাউন, ব্লক-এ, কলিকাতা-৫৫

১। নিবেদিতা (নাটক)—রাইকমল মজুমদার

রাইমোহন সামন্ত ; ১২জি অরবিন্দ সরণি, পোঃ চাতরা, শ্রীরামপুর-৪

১। রুশ গল্পে তিনটি—রাইমোহন সামন্ত

২। যুগাচার্য শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (সমকালীন দৃষ্টিতে)—”

৩। Letters to Lipski or Bijoykrishna Explained—
Raimohan Samanta

রাসবিহারী রায় ; ১৬এ নিমতলা লেন, কলি—৬

১। বিদ্যাসাগর পরিচয়—রাসবিহারী রায়

২। কিম্বদন্তীর আঙিনায়— ”

৩। প্রেমিক প্রেমিকা— ”

রূপা এণ্ড কোং ; কলিকাতা

১। বিদ্যাসাগর—সন্তোষকুমার অধিকারী

২। নতুন জনপদ—মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

৩। সাহিত্যের কথা—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। সেরা মানুষ দাদাঠাকুর—নির্মলরঞ্জন মিত্র

লীলা বিভাত ; শশীভূষণ বালিকা বিভালয়, ডিগ্রি কলেজ, লক্ষ্নৌ, উত্তর প্রদেশ।

১। রবীন্দ্রজীবনের অনন্যা (১ম খণ্ড)—লীলা বিভাত
২। „ (২য় খণ্ড)— „
৩। „ (৩য় খণ্ড)— „
৪। „ (৪র্থ খণ্ড)— „
৫। রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী (১ম খণ্ড)— „
৬। „ (২য় খণ্ড)— „

শঙ্করপ্রসাদ দত্ত ; ৩৯ ফিয়ার্স লেন, কলি-৭৩

১। নবজন্ম—অবিনাশ সাহা

শতদল ভট্টাচার্য ; ৩/১ আশুতোষ শীল লেন, কলি-৯

১। রেগিস্থান রাজস্থান—শতদল ভট্টাচার্য
২। মোমের আলোয় দেখা—কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। ছোটদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প—দীনেশচন্দ্র সাহা স° অভিজিৎ দত্ত, অনু°
৪। ভিক্টোরিয়াস মোহন বাগান,ফুটবল : হকি : ক্রিকেট—জয়ন্ত দত্ত

শম্ভু রক্ষিত (মহাপৃথিবী) ; ১১ ঠাকুর দত্ত ১ম লেন, হাওড়া—১

১। নক্ষত্র পুরুষ—মোহনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
২। সমসূত্র—শম্ভু রক্ষিত
৩। বোষ্টমের গান—জ্যোতির্ময় দত্ত

শুভেন্দ্রনাথ গড়াই ; ১০৮ অখিল মিস্ত্রী লেন, কলি-৯

১। মাটিতে ফেরাও চোখ—শান্তিময় ভট্টাচার্য

শেখ জাহাঙ্গীর আহমেদ ; বহড়ু শ্যামসুন্দর পাবলিক লাইব্রেরী, ২৪ পরগণা

১। প্রতিভা: দেওয়ালীও ঈদ-উল-জোহা-সংখ্যা (১) ; বৈশাখ (নববর্ষ সং ১৩৮৬

শ্যামল ভট্টাচার্য Riddhi (India) ; ২৮ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

১। Sanskrit & Modern Medical Vocabulary ; a comparative study—Asoke K. Bagchi
২। Rabindranath through western eyes—Alex Aronson
৩। Counterpoint vol. 2 ; 1978 (Society in dilemma)—Alok Roy ed.

শ্যামসুন্দর দে ; ন্যাশনাল বুক এজেন্সী

১। আঁধার উজান ভেঙে—শ্যামসুন্দর দে
২। অন্তরীপ—ইরা সরকার

শ্রীপাদ রামকৃষ্ণদাস ভক্তিশাস্ত্রী ; শ্রীশ্রীকৃষ্ণকথাকুঞ্জ, বশড়া, শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির রোড, পোঃ চাকদহ, নদীয়া

১। ভক্তিধারা—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস

২। শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্— "

শ্রীভূমি পাব্লিশিং কোং ; ৭৯, মহাত্মা গান্ধি রোড ; কলি-৯

১। যোগাযোগ্য যোগ ব্যায়াম—কানাইলাল সাহা

২। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ—সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

৪। সুন্দর দুর্গম—নির্মলেন্দু গৌতম

শ্রীশকুমার কুণ্ডু ; জিজ্ঞাসা, ১-এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলি-৯

১। কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়—গোপেশচন্দ্র দত্ত

২। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ তুলনাত্মক সমীক্ষা—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

৩। বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল—আজাহারউদ্দিন খান

৪। বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম—প্রিয়দারঞ্জন রায়

৫। বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর—অতুল সুর

৬। বাঙলা ছন্দ—জীবেন্দ্র সিংহরায়

৭। বাঙলা ছন্দের বিবর্তন—সুপ্রদকুমার ভৌমিক

সংস্কৃত কলেজ ; ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২

১। The Sdok Kak Thom inscription pt. I—Adhir Chakraborty

২। Ethric elements in ancient Hinduism—Sudhakar Chattopadhaya

৩। Bharatiya Darsana Kosa, vol. I and II—Comp. by Srimohan Bhattacharya and Dineshchandra Bhattacharjee

৪। Our haritage. vol. xxv, pts. I and II.

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ; ৩৮, বিধান সরণী, কলি-৬

১। গদ্য কবিতা ও তার বিবর্তন : রবীন্দ্রনাথ ও তার উত্তরসূরিবৃন্দ—ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত

২। দেবতা পৃথিবী ও মহাবিশ্ব—রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী

৩। হিমালয়ের পথে : ভিলাঙ্গনা ও পাঁওয়ালী কান্থা—সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সত্যজিৎ চৌধুরী ; ৭৫/১ শাস্ত্রী রোড, নৈহাটী—৮৪৩১৬৫

১। অবনীন্দ্র-নন্দনতত্ত্ব—সত্যজিৎ চৌধুরী

সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; হিন্দু স্কুল

১। ঠাকুর বাড়ীর ইতিকথা—সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

২। অনুস্মৃতা — "

৩। ভারত-সঙ্গীত — ,,

৪। একলব্য — ,,

৫। উপেক্ষিত — ,,

সনৎকুমার মিত্র ; ৭ সত্যেন রায় রোড, কলি-৩৪

১। লালন ফকির : কবি ও কাব্য—সনৎকুমার মিত্র

সরোজমোহন মিত্র ; ২৩৮ মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪

১। ছোটগল্পের বিচিত্র কথা—সরোজমোহন মিত্র

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ; ২১১, বিধান সরণী, কলি-৬

১। অঞ্জলি—সতীশচন্দ্র রায়

২। ব্রাহ্ম সমাজের ব্যাখ্যান—রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

৩। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—গৌতম নিয়োগী

৪। A lecture on the life and labours of Rammohun Roy—William Adam

৫। শিবনাথ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত প্রার্থনা—শিবনাথ শাস্ত্রী

৬। মহম্মদ চরিত—কৃষ্ণকুমার মিত্র

সাহিত্য সংসদ ; ৩২এ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৯

১। বৈষ্ণব পদাবলী—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঙ্ক°

২। বাঙ্গালা ভাষার অভিধান : ১ম খণ্ড—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

৩। ঐ ২য় খণ্ড— ,,

৪। তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ : ১ম, ২য়, ৩য়—জগদীশ ভট্টাচার্য, স°

সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ; ২৮ শিবতলা ষ্ট্রীট, উত্তর পাড়া, হুগলী

১। অমৃতস্য পুত্রাঃ (একাঙ্কিকা)—সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুকুমার মিত্র ; এ/১২/৮ কালিন্দী হাউসিং এস্টেট কালিদহ, কলি-৫৫

১। নবাঙ্কুর—সুলেখা সান্যাল

২। অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী—অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

৩। প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী—প্রেমেন্দ্র মিত্র

৪। প্রদীপ—১ম বর্ষ, ২য়-৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৯

৫। পরিচয়—মাঘ ১৩৮৪-আষাঢ় ১৩৮৫

৬। ত্রিস্রোতা—সাবিত্রী রায়

৭। কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা ২য় সং—মহেন্দ্রনাথ দত্ত

৮। সোনালী মাছ, ১ম সং—বিজন ভট্টাচার্য

৯। পরিচয়, ৪৮ বর্ষ, ১ম খণ্ড, শ্রাবণ-পৌষ, ১৩৮৫

সুজাতা রায় ; ৩৬ বি, সিমলা রোড, কলি-৬

১। রাঙাদির রূপকথা—ত্রিভঙ্গ রায়

২। রূপকথা— ,,

সুধাকর চট্টোপাধ্যায় ; ৮/৪/ জে, বীর পাড়া লেন, কলি—৩০

১। আলোছায়া দোলা—সুধাকর চটোপাধ্যায়

সুধীরকুমার বসু ; ১২, ঘোষ লেন, কলি-৬

১। সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায়—সুধীরকুমার বসু

সুবীরকুমার সেন ; ৮৫ দেবীনিবাস রোড, পোঃ মতিঝিল (দমদম) কলি-৭৪

১। জানা থেকে অজানায় (১ম খণ্ড)—বিজ্ঞানার্থী

সুধীরচন্দ্র নিয়োগী ; ৭ বালিগঞ্জ টেরেস, কলি-১৯

১। অলৌকিক—সুধীরচন্দ্র নিয়োগী

২। মৃত্যুর পরবর্তী জীবন— ,,

৩। মানুষ ও তাহার দেহ— ,,

৪। উপক্রমণ— ,,

৫। স্বপ্ন— ,,

সুবোধকুমার চক্রবর্তী ; বি. এফ. ৭৭ সল্ট লেক সিটি, কলি-৬৪

১। তীর্থের পথে—সুবোধকুমার চক্রবর্তী

২। রম্যাণি বীক্ষ্য (কামরূপপর্ব)— ,,

সুরেশ চন্দ্র ; ১৫২ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলি-২৬

১। বৈদান্তিক জীবন—সুরেশ চন্দ্র

২। Vedantic life—Suresh Chandra

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ;

১। হিমালয়ের পথে ভিল্লাঙ্গনা ও পাঁওয়ালী কান্থা—সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

স্নেহলতা মুখোপাধ্যায় ;

১। বনমঞ্জরী—স্নেহলতা মুখোপাধ্যায়

হরিদাস কোলে ; এন-১৯/১ পাহাড়পুর রোড, কলি-২৪

১। জামাই ষষ্ঠী—হরিদাস কোলে

হারাধন দত্ত ; বালটিকুরী সভঃ হাউসিং এস্টেট, ব্লক-পি ফ্ল্যাট-৯, হাওড়া

১। কবি সার্বভৌম ; রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

১ম খণ্ড : টা. ২০'০০

২য় খণ্ড : টা. ৩০'০০

বাংলা সাময়িক পত্র

১ম খণ্ড : টা. ১১'০০

২য় খণ্ড : টা. ৯'০০

বাংলার সাহিত্যিকগণের প্রামাণ্য জীবনী

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রথম হইতে একাদশ খণ্ড একত্রে : টা. ১৬০'০০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

(১৭৯৫-১৮৭৬)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডক্টর সুশীলকুমার দে-লিখিত ভূমিকা

বিখ্যাত নাট্যকারদের দুষ্প্রাপ্য ছবি সহ সুদৃশ্য বাঁধাই।

॥ সদ্য প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণ ॥

মূল্য ৩০'০০ ত্রিশ টাকা

ভারতকোষ

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত বিশ্বকোষ বা

Encyclopaedia

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সুদৃশ্য বাঁধাই।

সম্পূর্ণ সেট : এক শত পঞ্চাশ টাকা ॥

[প্রায় নিঃশেষিত]